

ବନ୍ଧିତ-ଅନ୍ତର୍ବାସିକ ସଂସ୍କରଣ

ବନ୍ଧିତଚରିତ୍ର

ବନ୍ଧିତଚର ଚର୍ଚ୍ଚାପାଠ୍ୟ

[୧୯୮୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ]

ସମ୍ପାଦକ :

ଶ୍ରୀବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ

ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀନୀଳାନ୍ତ ଦାସ

ବନ୍ଧିତ-ସାହିତ୍ୟ-ପରିଷଦ

୨୫୩୧, ଆମାର ମାରକୁଲାର ରୋଡ୍
କଲିକତା

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীমন্নথমোহন বহু কর্তৃক
প্রকাশিত

আবণ, ১৩৪৮

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগ
কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দা
মুদ্রিত

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ‘কৃষ্ণচরিত্র’ সম্বন্ধে তাঁহার মূল কথা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

“অমূল্যলন ধর্মে” বাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অমূল্যলনে যে আদর্শ উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রে সেই আদর্শ। আগে তব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।—১ম সংস্করণ, ১৮৮৬, “বিজ্ঞাপন”।

‘কৃষ্ণচরিত্র’ রচনার একটু ইতিহাস আছে। ‘বঙ্গদর্শনে’র দ্বিতীয় বৎসরে ১২৮০ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র ‘মানস বিকাশ’ নামক একটি কাব্যের সমালোচনা করেন। তাহাতে তিনি বলেন—

জয়দেব, বিজ্ঞাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিঙ্গিয়ের অমূল্যলনী। বিজ্ঞাপতির কবিতা বহিরিঙ্গিয়ের অর্থাৎ—
পৃ. ৪০৫।

এই ভাবে নিতান্ত সামান্য ব্যাপার লইয়া আরম্ভ হইলেও কৃষ্ণচরিত্র-প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ‘বঙ্গদর্শনে’র তৃতীয় বৎসরে ১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত ‘প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ’র সমালোচনা উপলক্ষ্যে “কৃষ্ণচরিত্র” প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। ইহাতে তিনি বলেন—

বিজ্ঞাপতি এবং তদনুবর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের গীতের বিষয়, একমাত্র কৃষ্ণ ও রাধিকা। বিষয়ান্তর নাই। তজ্জন্ত এই সকল কবিতা অনেক আধুনিক বাঙ্গালির অরুচিকর। তাহার কারণ এই যে, নায়িকা, কুমারী বা নায়কের শাস্ত্রানুসারে পরিণীতা পত্নী নহে, অন্তের পত্নী; অতএব সামান্য নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে যেমন, অপবিত্র, অরুচিকর এবং পাণে পঙ্কিল হয়, কৃষ্ণলীলাও তাঁহাদের বিবেচনায় তদ্রূপ—অতি কদর্য পাণের আধার। বিশেষ এ সকল কবিতা অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইঙ্গিতের পুষ্টিকর—অতএব ইহা সর্বথা পরিহার্য। বাহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখন এতকাল স্থায়ী হইত না। কেননা অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যথার্থ নিরূপণ জন্ত আমরা এই নিগূঢ় ভঙ্গের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কৃষ্ণ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইরূপ জয়দেবে, ও সেইরূপ শ্রীমঙ্গাগবতে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের আদি, শ্রীমঙ্গাগবতেও নহে। ইহার আদি মহাভারতে। জিজ্ঞাস্য এই যে মহাভারতে যে কৃষ্ণচরিত্র দেখিতে পাই, শ্রীমঙ্গাগবতেও কি সেই কৃষ্ণের চরিত্র? জয়দেবেও কি তাই? এবং বিদ্যাপতিতেও কি তাই? চারিজন গ্রন্থকারই কৃষ্ণকে ঐশিক অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু চারিজনেই কি এক প্রকার সে ঐশিক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে প্রভেদ কি? যাহা প্রভেদ বলিয়া দেখা যায়, তাহার কি কিছু কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে? সে প্রভেদের সঙ্গে, সামাজিক অবস্থার কি কিছু সঙ্ঘর্ষ আছে?...

কাব্য বৈচিত্র্যের তিনটি কারণ—জাতীয়তা, সাময়িকতা, এবং স্বাতন্ত্র্য। যদি চারি জন কবি কর্তৃক গীত কৃষ্ণচরিত্রে প্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের কারণ তিন প্রকারই থাকিবার সম্ভাবনা। বঙ্গবাসী জয়দেবের সঙ্গে, মহাভারতকার বা শ্রীমঙ্গাগবতকারের জাতীয়তা জনিত পার্থক্য থাকিবারই সম্ভাবনা; তুলসীদাসে এবং কুন্তিবাসে আছে। আমরা জাতীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া, সাময়িকতার সঙ্গে এই চারিটি কৃষ্ণচরিত্রের কোন সঙ্ঘর্ষ আছে কি না ইহারই অন্বেষণ করিব।—পৃ. ৫৪৮-৫৪৯।

এই অন্বেষণের ফলই বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণচরিত্র’। এই ফল সম্পূর্ণ ফলিতে অনেক দেরি হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গ কিছু কালের জন্য পরিত্যাগ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার ‘বিবিধ সমালোচন’ গ্রন্থে উক্ত ‘কৃষ্ণচরিত্র’ নিবন্ধটি মুদ্রিত হয় (পৃ. ১০১-১১০); ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ প্রকাশের সময় প্রবন্ধটি পরিত্যক্ত হয়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি ভিতরে ভিতরে আপনাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দে ‘প্রচার’ ও ‘নবজীবন’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দুধর্মের বিস্তৃত আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন ও ‘প্রচার’ের আশ্বিন সংখ্যা হইতে পুনরায় ‘কৃষ্ণচরিত্র’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১২৯১ সালের আশ্বিন, কার্তিক, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র; ১২৯২ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ-পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন-চৈত্র; এবং ১২৯৩ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে ইহা প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরেই (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্কিমচন্দ্র এই পর্য্যন্ত লিখিত অংশকে ‘কৃষ্ণচরিত্র। প্রথম ভাগ’ আখ্যা দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৯৮।

১২৯৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা ‘প্রচারে’ বঙ্কিমচন্দ্র ‘কৃষ্ণচরিত্র’ের দ্বিতীয় ভাগ বা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ আরম্ভ করেন। এই সংখ্যায় “ভগবদ্ভাবন পর্বাদধ্যায়ে”র দুই পরিচ্ছেদ (‘প্রস্তাব’ ও ‘যাত্রা’) মাত্র প্রকাশিত হয়। যে কারণেই হউক, ইহার পর

গ্রন্থ আর অগ্রসর হয় নাই। ‘প্রচারে’ “কৃষ্ণচরিত্র” আর বাহির হয় নাই। একেবারে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ‘কৃষ্ণচরিত্র (সম্পূর্ণ গ্রন্থ)’ প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৮০ + ১২ + ৪৯২ + ১০। এই সংস্করণে পূর্ব-প্রকাশিত অংশও আমূল পরিবর্তিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে ‘কৃষ্ণচরিত্রে’র এই দুইটি মাত্র সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্রটি এখানে মুদ্রিত হইল—

কৃষ্ণচরিত্র। / প্রথম ভাগ। / শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। / প্রণীত। / Calcutta : /
Printed By Jodu Nath Seal, / Hare Press, / 55, Amherst Street. /
Published by Umacharan Banerjee / 2, Bhowani Charan Dutt's Lane. /
1886. /

পূর্বের রচিত “কৃষ্ণচরিত্রে”র সহিত দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পর্ক বিষয়ে “দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে” বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের উক্তি সর্বদা স্মরণীয়। তাহা এই—

বঙ্গবর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যত দূর প্রভেদ, এতদুভয়ে তত দূর প্রভেদ। মতপরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অহুসঙ্কানের বিস্তার, এবং ভাবনার ফল। ইহার কখন মত পরিবর্তিত হয় না, তিনি হয় অজ্ঞানদৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন।

‘কৃষ্ণচরিত্র’ লইয়া বাংলা দেশে যথোপযুক্ত আলোচনা হয় নাই। মাত্র সেদিন ক্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার ‘দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র’ গ্রন্থে ইহা লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

কমণ্ডলিক

[১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

পাদাঙ্গং সঙ্কিপৰ্কাণং স্বৰব্যান্ভূষণম্ ।

যমাহরক্ষরং দিব্যং তৈশ্চ বাগাশ্বানে নমঃ ॥

শাস্তিপৰ্ক, ৪৭ অধ্যায় ।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

ধর্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহার সমস্ত আনুপূর্বিক সাধারণকে ধাইতে পারি, এমন সম্ভাবনা অল্পই। কেন না কথা অনেক, সময় অল্প। সেই সকল ধার মধ্যে তিনটি কথা, আমি তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে প্রবৃত্ত আছি। ঐ প্রবন্ধ তিনটি ইখানি সাময়িক পত্রে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছে।

উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধর্মবিষয়ক; দ্বিতীয়টি দেবতত্ত্ব বিষয়ক; তীয়টি কৃষ্ণচরিত্র। প্রথম প্রবন্ধ “নবজীবনে” প্রকাশিত হইতেছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচার” নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটিও আজি পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই। পাণ্ডি দূরে থাকুক, কোনটিও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার অনেকগুলি রণ, আছে। একে বিষয়গুলি অতি মহৎ, অতি বিস্তারিত সমালোচনা ভিন্ন তদ্ব্যতীত অন্য বিষয়েরই মীমাংসা হইতে পারে না; তাহাতে আবার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ লেখকের হাও অতি অল্প; এবং পরিভ্রম করিবার শক্তিও মনুষ্যের চিরকাল সমান থাকে না।

এই সকল কারণের প্রতি মনোযোগ করিয়া, এবং মনুষ্যের পরমায়ুর সাধারণ রীমাণ ও আপনার বয়স বিবেচনা করিয়া আমি, আমার বক্তব্য কথা সকলগুলি বলিবার য় পাইব, এমন আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। যে দেবমন্দির গঠন করিবার উচ্চাভিলাষকে ন স্থান দিয়া, দুই একখানি করিয়া ইষ্টক সংগ্রহ করিতেছি, তাহা সমাপ্ত করিতে পারিব, ন আশা আর রাখি না। যে তিনটি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি, তাহাও সমাপ্ত করিতে রিব কি না, জগদীশ্বর জানেন। সকলগুলি সম্পূর্ণ হইলে তাহা পুনর্মুদ্রিত করিব, এ শায় বসিয়া থাকিতে গেলে, হয়ত সময়ে কোন প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইবে না। কেন না ল কাজেরই সময় অসময় আছে। এই জন্ত কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ড এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত া গেল। বোধ করি এইরূপ পাঁচ ছয় খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সকলই য ও শক্তি এবং ঈশ্বরানুগ্রহের উপর নির্ভর করে।

আগে অনুশীলন ধর্ম পুনর্মুদ্রিত হইয়া তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল ত। কেন না “অনুশীলন ধর্মে” যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। শীলনে যে আদর্শ উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্তৃক সেই আদর্শ। আগে বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই

উদাহরণ ; কিন্তু অল্পশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ হইবারও বিলম্ব আছে।

শ্রীবাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত হইয়াছিল। তাহাও অসম্পূর্ণমাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথা বাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। তা ছাড়া হরিবংশে ও পুরাণে বাহা সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া উপক্রমণিকা-ভাগ পুনর্লিখিত এবং বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণে বাহা ছিল, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণের অঙ্গাংশ মাত্র। অধিকাংশই নূতন।

এত দূরও যে কৃতকার্য হইতে পারিব, পূর্বে ইহা আশা করি নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশ করিয়াও আমি সুখী হইলাম না। তাহার কারণ, আমার ক্রটিতেই হউক, আর ছরদৃষ্ট বশতই হউক, মুদ্রাস্থনকার্যে এত ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে যে, অনেক ভাগ পুনর্মুদ্রিত করাই আমার কর্তব্য ছিল। নানা কারণ বশতঃ তাহা পারিলাম না। আপাততঃ একটা শুদ্ধিপত্র দিলাম। যেখানে অর্থবোধে কষ্ট উপস্থিত হইবে, অল্পগ্রহপূর্বক পাঠক সেইখানে শুদ্ধিপত্রখানি দেখিয়া লইবেন। শুদ্ধিপত্রেও বোধ হয়, সব ভুল ধরা হয় নাই। বাহা চক্ষে পড়িয়াছে, তাহাই ধরা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় যথাস্থানে লিখিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। তাহা তিনটি ফোড়পত্রে সন্নিবিষ্ট করা গেল। পাঠক ১৫ পৃষ্ঠার [২২ পংক্তির] পর ফোড়পত্র (ক), দ্বিতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদের [১২৪ পৃষ্ঠার] পর (খ), এবং ১৫৪ পৃষ্ঠার [১২ পংক্তির] পর (গ) [ও ২৪৫ পৃষ্ঠার ফুট নোটে ফোড়পত্র (ঘ)] পাঠ করিবেন।

আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু কিছু পরিভাষা এবং কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মতপরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি

লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মতপরিবর্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণবিষয়েই আমার মতপরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যত দূর প্রভেদ, এতদূরত্রে তত দূর প্রভেদ। মতপরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, এবং ভাবনার কল। যাহার কখন মত পরিবর্তিত হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। যাহা আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে আমি লজ্জাবোধ করিলাম না।

এ গ্রন্থে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত অনেক স্থলেই অগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের নিকট সন্ধান ও সাহায্য না পাইয়াছি এমনত নহে। Wilson, Goldstucker, Weber, Muir—ইহাদিগের নিকট আমি ঋণ স্বীকার করিতে বাধ্য। দেশী লেখকদিগের মধ্যে আমাদের দেশের মুখোজ্জলকারী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, C. I. E., শ্রীযুক্ত সত্যজিত সামগ্রামী, এবং মৃত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট আমি বাধ্য। অক্ষয় বাবু উত্তম সংগ্রহকার। সর্বাপেক্ষা আমার ঋণ মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর। যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তাঁহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রয়োজনমতে মূলের সঙ্গে অনুবাদ মিলাইয়াছি। যে ছই এক স্থানে মারাত্মক ভ্রম আছে বুঝিয়াছি সেখানে নোট করিয়া দিয়াছি। প্রয়োজনানুসারে, স্থানবিশেষ ভিন্ন, গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি ভয়ে মহাভারতের মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করি নাই। হরিবংশ ও পুরাণ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, মূল উদ্ধৃত করিয়াছি, এবং তাহার অনুবাদের দায় দোষ আমার নিজের।

পরিশেষে বক্তব্য, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি নিজে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি:—সে বিশ্বাসও আমি লুকাই নাই। কিন্তু পাঠককে সেই মতাবলম্বী করিবার জন্ত কোন যত্ন পাই নাই।

সূচী

প্রথম খণ্ড

উপক্রমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ । গ্রন্থের উদ্দেশ্য	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । কৃষ্ণের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় কি ?	১১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । মহাভারতের ঐতিহাসিকতা	১৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । মহাভারতের ঐতিহাসিকতা—ইউরোপীয়দিগের মত	১৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল	২০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা—ইউরোপীয় মত	২৪
সপ্তম পরিচ্ছেদ । পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা	৩২
অষ্টম পরিচ্ছেদ । কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা	৩৪
নবম পরিচ্ছেদ । মহাভারতে প্রেক্ষিপ্ত	৩৭
দশম পরিচ্ছেদ । প্রেক্ষিপ্তনির্বাচনপ্রণালী	৪২
একাদশ পরিচ্ছেদ । নির্বাচনের ফল	৪৪
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । অনৈনসর্গিক বা অতিপ্রকৃত	৪৬
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । দৈবের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব ?	৫০
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । পুরাণ	৫৭
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । পুরাণ	৬৩
ষোড়শ পরিচ্ছেদ । হরিবংশ	৬৭
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । ইতিহাসাদির পৌরোপন্যাস	৬৯

দ্বিতীয় খণ্ড

বৃন্দাবন

প্রথম পরিচ্ছেদ । যদুবংশ	৭৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । কৃষ্ণের জন্ম	৭৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । শৈশব	৮০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । কৈশোরলীলা	৮৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।	ব্রজগোপী—বিষ্ণুপূজা	৮৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।	ব্রজগোপী—হরিবংশ	৮৮
সপ্তম পরিচ্ছেদ ।	ব্রজগোপী—ভাগবত—বহুহরণ	১০২
অষ্টম পরিচ্ছেদ ।	ব্রজগোপী—ভাগবত—ব্রাহ্মণকল্পা	১০৭
নবম পরিচ্ছেদ ।	ব্রজগোপী—ভাগবত—বাসলীলা	১০৯
দশম পরিচ্ছেদ ।	ঈরাধা	১১২
একাদশ পরিচ্ছেদ ।	বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি	১২৫

তৃতীয় খণ্ড

মথুরা-দ্বারকা

প্রথম পরিচ্ছেদ ।	কংসবধ	১২৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।	শিকা	১৩১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।	জরাসন্ধ	১৩৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।	কৃষ্ণের বিবাহ	১৩৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।	নরকবধাদি	১৪১
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।	দ্বারকাবাস—শ্রমস্তক	১৪৪
সপ্তম পরিচ্ছেদ ।	কৃষ্ণের বহুবিবাহ	১৪৭

চতুর্থ খণ্ড

ইন্দ্রপ্রস্থ

প্রথম পরিচ্ছেদ ।	জৌপদীস্বয়ংবর	১৫৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।	কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ	১৬২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।	সুভদ্রাহরণ	১৬৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।	থাণ্ডবদাহ	১৭৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।	কৃষ্ণের মানবিকতা	১৮০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।	জরাসন্ধবধের পরামর্শ	১৮৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ ।	কৃষ্ণ-জরাসন্ধ-সংবাদ	১৯০

প্রথম পরিচ্ছেদ । ভীম কন্যাসুন্দর যুদ্ধ	১৮০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । অর্ধাঙ্গিহরণ	২০২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । শিশুপালবধ	২০৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । পাণ্ডবের বনবাস	২১৪

পঞ্চম খণ্ড

উপসংহৃত

প্রথম পরিচ্ছেদ । মহাভারতের যুদ্ধের সেনোন্মোহ	২১২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । সঞ্জয়বান	২২৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । যানসন্ধি	২২৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ক্রীকষ্ণের হস্তিনা বাজার প্রস্তাব	২৩১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । যাজ্ঞ	২৩৪
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । হস্তিনায় প্রথম দিবস	২৩৬
সপ্তম পরিচ্ছেদ । হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস	২৪০
অষ্টম পরিচ্ছেদ । কৃষ্ণকর্ণসংবাদ	২৪৪
নবম পরিচ্ছেদ । উপসংহার	২৪৬

ষষ্ঠ খণ্ড

কুরুক্ষেত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ । ভীষ্মের যুদ্ধ	২৫১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । জয়দ্রথবধ	২৫৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । দ্বিতীয় স্তরের কবি	২৫৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ঘটোৎকচবধ	২৬২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । দ্রোণবধ	২৬৫
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । কৃষ্ণকথিত ধর্মতত্ত্ব	২৭৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ । কর্ণবধ	২৮৭
অষ্টম পরিচ্ছেদ । দুর্ধ্যোধনবধ	২৯০

নবম পরিচ্ছেদ । যুদ্ধশেষ	২২৬
দশম পরিচ্ছেদ । বিধি সংস্থাপন	২২৮
একাদশ পরিচ্ছেদ । কামগীতা	৩০১
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । কৃষ্ণপ্রয়াণ	৩০৩

সপ্তম খণ্ড

প্রভাস

প্রথম পরিচ্ছেদ । যদুবংশধ্বংস	৩০৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । উপসংহার	৩১৩
কৌড়পত্র (ক)	৩১৮
কৌড়পত্র (খ)	৩১৯
কৌড়পত্র (গ)	৩১৯
কৌড়পত্র (ঘ)	৩২০

প্রথম খণ্ড

উপক্রমণিকা

মহতত্ত্বমসঃ পারে পুরুষং হৃতিভেদসম্ ।
বং জ্ঞানমূঢ়্যমভ্যেতি তস্মৈ জ্ঞানায়নো নমঃ ॥

মহাভারত, শাস্তিপর্ক, ৪৭ অধ্যায়ঃ ।

100

প্রথম পরিচ্ছেদ

এবের উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দু, বাঙ্গালা দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, ত্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—ইহা তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস। বাঙ্গালা প্রদেশে, কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না ; কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করেন না ; ভিখারী “জয় রাধেকৃষ্ণ” না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘৃণার কথা শুনিলে “রাধেকৃষ্ণ !” বলিয়া আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি ; বনের পাখী পুখিলে তাহাকে “রাধেকৃষ্ণ” নাম লিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্বব্যাপক।

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্বসময়ে কৃষ্ণারাধনা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্মেরই উন্নতিসাধক। সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা মনুষ্যের মঙ্গল আর কি আছে ? কিন্তু ইহারা ভগবান্কে কি রকম ভাবেন ? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর—ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন ; কৈশোরে পারদারিক—অসংখ্য গোপ-নারীকে পাত্তিত্রত্যাশ্রয় হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন ; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ত্ব, ঐহা হইতে সর্বপ্রকার শুদ্ধি, ঐহার নামে অশুদ্ধি, অপুণ্য দূর হয়, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্রসঙ্গত ?

ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সনাতন-ধর্মধ্বংসিগণ বলিয়া থাকেন। এবং সে কথার প্রতিবাদ করিয়া জয়ত্ৰী লাভ করিতেও কখনও কাহাকে দেখি নাই। আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করি ; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, আমার যত দূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই

অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপশ্রাসকারকৃত কৃষ্ণস্বকীয় উপশ্রাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিস্তৃত, পরমপবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি ঈদৃশ সর্বজনপরিচিত, সর্বপাপসংস্পর্শবৃত্ত, আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।

কি প্রকার বিচারে আমি এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বুঝান এই গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এই গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার নিজের যাহা বিশ্বাস, পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে বলি না, এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানবচরিত্রেরই সমালোচনা করিব। তবে এখন হিন্দুধর্মের আন্দোলন কিছু প্রবলতা লাভ করিয়াছে। ধর্মআন্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিচারে সমালোচন প্রয়োজনীয়। যদি পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখিবার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়া লইতে হয়। আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়, তাহা হইলেও কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা চাই; কেন না, কৃষ্ণকে না উঠাইয়া দিলে পুরাতন উঠান যাইবে না।

ইহা ভিন্ন আমার অন্ত এক গুরুতর উদ্দেশ্য আছে। ইতিপূর্বে “ধর্মতত্ত্ব” নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে আমি যে কয়টি কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এই :—

“১। মহত্বের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অহুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মহত্বত্ব।

২। তাহাই মহত্বের ধর্ম।

৩। সেই অহুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই স্বর্গ।”

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অহুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একাধারে হ্রাস। এ সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থেই যাহা বলিয়াছি, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি :—

“শিষ্ট।...জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিন্তে ধর্মাত্মতা এবং হ্রসবে রসিকতা এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় হৃদক ইত্তরা চাই।

* * * * *
* ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণের পরে এবং এই দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল।

প্রথম খণ্ড : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কৃষ্ণের চরিত্র জানিবার উপায়

এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব ? এরূপ মহত্ব ক'রেছি না।

তুচ্ছ ! মহত্ব না দেখে কিব জানেন ! কিবই নরনারীরা তুচ্ছ ও চরম পন্থাগুলির একমাত্র উদাহরণ।

পুনশ্চ :—

“অনন্তপ্রকৃতি কিম্বদ উপাসকের প্রমাণবাহ্যর জাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু কিম্বরের অহঙ্কারী মহত্বেরা, অর্থাৎ বাহাদিগের গুণাবলি দেখিয়া কিম্বাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা বাহাদিগকে মানবদেহধারী কিম্বদ মনে করা যায়, তাঁহারা ই সেখানে বাহাদীর আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্ত বীতশ্রুতী ঐতিহ্যানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বুদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্মপরিবর্তক আদর্শ যেহেতু হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্মগুরুকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। অনবদ্যি হাকবি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অমূল্যলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধিগিরি, অর্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি কজিয়গণ আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কোপীনধারী নির্মল ধর্মবেত্তা। কিন্তু ইহারা তা নয়। ইহারা সর্বগুণবিশিষ্ট—ইহাদিগেতেই সর্বরুতি সর্বানন্দসম্পন্ন স্তুতি পাইয়াছে। ইহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্যকরহেতুও ধর্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান হইয়াও সর্বজননে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, বাহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—বুদ্ধিগিরি বাহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জুন বাহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ বাহার অংশমাত্র, বাহার তুলা মহামহিমাময় চরিত্র কখন মহত্ত্বভাবায় কীর্ণিত হয় নাই।

এই তথ্যটা প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার জন্তেও আমি ক্রীকৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় কি ?

আদৌ এখানে ছুটি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। বাহার দৃঢ়বিশ্বাস করেন যে, কৃষ্ণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা এখন ছাড়িয়া দিই। আমার সকল পাঠক সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন। বাহার সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন, তাঁহারা বলিবেন কৃষ্ণচরিত্রের মৌলিকতা কি ? কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে কখনও বিদ্যমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি ? যদি ছিলেন, তবে তাঁহার চরিত্র যথার্থ কি প্রকার ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় আছে কি ?

আমরা প্রথমে এই দুই সন্দেহের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব।
কৃষ্ণের বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।

- (১) মহাভারত।
- (২) হরিবংশ।
- (৩) পুরাণ।

ইহার মধ্যে পুরাণ আঠারখানি। সকলগুলিতে কৃষ্ণবৃত্তান্ত নাই। নিম্নলিখিত-
গুলিতে আছে।

- (১) ব্রহ্ম পুরাণ।
- (২) পদ্ম পুরাণ।
- (৩) বিষ্ণু পুরাণ।
- (৪) বায়ু পুরাণ।
- (৫) শ্রীমদ্ভাগবত।
- (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ।
- (১৩) স্বন্দ পুরাণ।
- (১৪) বামন পুরাণ।
- (১৫) কুর্শ পুরাণ।

মহাভারত, আর উপরিলিখিত অশ্রু গ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণজীবনী সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রস্তাব আছে। যাহা মহাভারতে আছে, তাহা হরিবংশে ও পুরাণগুলিতে নাই। যাহা হরিবংশে ও পুরাণে আছে, তাহা মহাভারতে নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, মহাভারত পাণ্ডবদিগের ইতিহাস; কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সখা ও সহায়; তিনি পাণ্ডবদিগের সহায় হইয়া বা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল কার্য করিয়াছেন, তাহাই মহাভারতে আছে, ও থাকিবার কথা। প্রসঙ্গক্রমে অশ্রু দুই একটা কথা আছে মাত্র। তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ মহাভারতে নাই বলিয়াই হরিবংশে রচিত হইয়াছিল, ইহা হরিবংশে আছে। ভাগবতেও ঐরূপ কথা আছে। ব্যাস নারদকে মহাভারতের অসম্পূর্ণতা জানাইলেন। নারদ ব্যাসকে কৃষ্ণচরিত্র রচনার উপদেশ দিলেন। অতএব মহাভারতে যাহা আছে, এই ভাগবতে বা হরিবংশে বা অশ্রু পুরাণে তাহা নাই; মহাভারতে, যাহা নাই—পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই আছে।

অতএব মহাভারত সর্বপূর্ববর্তী। হরিবংশাদি ইহার অভাব পূরণার্থ মাত্র। যাহা সর্বপ্রায়ে রচিত হইয়াছিল, তাহাই সর্বাপেক্ষার মৌলিক, ইহাই সম্ভব। কথিত আছে যে, মহাভারত, হরিবংশ, এবং অষ্টাদশ পুরাণ একই ব্যক্তির রচিত। সকলই মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত। একথা সত্য কি না তাহার বিচারে এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আগে দেখা যাউক, মহাভারতের কোন ঐতিহাসিকতা আছে কি না। যদি তাহা না থাকে, তবে হরিবংশে ও পুরাণে কোন ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান বৃথা।

এক্ষণে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে দুই দিকে দুই ধোর বিপদ। এক দিকে, এ দেশীয় প্রাচীন সংস্কার যে, সংস্কৃতভাষায় যে কিছু রচনা আছে, যে কিছুই অনুস্মার আছে, সকলই অভ্রান্ত ঋষি প্রণীত; সকলই প্রতিবাদ বা সন্দেহের অতীত যে সত্য, তাহাই আমাদের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে। বেদবিভাগ, লক্ষ্মণোক্তক মহাভারত, হরিবংশ, অষ্টাদশ পুরাণ, সকল এক জনে করিয়াছেন; সকলই কলিযুগের আরম্ভে হইয়াছে; সেও পাঁচ হাজার বৎসর হইল; আর এই সকল বেদব্যাস যেমন করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই আছে। অনেক লোকে, এ সংস্কারের প্রতিবাদ শুনা দূরে যাউক, যে প্রতিবাদ করিবে, তাহাকে মহাপাতকী, নারকী এবং দেশের সর্বনাশে প্রস্তুত মনে করেন।

এই এক দিকের বিপদ। আর দিকে গুরুতর বিপদ, বিলাতী পাণ্ডিত্য। ইউরোপ ও আমেরিকার কতকগুলি পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধৃত করিতে নিযুক্ত, কিন্তু তাঁহাদের এ কথা অসহ্য যে পরাধীন হ্রস্বল হিন্দুজাতি, কোন কালে সত্য ছিল, এবং সেই সত্যতা অতি প্রাচীন। অতএব দুই চারি জন ভিন্ন তাঁহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব করিতে নিযুক্ত। তাঁহারা স্বপূর্বক ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ সকলে যাহা কিছু আছে—হিন্দুধর্মবিরোধী বৌদ্ধগ্রন্থ ছাড়া—সকলই আধুনিক, আর হিন্দুগ্রন্থে যাহাই আছে তাহা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, নয় অল্প দেশ হইতে চুরি করা। কোন মহাত্মা বলেন, রামায়ণ হোমরের কাব্যের অনুকরণ; কেহ বা বলেন, ভগবদ্গীতা বাইবেলের ছায়ামাত্র। হিন্দুর জ্যোতিষ চীন, যবন বা কাল্ডীয় হইতে প্রাপ্ত; হিন্দুর গণিতও পরের কাছে পাওয়া; লিখিত অক্ষরও কোন সীমীয় জাতীয় হইতে প্রাপ্ত। এ সকল কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের বিচারপ্রণালীর মূলমন্ত্র এই যে, ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে ভারতপক্ষে যাহা পাওয়া যায় তাহা মিথ্যা বা প্রতিক্ষিপ্ত, যাহা ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাওয়া যায় তাহাই সত্য। পাণ্ডবদিগের দ্বারা বীরচরিত্র ভারতবর্ষীয় পুরুষের কথা মিথ্যা,

পাণ্ডব কবিকল্পনা মাত্র, কিন্তু পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর পঞ্চপতি সত্য, কেন না তদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবাসীদের চুরাড় জাতি ছিল, তাহাদিগের মধ্যে জ্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। কণ্ঠসনু সাহেব প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে কতকগুলি বিবস্ত্রা জ্রীমুষ্টি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে জ্রীলোকেরা কাপড় পরিত না; এদিকে মথুরা প্রভৃতি স্থানের অপূর্ব ভাস্কর্য্য দেখিয়া বিলাতী পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক মিস্ত্রীর। যেবর (Weber) সাহেব, কোন মতে হিন্দুদিগের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীনতা উড়াইয়া দিতে না পারিয়া স্থির করিলেন, হিন্দুরা চান্দ্র নক্ষত্র-মণ্ডল বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছে। বাবিলনীয়দিগের যে চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল আদৌ কখনও ছিল না, তাহা চাপিয়া গেলেন। প্রমাণের অভাবেও Whitney সাহেব বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কেন না হিন্দুদের মানসিক স্বভাব তেমন তেজস্বী নয় যে, তাহারা নিজবুদ্ধিতে এত করে।

এই সকল মহাপুরুষগণের মতের সমালোচনায় আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেন না, আমি স্বদেশীয় পাঠকের জন্ত লিখি, হিন্দুদেবীদিগের জন্ত লিখি না। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমার স্বদেশীয় শিক্ষিতসম্প্রদায় মধ্যে অনেকে তাঁহাদের মতের অমু্ভবত্ব। অনেকেই নিজে কিছু বিচার আচার না করিয়াই, কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত বলিয়াই, সেই সকল মতের অমু্ভবত্ব। আমার হুরাকাজ্জা যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করেন। তাই, আমি ইউরোপীয় মতেরও প্রতিবাদে প্রবৃত্ত। যাহাদের কাছে বিলাতী সবই ভাল, যাহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়ৎ বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না, তাঁহাদের আমি কিছু করিতে পারিব না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সত্যপ্রিয় এবং দেশবৎসল। তাঁহাদের জন্ত লিখিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

বলিয়াছি যে, কৃষ্ণচরিত্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে সর্বপূর্ববর্তী। কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বলিলে কি Historyই বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল কুকুরের গল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে “ইতিহাস” নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাতত্ত্ব, অর্থাৎ পূর্বে যাহা ঘটয়াছে তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না—

“ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসম্বিতম্।

পূর্ববৃত্তকথায়ুক্তমিতিহাসং প্রচকতে ॥”

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পষ্টতঃ অলৌক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথাগুলি অলৌক ও অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে ঐ অংশ অলৌক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিকে ও অনৈতিহাসিকে, সত্য ও মিথ্যায়, মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটস্ প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা কেরেশ্‌তা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে—মহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?

এখন ইহাও স্বীকার করা যাউক যে, ঐ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাসগ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্গিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যেটুকু নৈসর্গিক ও সম্ভব ব্যাপারের ইতিবৃত্ত, সেটুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে অসংখ্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাসগ্রন্থে দুই কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনজ্ঞপ্তির উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচনা

করিয়া তাহা প্রস্তুত করেন। দ্বিতীয়, তাহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্তী লেখকেরা আপনাদিগের রচনা পূর্ববর্তী লেখকের রচনা মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণ সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কালনিক ব্যাপারের সম্পর্কে দূষিত হইয়াছে—মহাভারতেও সেইরূপ ঘটনা থাকিবে।

কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অল্প দেশের ইতিহাসগ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাই—মহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে। তাহার তিনটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ এই যে, অসংখ্য দেশে যখন ঐ সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিত হইলে, তাহাতে পরবর্তী লেখকেরা স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান না—লিখিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে। কেন না, প্রাচীন একথানা কাপির দ্বারা অল্প কাপির শুদ্ধাভি নিশ্চিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত, লিপিবদ্ধা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্বপ্রথানুসারে শুদ্ধ-শিষ্ট-পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীস বা অল্প কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রন্থ, মহাভারতের জায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় লেখকদিগের পক্ষে মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অল্প কোন দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই।

তৃতীয় কারণ এই যে, অল্প দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদৃশ অল্প কোন কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনা প্রচার করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাহাদের কখনও ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিকাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ তাহাদিগের অভিপ্রের্ত ছিল না। অনেক গ্রন্থে তৎপ্রণেতার নামমাত্র নাই। অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার প্রণেতা, তাহা আজি পর্য্যন্ত কেহ জানে না। ইন্দ্র-নিকাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের জায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাহার রচনা লোক-মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোকহিত সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন।

এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে যে কিছুই ঐতিহাসিক কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

ইউরোপীয়দিগের মত

অসঙ্গতই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেন, এমন অনেক আছেন। বলা বাহুল্য যে, ইহার ইউরোপীয় পণ্ডিত, অথবা তাঁহাদিগের শিল্প। তাঁহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব।

বিলাতী বিচার একটা লক্ষণ এই যে, তাঁহারা স্বদেশে বাহ্য দেখেন, মনে করেন বিদেশে ঠিক ভাই আছে। তাঁহারা Moor ভিন্ন অপৌরুষ কোন জাতি জানিতেন না, এজন্য এদেশে আসিয়া হিন্দুদিগকে “Moor” বলিতে লাগিলেন। সেইরূপ স্বদেশে Epic কাব্য ভিন্ন পক্ষে রচিত আখ্যানগ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারত ও রামায়ণের সন্ধান পাইয়াই এ দুই গ্রন্থ Epic কাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। যদি কাব্য, তবে আর উহার ঐতিহাসিকতা কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাসিয়া গেল।

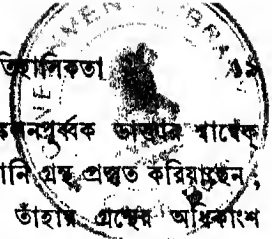
ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বোল কিয়ৎ পরিমাণে ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের দেশী শিল্পেরা ছাড়েন নাই।

কেন, মহাভারতকে সাহেবেরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা তাঁহারা ঠিক বুঝান নাই। উহা পক্ষে রচিত বলিয়া এরূপ বলা হয়, এমনত হইতে পারে না, কেন না, সর্ব প্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পক্ষে রচিত;—বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, সকলই পক্ষে প্রণীত হইয়াছে। তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যংশ বড় সুন্দর;—ইউরোপীয়েরা যে প্রকার সৌন্দর্য Epic কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে Epic বলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ জাতীয় সৌন্দর্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল ও ক্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্তীন ও

মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে আছে। মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্যচরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্য্যহেতু ঐ সকল গ্রন্থ নৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই—মহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে।

মূর্খের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পণ্ডিতে যদি মূর্খের মত কথা কয়, তাহা হইলে কি কর্তব্য? বিখ্যাত Weber সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অন্তর্ভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জন্মনির অরণ্যনিবাসী বর্ষর-দিগের বংশধরের পক্ষে অসম্ভব। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্বদা যত্নশীল। তাঁহার বিবেচনায় যিশু খ্রিষ্টের জন্মের পূর্বে যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই। এতটুকু প্রাচীনতার কথা স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, Chrysostom নামা এক জন ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আসিয়া দাঁড়ি মাঝির মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুষ্টিরাতিরও নাম আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না, কেন না পাণিনিও তাঁহার মতে “কালকের ছেলে”। তবে এক জন ইউরোপীয়ের পবিত্র কর্ণরক্তে প্রবিষ্ট নাবিকবাক্যের কোন প্রকার অবহেলা করিতে তিনি সক্ষম নহেন। অতএব মহাভারত যে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল, ইহা তিনি কায়ক্লেশে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর এক জন ইউরোপীয় লেখক (Megasthenes) যিনি খ্রিষ্ট-পূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক, এবং ভারতবর্ষে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থে মহাভারতের কথা লেখেন নাই। কাজেই বেবর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার সময় মহাভারত ছিল না।* এখানে জন্মান পণ্ডিতটি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক জুয়াচুরি করিয়াছেন। কেন না, তিনি বেশ জানেন যে, মিগাস্থেনিসের ভারতসংস্কায় গ্রন্থ বিত্তমান নাই, কেবল অন্যান্য গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল অংশ

* Since Megasthenes says nothing of this epic, it is not an improbable hypothesis that its origin is to be placed in the interval between his time and that of Chrysostom; for what ignorant sailors took note of would hardly have escaped his observation.



তঁাহাদিগের নিজ নিজ পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্কলনপূর্বক ডাক্তার শ্বানবেক (Dr. Schwanbeck) নামক এক জন আধুনিক পণ্ডিত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহাই এখন মিগাস্থেনিস কৃত ভারতবৃত্তান্ত বলিয়া প্রচলিত। তঁাহার গ্রন্থের আধিকাংশ বিলুপ্ত; সুতরাং তিনি মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। ইহা জানিয়া শুনিয়াও কেবল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্যেবুদ্ধিবশতঃ বেবর সাহেব এরূপ কথা লিখিয়াছেন। তঁাহার প্রণীত ভারত-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত বিষয়ক গ্রন্থে আত্মোপাস্ত ভারতবর্ষের গৌরব লাঘবের চেষ্টা ভিন্ন, অল্প কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। ইহার পর বলা বাহুল্য যে, মিগাস্থেনিস মহাভারতের নাম করেন নাই, ইহা হইতেই এমন বুঝায় না যে, তঁাহার সময়ে মহাভারত ছিল না। অনেক হিন্দু জর্মনি বেড়াইয়া আসিয়াছেন, গ্রন্থও লিখিয়াছেন, তঁাহাদের কাহারও গ্রন্থে ত বেবর সাহেবের নাম দেখিলাম না। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, বেবর সাহেব কখনও ছিলেন না ?

অস্বাভ্য পণ্ডিতেরা, বেবর সাহেবের মত, সব উঠাইয়া দিতে চাহেন না। তঁাহারা যে আপত্তি করেন, তাহা দুই প্রকার ;—

(১) মহাভারত প্রাচীন গ্রন্থ বটে, কিন্তু খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার পূর্বে এরূপ গ্রন্থ ছিল না।

(২) আদিম মহাভারতে পাণ্ডবদিগের কোন কথা ছিল না। পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি কবিকল্পনা মাত্র।

দেশী মত আবার বিপরীত সীমান্তে গিয়াছে। দেশীয়েরা বলেন, কলির আরম্ভের ঠিক পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সময়ে বেদব্যাস বর্তমান ছিলেন। কলির প্রবৃত্তি মাত্র পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ করেন। অতএব কলির আরম্ভেই অর্থাৎ অল্প হইতে ৪৯৯২ বৎসর পূর্বে, মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল।

দুটি মতই যোরতর ভ্রমপরিপূর্ণ। দুই দলের মতেরই খণ্ডন আবশ্যক। তজ্জগৎ প্রথম প্রয়োজনীয় তত্ত্ব এই যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল ইহার নির্ণয়। তাহা নির্ণীত হইলেই কতক বৃত্তিতে পারিব, মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, এবং পাণ্ডবাদি কবিকল্পনা মাত্র কি না ? তাহা হইলেই জানিতে পারিব, মহাভারতের উপর নির্ভর করা যায় কি না ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল

প্রথমে, দেশী মতেরই সমালোচনা আবশ্যক। ৪৯২২ বংসর পূর্বে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, এ কথাটা সত্য নহে; ইহা আমি দেশী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই প্রমাণ করিব। রাজতরঙ্গিনীকার বলেন, কলির ৬৫৩ বংসর গতে গোনন্দী কাশ্মীরে রাজা হইয়াছিলেন। আরও বলেন, গোনন্দী যুদ্ধটির সমকালবর্তী রাজা। তিনি ৩৫ বংসর রাজত্ব করেন। অতএব প্রায় সাত শত বংসর আরও বাদ দিতে হয়। তাহা হইলে ২৪০০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দ পাওয়া যায়।

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে—

সপ্তদ্বীপাক যো পূর্বো দৃশ্যতে উদিতৌ দিবি ।
তয়োস্ত মধ্যানক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥
ভেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তান্তিষ্টম্যাকশতং নৃণাম্ ।
তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাস্ন দ্বিজোত্তম ॥
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাকশতাত্মকঃ ।

৪ অংশঃ, ২৪ অ, ৩৩-৩৪

অর্থ। সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে যে দুইটি তারা আকাশে পূর্বদিকে উদিত দেখা যায়, ইহাদের সমন্বয়ে যে মধ্যানক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বংসর অবস্থান করেন। সপ্তর্ষি পরীক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বংসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

অতএব এই কথা মতে কলির দ্বাদশ শত বর্ষের পর পরিক্ষিতের সময়; তাহা হইলে উপরি উক্ত ৩৪ শ্লোক অনুসারে ১৯০০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল।

কিন্তু ৩৩ শ্লোকে বাহা পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে এ গণনা মিলে না। ঐ ৩৩ শ্লোকের তাৎপর্য্য অতি দুর্গম—সবিস্তারে বুঝাইতে হইল। সপ্তর্ষিমণ্ডল কতকগুলি স্থিরনক্ষত্র, উহার বিলাতী নাম Great Bear বা Ursa Major. মঘা নক্ষত্রও কতকগুলি স্থিরতারা। সকলেই জানেন, স্থিরতারার গতি নাই। তবে বিষুবের একটু সামান্য গতি আছে—ইংরেজ জ্যোতির্বিদেরা তাহাকে বলেন “Precession of the Equinoxes.”

এই গতি হিন্দু মতে প্রতি বৎসর ৫৪ বিকলা। এক এক নক্ষত্রে ১৩৪ অংশ। এ হিসাবে কোন স্থিরতারার এক নক্ষত্রে পরিভ্রমণ করিতে সহস্র বৎসর লাগে—সত বৎসর নয়। তাহা ছাড়া, সপ্তর্ষিমণ্ডল কখনও মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। কারণ মঘা নক্ষত্র সিংহ-রাশিতে। ছাদশ রাশি রাশিচক্রের ভিতর। সপ্তর্ষিমণ্ডল রাশিচক্রের বাহিরে। যেমন ইংলণ্ড ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পুরাণকার ঋষি কি গাঁজা খাইয়া এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন? এমন কথা আমরা বলিতেছি না, আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি যে, এই প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য আমাদের বোধগম্য নহে। কি ভাবিয়া পুরাণকার লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেটলি সাহেব তাহা এইরূপ বুঝিয়াছেন :—

“The notion originated in a contrivance of the astronomers to show the quantity of the precession of the equinoxes : This was by assuming an imaginary line, or great circle, passing through the poles of the ecliptic and the beginning of the fixed Magha, which circle was supposed to cut some of the stars in the Great Bear. * * * The seven stars in the Great Bear being called the Rishis, the circle so assumed was called the line of the Rishis; and being invariably fixed to the beginning of the lunar asterism Magha, the precession would be noted by stating the degree &c. of any moveable lunar mansion out by that fixed line or circle as an index.”

Historical View of the Hindu Astronomy, p. 65.

এইরূপ গণনা করিয়া বেটলি যুধিষ্ঠিরকে ৫৭৫ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দে আনিয়া ফেলিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে যুধিষ্ঠির শাক্যসিংহের অল্প পূর্ববর্তী। আমেরিকার পণ্ডিত Whitney সাহেব বলেন, হিন্দুদিগের জ্যোতিষিক গণনা এত অশুদ্ধ যে, তাহা হইতে কোন কালাবধারণচেষ্টা বৃথা। কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কালাবধারণ হইতে পারে, দেখাইতেছি।

প্রথমতঃ পুরাণকার ঋষির অভিপ্রায় অনুসারেই গণনা করা যাউক। তিনি বলেন যে, যুধিষ্ঠিরের সময়ে সপ্তর্ষি মঘায় ছিলেন, নন্দ মহাপাণ্ডের সময় পূর্বাষাঢ়ায়।

প্রযাত্তন্তি যদা চৈতে পূর্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।

তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেব কলিবুদ্ধিঃ গমিস্ততি ॥ ৪। ২৪। ৩২

তার পর, শ্রীমদ্ভাগবতেও ঐ কথা আছে—

যদা মঘাতো যাত্তন্তি পূর্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।

তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেব কলিবুদ্ধিঃ গমিস্ততি ॥ ১২। ২। ৩২

মধা হইতে পূর্বাষাঢ়া দশম নক্ষত্র; যথা—মধা, পূর্বকল্পনী, উত্তরকল্পনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অহরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া। অতএব যুধিষ্ঠির হইতে নন্দ $১০ \times ১০০ =$ সহস্র বৎসর অন্তর।

এখন, আর এক প্রকার গণনা যাহা সকলেই বুঝিতে পারে তাহা দেখা যাউক। বিষ্ণুপুরাণের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার পূর্বশ্লোক এই :—

যাবৎ পরিক্রিতো জগৎ যাবদ্বন্দ্যভিষেচনম্।

এতদ্বব্দসহস্রকৃত জেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ৪। ২৪। ৩২

নন্দের পুরা নাম নন্দ মহাপদ্ম। বিষ্ণুপুরাণে ঐ ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে—

“মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ একবর্ষশতমবনীপত্যয়োঃ ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কোটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্রবিদ্যাতি। তেষামভাবে মৌর্য্যশ্চ পৃথিবী ভোক্তাভি। কোটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যোহভিষেক্যতি।”

ইহার অর্থ—মহাপদ্ম এবং তাঁহার পুত্রগণ একশতবর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন। কোটিল্য নামে ব্রাহ্মণ নন্দবংশীয়গণকে উন্মূলিত করিবেন। তাঁহাদের অভাবে মৌর্য্যগণ পৃথিবী ভোগ করিবেন। কোটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যোভিষিক্ত করিবেন।

তবেই যুধিষ্ঠির হইতে চন্দ্রগুপ্ত ১১১৫ বৎসর। চন্দ্রগুপ্ত অতি বিখ্যাত সম্রাট—ইনিই মাকিদনীয় যবন আলেকজন্দর ও সিলিউকস্ নৈকট্যের সমসাময়িক। ইনি বাহুবলে মাকিদনীয় যবনদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন, এবং প্রবলপ্রতাপ সিলিউকসকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত দোদীপ্তপ্রতাপ তখন কেহই পৃথিবীতে ছিলেন না। কথিত আছে, তিনি অকুতোভয়ে আলেকজন্দরের শিবিরमध्ये প্রবেশ করিয়াছিলেন। আলেকজন্দর ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খ্রিঃ অব্দে রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন। অতএব ঐ ৩১৫ অব্দের সহিত উপরিলিখিত ১১১৫ যোগ করিলেই যুধিষ্ঠিরের সময় পাওয়া যাইবে। $৩১৫ + ১১১৫ = ১৪৩০$ খ্রিঃ পূঃ তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়।

অত্যাশ্চর্য পুরাণেও ঐরূপ কথা আছে। তবে মৎস্য ও বায়ু পুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৪৬৫ পাওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে ইহার বড় বেশি পূর্বে হয় নাই, বরং কিছু পরেই হইয়াছিল, তাহার এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়—গণিত জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না—“চন্দ্রাকৌ যত্র সাক্ষিনৌ।”

সকলেই জানে যে বৎসরের দুইটি দিনে দিবারাত্র সমান হয়। সেই দুইটি দিন একের ছয় মাস পরে আর একটি উপস্থিত হয়। উহাকে বিষুব বলে। আকাশের যে যে স্থানে ঐ দুই দিনে সূর্য থাকেন, সেই স্থান দুইটিকে ক্রান্তিপাত বা ক্রান্তিপাতবিন্দু (Equinoctial point) বলে। উহার প্রত্যেকটির ঠিক ৯০ অংশ (90 degrees) পরে অয়ন পরিবর্তন হয় (Solstice)। ঐ ৯০ অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে, বা উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে যান।

মহাভারতে আছে, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি শরশয্যাশায়ী হইলে বলিয়াছিলেন যে, আমি দক্ষিণায়নে মরিব না, (তাহা হইলে সদগতির হানি হয়); অতএব শরশয্যায় শুইয়া উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্বে ভীষ্ম বলিতেছেন,—

“মাঘোহয়ং সমুদ্রপ্রাপ্তো মাঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।”

তবে, তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হয়, কেন না ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎপূর্বদিনকে মকর-সংক্রান্তি বলে। কিন্তু তাহা আর হয় না। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণিত হইয়াছিল; তখন আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ করা হইত, এবং তখনই ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে, এখন ফাল্গুন সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এখন আর অশ্বিনী নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় না; এবং এখন ১লা মাঘে পূর্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন ৭ই পৌষ বা ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ হয়। ইহার কারণ এই যে ক্রান্তিপাত-বিন্দুর একটা গতি আছে, ঐ গতিতে ক্রান্তিপাত, সুতরাং অয়নপরিবর্তনস্থানও, বৎসর বৎসর পিছাইয়া যায়। ইহাই পূর্বকথিত Precession of the Equinoxes—হিন্দু নাম “অয়নচলন”। কত পিছাইয়া যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে। হিন্দুরা বলেন, বৎসরে ৫৪ বিকলা, ইহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্য ভুল আছে। ১৭২ খ্রিঃ-পূর্বাব্দে হিপার্কাস্ নামা গ্রীক জ্যোতির্বিদ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রা নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মার্কোলাইন্ ১৮০২ খ্রিঃ অব্দে চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কলা ৪ বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্বিদ Leverrier ঐ গতি অস্থ্য কারণ হইতে ৫০'২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন, এবং সর্বশেষে Stookwell গণিয়া ৫০'৪০৮

বিকলা পাইয়াছেন। এই গণনা প্রথম গণনার সঙ্গে মিলে। অতএব ইহাই গ্রহণ করা যাইক।

ভীষ্মের যুত্য়কালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাঘের* কোন দিনে তাহা লিখিত নাই। পৌষ মাঘে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই দুই মাসে মোটে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এমন হইতে পারে না যে, তখন মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেন না, তাহা হইলে “মাঘোহয়ং সমুপ্রাপ্তঃ” কথাটি বলা হইত না। ২৮শে মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাৎ। ৪৮ দিনে রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধরা যাঁইতে পারে; কিন্তু ইহা ঠিক বলা যায় না, কেন না রবির শীত্ৰগতি ও মন্দগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২৯শে মাঘ পর্যন্ত রবিস্ফুট বাঙ্গালা পঞ্জিকা ধরিয়া গণিলে ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। ঐ ৪৪ অংশ ৪ কলা লইলে খ্রি: পূ: ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পূরা লইলে খ্রি: পূ: ১৫৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা কোন মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খ্রি: পূ: ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ ছাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। তাহা যদি হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর চৈত্রে হইতে পারে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা।

ইউরোপীয় মত

মহাভারতের যুদ্ধকাল সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে আনাদিগের কোন মারাত্মক মতভেদ হইতেছে না। কোলব্রুক সাহেব গণনা করিয়াছেন, খ্রি: পূ: চতুর্দশ শতাব্দীতে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। উইলসন সাহেবও সেই মতাবলম্বী। এলফিনষ্টোন তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। উইলফোর্ড সাহেব বলেন, খ্রি: পূ: ১৩৭০ বৎসরে ঐ যুদ্ধ হয়। বুকাননের

* যে কালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারি। হুম বতুর কথা মহাভারতেরই আছে। যার মাপ দহিলে হয় ঋতু হয় না।

মত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। প্রাট সাহেব মণনা করিয়াছেন, শ্রি: পু: ষাটশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি যে, ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, মহাভারত খ্রিষ্ট-পূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। এবং আদিম মহাভারতে পাণ্ডবদিগের কোন কথা ছিল না—ও সব পশ্চাত্তী কবিদিগের কল্পনা, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত।

যদি এই দ্বিতীয় কথাটা সত্য হয়, তবে মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, সে কথার মীমাংসার কিছু প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে, যবেই মহাভারত প্রণীত হউক না কেন—কৃষ্ণঘটিত কথা যাহা কিছু এখন মহাভারতে পাওয়া যায়, সবই মিথ্যা। কেন না, কৃষ্ণঘটিত মহাভারতীয় সমস্ত কথাই প্রায় পাণ্ডবদিগের সঙ্গে সম্বন্ধহীন। অতএব আগে দেখা উচিত যে, এই শেষোক্ত আপত্তির কোন প্রকার জায্যতা আছে কি না।

প্রথমতই লাসেন্ সাহেবকে ধরিতে হয়—কেন না, তিনি বড় লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ জর্মান পণ্ডিত। মহাভারত যবেই প্রণীত হউক, তিনি স্বীকার করেন যে, ইহার কিছু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি যেটুকু স্বীকার করেন, সেটুকু এই মাত্র যে, মহাভারতে যে যুদ্ধ বর্ণিত আছে, তাহা কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ—পাণ্ডবগণকে অনৈতিহাসিক কবিকল্পনা-প্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দেন। বেবর সাহেবও সে মত গ্রহণ করেন। সর মনিয়র উইলিয়মস্, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেকেই সেই মতের অবলম্বী। মতটা কি, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতেছি।

কুরু নামে এক জন রাজা ছিলেন। আমরা পুরাণেতিহাসে শুনি, তৎকালীয় রাজগণকে কুরু বা কৌরব বলা যায়। তাঁহাদিগের অধিকৃত দেশবাসিগণকেও ঐ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কুরু শব্দে কৌরবাধিকৃত জনপদবাসীদিগকে বুঝাইল। পাঞ্চালেরা দ্বিতীয় জনপদবাসী। এই অর্থেই পাঞ্চাল শব্দ মহাভারতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুই জনপদ পরস্পর সন্নিহিত। উত্তর পশ্চিমে যে সকল জনপদ ছিল, মহাভারতীয় যুদ্ধের পূর্বে এই দুই জনপদ তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বোধ হয় এককালে এই দুই জনপদবাসিগণ মিলিতই ছিল। কেন না কুরু-পাঞ্চাল পদ বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরে তাহাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিরোধের পরিণাম মহাভারতের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কুরুগণ পাঞ্চালগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল।

এত দূর পর্য্যন্ত আমরা কোন আপত্তি করি না, এবং এ কথায় আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বস্তুতঃ কুরুগণের প্রকৃত বিপক্ষগণ পাঞ্চালগণই বটে। মহাভারতে

কৌরবদিগের প্রতিযুদ্ধকারী সেনা পাকাল সেনা, অথবা পাকাল ও সৃঞ্জয়গণ* বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। পাকালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নই সেই সেনার সেনাপতি। পাকালরাজপুত্র শিখণ্ডীই কৌরবপ্রধান ভীষ্মকে নিপাতিত করেন। পাকালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবাচার্য্য দ্রোণকে নিপাতিত করেন। যদি এ যুদ্ধ প্রধানতঃ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রদিগের যুদ্ধ হইত, তাহা হইলে ইহাকে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ কখনই বলিত না, কেন না পাণ্ডবেরাও কুরু ; তাহা হইলে ইহাকে ধার্তরাষ্ট্র-পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ বলিত। ভীষ্ম, এবং কৌরবাচার্য্য দ্রোণ ও কৃপের সঙ্গে ধার্তরাষ্ট্রদিগের যে সম্বন্ধ, পাণ্ডবদিগের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ, স্নেহও তুল্য। যদি এ যুদ্ধ ধার্তরাষ্ট্র-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইত, তবে তাঁহারা কখনই দুর্য্যোধনপক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন না—কেন না, তাঁহারা ধর্ম্মাত্মা ও শ্রায়পর। কুরুপাকালের বিরোধ পাণ্ডবগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, ইহা মহাভারতেই আছে। মহাভারতেই আছে যে, পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রগণ প্রভৃতি সকল কৌরব মিলিত এবং দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া, পাকালরাজ্য আক্রমণ করেন। এবং পাকালরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অতিশয় লাঞ্ছনা করেন।

অন্তএব এই যুদ্ধ যে প্রধানতঃ কুরুপাকালের যুদ্ধ, স্বীকার করি। স্বীকার করিয়া, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। তাঁহারা বলেন যে, যুদ্ধটা কুরুপাকালের, পাণ্ডবেরা কেহ নহেন, পাণ্ডু বা পাণ্ডব কেহ ছিলেন না। এ সিদ্ধান্তের অশ্রু হেতুও তাঁহারা নির্দেশ করেন। সে সকল হেতুর সমালোচনা আমি পশ্চাৎ করিব। এখন ইহা বুঝাইতে চাই যে, কুরু-পাকালের যুদ্ধ বলিয়া যে পাণ্ডবদিগের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, ইহা সম্ভব নহে। পাণ্ডবের শ্বশুর পাকলাধিপতি ধার্তরাষ্ট্রদিগের উপর আক্রমণ করিলে, পাণ্ডবেরা তাঁহার সহায় হইয়া, তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব। পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই ;—কৌরবাধিপতি বিচিত্রবীৰ্য্যের দুই পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু†। ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ, কিন্তু অন্ধ। অন্ধ বলিয়া রাজ্যশাসনে অনধিকারী বা অক্ষম। রাজ্য পাণ্ডুর হস্তগত হইল। পরিশেষে পাণ্ডুকেও রাজ্যচ্যুত ও অরণ্যচারী দেখি—ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আবার ধৃতরাষ্ট্রের হাতে গেল। তাহার পর পাণ্ডুপুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, রাজ্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিল, কাজেই ধৃতরাষ্ট্র ও ধার্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাদিগকে নির্বাসিত করিলেন। তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া

* সৃঞ্জয়েরা পাকালভূক্ত—ভাষ্যদিগের জ্ঞাপ্তি।

† বিষ্ণুর বৈভবান্নাত।



পরিশেষে পাঞ্চালরাজের কন্যা বিবাহ করিয়া পাঞ্চালদিগের সহিত আত্মীয়তা সংস্থাপন করিলেন। পাঞ্চালরাজের সাহায্যে এবং তাঁহাদিগের মাতুলপুত্র ও প্রবলপ্রতাপ যাদবদিগের নেতা কৃষ্ণের সাহায্যে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে নূতন রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। পরিশেষে সে রাজ্যও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের করকবলিত হইল।

পাণ্ডবেরা পুনর্ব্বার বনচারী হইলেন। এই অবস্থায় বিরাটের সঙ্গে সখ্য ও সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। পরে পাঞ্চালেরা কৌরবদিগকে আক্রমণ করিল। পূর্ববৈর ঐতিশোধ-জ্ঞাত্য এ আক্রমণ, এবং পাণ্ডবদিগের রাজ্যাধিকার উপলক্ষ মাত্র কি না, স্থির করিয়া বলা যায় না। যাই হোক, পাঞ্চালেরা যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলে পাণ্ডবেরা তাঁহাদের পক্ষ থাকিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত যুদ্ধ করাই সম্ভব।

বলিয়াছি যে পাণ্ডব ছিল না, এ কথা বলিবার, উপরিলিখিত পণ্ডিতেরা অশ্রু কারণ নির্দেশ করেন। একটি কারণ এই যে, সমসাময়িক কোন গ্রন্থে পাণ্ডব নাম পাওয়া যায় না। উত্তরে হিন্দু বলিতে পারেন, এই মহাভারতই ত সমসাময়িক গ্রন্থ—আবার চাই কি? সে কালে ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না যে, কতকগুলি গ্রন্থে তাঁহাদের নাম পাওয়া যাইবে। তবে ইউরোপীয়েরা বলিতে পারেন যে, শতপথব্রাহ্মণ একখানি অনল্প-পরবর্ত্তী গ্রন্থ। তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র, পরিক্ষিৎ এবং জনমেজয়ের নাম আছে, কিন্তু পাণ্ডবদিগের নামগন্ধ নাই—কাজেই পাণ্ডবেরাও ছিল না।

এরূপ সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষীয় প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে হইতে পারে না। কোন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে মাকিদনের আলেক্জান্দরের নামগন্ধ নাই—অথচ তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া যে কাণ্ডটা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা কুরুক্ষেত্রের স্থায়ী গুরুতর ব্যাপার। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি আলেক্জান্দর নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, এবং গ্রীক ইতিহাসবেত্তারা তদ্বৃ্ত্তান্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কবিকল্পনামাত্র? কোন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে গজেনবী মহম্মদের নামগন্ধ নাই—সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, ইনি মুসলমান লেখকদিগের কল্পনাপ্রসূত ব্যক্তি মাত্র? বাঙ্গালার সাহিত্যে বখ্তিয়ার খিলজির নামমাত্র নাই—সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, ইনি মিন্‌হাজদ্দিনের কল্পনাপ্রসূত মাত্র? যদি তাহা না হয়, তবে একা মিন্‌হাজদ্দিনের বাক্য বিশ্বাসযোগ্য হইল কিসে, আর মহাভারতের কথা অবিশ্বাসযোগ্য কিসে?

বেবর সাহেব বলেন, শতপথব্রাহ্মণে অর্জুন শব্দ আছে, কিন্তু ইহা ইন্দ্রার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—কোন পাণ্ডবকে বুঝায় এমন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এজন্য তিনি বুঝিয়াছেন

যে, পাণ্ডব অর্জুন মিথ্যাকল্পনা, ইন্দ্রস্থানে ইনি আদিষ্ট হইয়াছেন মাত্র। এ বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে আমরা অক্ষম। ইন্দ্রার্থে অর্জুন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এজন্য অর্জুন নামে কোন মনুষ্য ছিল না, এ সিদ্ধান্ত বুঝিতে আমরা অক্ষম।

কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিত, কিন্তু বেবর সাহেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বেদ ছাপাইয়াছেন; আর আমরা একে বাঙ্গালী, তাতে গণ্ডমূর্খ, তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া বড় হুঁতোর কাজ হয়। তবে, কথাটা একটু বুঝাই। শতপথব্রাহ্মণে, অর্জুন নাম আছে, কাস্তন নামও আছে। যেমন অর্জুন ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডব উভয়ের নাম, কাস্তনও তেমনই ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডব উভয়ের নাম। ইন্দ্রের নাম ফাস্তন, কেন না ইন্দ্র ফল্গুনী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা; * অর্জুনের নাম ফাস্তন, কেন না তিনি ফল্গুনী নক্ষত্রে জন্মিয়াছিলেন। হয়ত ইন্দ্রাধিষ্ঠিত নক্ষত্রে জন্ম বলিয়াই তিনি ইন্দ্রপুত্র বলিয়া খ্যাত; ইন্দ্রের ঔরসে তাঁহার জন্ম এ কথায় কোন শিক্তি পাঠকই বিশ্বাস করিবেন না। আবার অর্জুন শব্দে গুরু। মেঘদেবতা ইন্দ্রও গুরু নহে, মেঘবর্ণ অর্জুনও গুরুবর্ণ নহে। উভয়ে নির্মলকর্ণকারী, গুরু, পবিত্র; এজন্য উভয়েই অর্জুন। ইন্দ্রের নাম যে অর্জুন, শতপথ-ব্রাহ্মণে সে কথাটা এইরূপে আছে—“অর্জুনো বৈ ইন্দ্রো যদন্ত গুহ্য নাম”; অর্জুন, ইন্দ্র; সেটি ইহার গুহ্য নাম। ইহাতে কি বুঝায় না যে, অর্জুন নামে অস্ত্র ব্যক্তি ছিল, তাঁহার মহিমাবুদ্ধির অভিপ্রায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার ঐক্যস্থাপনজন্য, অর্জুনের নাম, ইন্দ্রের একটা লুকানো নাম বলিয়া প্রচারিত করিতেছেন? বেবর সাহেব “গুহ্য” অর্থে “mystic” বুঝিয়া, লোককে বোকা বুঝাইয়াছেন।

আর একটি রহস্যের কথা বলি। কুরচি গাছের নামও অর্জুন। আবার কুরচি গাছের নামও কাস্তন। এ গাছের নাম অর্জুন, কেন না ফুল শাদা; ইহার নাম কাস্তন, কেন না ইহা কাস্তন মাসে ফুটে। এখন আমার বিনীত নিবেদন যে, ইন্দ্রের নামও অর্জুন ও কাস্তন বলিয়া আমাদের কাছে বলিতে হইবে যে, কুরচি গাছ নাই, ও কখনও ছিল না? পাঠকেরা সেইরূপ অসুস্থতি করুন, আমি মহামহোপাধ্যায় Weber সাহেবের জয় গাই।

এই সকল পণ্ডিতেরা বলেন যে, কেবল ললিতবিস্তরে, পাণ্ডবদিগের নাম পাণ্ডয়া যায় বটে, কিন্তু সে পাণ্ডবেরা পার্বত্য দম্ভ্য মাত্র। আমাদের বিবেচনা, তাহা হইতে এমন বুঝা যায় না যে, পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব পাঁচ জন কখন জগতে বর্তমান ছিলেন না। বাঙ্গালা

* এখনকার বৈষ্ণবেরা এ কথা বলেন না, কিন্তু শতপথব্রাহ্মণেই এ কথা আছে। ২ কাত, ১ অধ্যায়, ২ ব্রাহ্মণ, ১১, দেখ।

সাহিত্যে “ফিরঙ্গী” শব্দ যে ছুই একখানা গ্রন্থে পাওয়া যায়, সে সকল গ্রন্থে ইহার অর্থ হয়, “Eurasian” নয় “European”—“Frank” শব্দ কোথাও পাওয়া যায় না, বা এ অর্থে “ফিরঙ্গী” শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা হইতে যদি আমরা সিদ্ধ করি যে, “Frank” জাতি কখন ছিল না, তাহা হইলে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও তাঁহাদের শিষ্যগণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরাও সেই ভ্রমে পতিত হইব। *

* “বৌদ্ধ-গ্রন্থকারেরা পাণ্ডব নামে পূর্বত-বাসী একটি জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহারা উজ্জয়িনী ও কোল-বাসীদের শত্রু ছিল। (Weber's H. I. Literature, 1878, p. 185.) মহাভারতে পাণ্ডবদিগকে হস্তিনাপুরবাসী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থেরও স্থলবিশেষে লিখিত আছে, গ্রন্থে তাহারা হিমালয় পর্বতে থাকিয়া পরিবর্তিত হন।

এবং পাণ্ডা: হুতা: পঞ্চ দেবদত্তা মহাবল্য:। **

** বিবর্তমানান্তে তত্র পুণ্যে হৈমবতে সিরৌ।

আদিপর্ক। ১২৪। ২১-২২।

এইরূপে পাণ্ডব দেব-দত্ত পাঁচটি মহাবল পুত্র *** সেই পবিত্র হিমালয় পর্বতে পরিবর্তিত হইতে থাকেন।

মিনি ও মলিনন্দ নামে গ্রাক গ্রন্থকারেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে বাহ্লীক দেশের উত্তরাংশে সোণ্ডিয়েনা দেশের একটি নগরের নাম পাণ্ডা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সিন্ধু নদীর মুখ-সমীপস্থ জাতিবিশেষকেও পাণ্ডা বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ক্রুনালখিং টেলসি পাণ্ডা-নাম লোকবিশেষকে বিজ্ঞতা নদীর সমীপস্থ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। কাত্যায়ন একটি পাণ্ডিনি নৃত্যের বার্ত্তিকে পাণ্ডু হইতে পাণ্ডা শব্দ নিস্পন্ন করিয়াছেন *। লক্ষ্মীধর স্বকৃত বড়ভাষাচক্রিকার মধ্যে কেকর বাহ্লীকদিগের উত্তরবিকৃৎ কতকগুলি জনপদের সহিত পাণ্ডা দেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং সে সমুদয়কে পিশাচ জর্বার্জ অসত্য দেশবিশেষ বলিয়া কীর্তন করিয়া গিয়াছেন।

“পাণ্ড্যকেকরবাহ্লীক *** এতে শৈশাচিষ্যোঃ জাঃ।”

হরিবংশে দক্ষিণবিকৃৎ চোল কেরলাধির সহিত পাণ্ডা দেশের নাম উল্লিখিত আছে। (হরিবংশ, ৩২ অ, ১২৪ ধ্রুঃ।) অতএব উহা দক্ষিণাংশের অন্তর্গত পাণ্ডা দেশ। জীমান্ উইলসন্ বিবেচনা করেন, ঐ জাতীয় লোক গ্রন্থে সোণ্ডিয়েনা দেশের অধিবাসী ছিল, তথা হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করে এবং উত্তরোত্তর ঐ সমস্ত ভি ওর হানে অধিবাস করিয়া পঞ্চাং হস্তিনাপুর-বাসী হয়, ও অবশেষে দক্ষিণাংশে সিয়া পাণ্ডারাজ্য সংস্থাপন করে। Asiatic Researches, Vol. XV. pp. 95 and 96.

রাজতরঙ্গিনীর মতে, কানীর রাজ্যের প্রথম রাজারা কুরুবংশীয়। অতএব তৎকালেই পাণ্ডবদের হস্তিনায় আসিয়া উপনিবেশ করা সম্ভব। তাহারা মধ্যদেশবাসী অথচ কিরূপে পাণ্ডব বলিয়া পরিচিত হইলেন এই সমস্তা পূরণার্থেই কি পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব বলিয়া ক্রমশঃ একটি জনপ্রবাদ প্রচারিত হইল? তাহাদের অনন্তভাষ্যবৃত্তি গোলযোগ এসিদ্ধই আছে। লোকের তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল তাহারও নিবারণ পাওয়া যায়।

যদা চিরযুত: পাণ্ড: কথং তত্তেতি চাপরে।

আদিপর্ক। ১১। ১১৭।

অত অত্ গোকে বলিল, “বহুকাল অতীত হইল, পাণ্ডু প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, অতএব ইঁহারা কিরূপে তবীর পুর হইতে পাসেন?”

ভারতবর্ষীয় উপাদক সম্প্রদায়, অক্ষরকুমার দত্ত প্রণীত, দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমণিকা, ১০৫ পৃঃ। অক্ষর বাহু সচরাচর ইউরোপীয়-দিগের মতের অবলম্বী।

* পাণ্ডোর্বপ, বক্তব্য:।—বার্ত্তিক।

এখনও লাসেন সাহেবের মতের সমালোচনা বাকি আছে। তিনি বলেন, কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যাপার; মহাভারতের ততটুকু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি পাণ্ডবপ্রভৃতি নায়কনায়িকাদিগের প্রতি অবিশ্বাসযুক্ত। তিনি বলেন, অর্জুনাদি সব রূপকমাত্র। যথা—অর্জুন শব্দের অর্থ শ্বেতবর্ণ, এজ্ঞা যাহা আলোকময়, তাহাই অর্জুন। যিনি অন্ধকার, তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণাও তজ্জপ। পাণ্ডবদিগের অনবস্থানকালে যিনি রাজ্যধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ধৃতরাষ্ট্র। পঞ্চপাণ্ডব পাঞ্চালের পাঁচটি জাতি, এবং পাঞ্চালীর সহিত তাঁহাদিগের বিবাহ ঐ পঞ্চজাতির একীকরণ-সূচক মাত্র। যিনি ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, তিনি শ্রুভদ্রা। অর্জুনের সঙ্গে যাদবদিগের সৌহৃদ্যই এই শ্রুভদ্রা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি স্বীকার করি, হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ সকলে—বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে, কাব্যেও রূপকের অতিশয় প্রাবল্য। অনেক রূপক আছে। এই গ্রন্থে আমরা দিগকেও অনেকগুলি রূপকের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন স্বীকার করিতে পারি না যে, হিন্দুশাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, সবই রূপক—যে রূপক ছাড়া শাস্ত্রগ্রন্থে আর কিছুই নাই।

আমরা ইহাও জানি যে, সংস্কৃত সাহিত্যে বা শাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, তাহা রূপক হউক বা না হউক, রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে অনেকেই ভালবাসেন। রামের নামের ভিতর ‘রম্’ ধাতু পাওয়া যায়, এবং সীতার নামের ভিতর ‘সি’ ধাতু পাওয়া যায়, এই জ্ঞান রামায়ণ কৃষিকার্যের রূপকে পরিণত হইয়াছে। জর্শন্ পণ্ডিতেরা এমনই দুই চারিটা ধাতু আশ্রয় করিয়া ঋষিদের সকল সূক্তগুলিকে সূর্য্য ও মেঘের রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। চেষ্টা করিলে, বোধ করি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা এইরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায়। আমরা দিগের মনে পড়ে, এক সময় রহস্তচ্ছলে আমরা বিখ্যাত নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রকে এইরূপ রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। তোমরা বলিবে, তিনি সে দিনের মানুষ—তাঁহার রাজধানী, রাজপুরী, রাজবংশ, সকলই আজিও বিদ্যমান আছে, তিনিও ইতিহাসে কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন। তাঁহার উত্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণ অর্থে অন্ধকার, তমোরূপী। কৃষ্ণনগরে অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ স্থানে তাঁহার রাজধানী। তাঁহার ছয় পুত্র, অর্থাৎ তমোগুণ হইতে ছয় রিপূর উৎপত্তি। এক জন বালক পলাসির যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ রূপক করিয়াছিল যে, পলমাত্র উদ্ভাসিত যে অসি, তাহা ক্লীবগুণযুক্ত ক্লৈব (Clive) কর্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায় সুরাজা অর্থাৎ যিনি উত্তম রাজা ছিলেন, তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। অতএব রূপকের

অভাব নাই। আর এই বালকরচিত রূপকের সঙ্গে লাসেন্‌রচিত রূপকের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। আমরা ইচ্ছা করিলে, ‘লস্’ খাত্তু খোদ লাসেন্‌ সাহেবের নামের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়া, তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা ক্রীড়াকৌতুক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক Talboys Wheeler সাহেবেরও একটা মত আছে। যখন হস্তী অশ্ব তলগামী, তখন মেঘের জলপরিমাণেচ্ছার প্রতি বেশী লক্ষ্য করা যায় না। তিনি বলেন,—হাঁ, ইহার কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য মাত্র—

“The adventures of the Pandavas in the jungle, and their encounters with Asuras and Rakshasas are all palpable fictions, still they are valuable as traces which have been left in the minds of the people of the primitive wars of the Aryans against the Aborigines.”

তল্‌বয়স্‌ জুইলর সাহেব সংস্কৃত জ্ঞানেন না, মহাভারত কখনও পড়েন নাই। তাঁহার অরলম্বন বাবু অবিনাশচন্দ্র বোধ নামে কোন ব্যক্তি। তিনি অবিনাশ বাবুকে অনুবোধ করিয়াছিলেন যে, মূল মহাভারত অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে দেন। অবিনাশ বাবু রহস্যপ্রিয় লোক সন্দেহ নাই, কাশীদাসের মহাভারত হইতে কত দূর অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু জুইলর সাহেব চন্দ্রহাস ও বিষয়ার উপাখ্যান প্রভৃতি সামগ্রী মূল মহাভারতের অংশ বলিয়া পাচার করিয়াছেন। যে বর্ষীয়সী মাণিকপীরের গান শুনিয়া রামায়ণভ্রমে অশ্রুমোচন করিতেছিল, বোধ হয়, সেও এই পণ্ডিতবরের অপেক্ষা উপহাসাস্পদ নহে। ঈদৃশ লেখকের মতের প্রতিবাদ করা পাঠকের সময় ব্যথা নষ্ট করা বিবেচনা করি। ফলে, মহাভারতের যে অংশ মৌলিক, তাহার লিখিত বৃত্তান্ত ও পাণ্ডবাদি নায়ক সকল কল্পনাপ্রসূত এরূপ বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত কারণ এ পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সকলই এইরূপ অকিঞ্চিৎকর। সকলগুলির প্রতিবাদ করিবার এ গ্রন্থে স্থান হয় না। মহাভারতের অনেক ভাগ প্রক্ষিপ্ত, ইহা আমি স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডবদিগের সকল কথা প্রক্ষিপ্ত নহে। ইহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা ঐতিহাসিক, ইহা বিবেচনা করিবার কারণ যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি যথেষ্ট না হয়, তবে পরপরিচ্ছেদে আরও কিছু বলিতেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা

পানিনি সূত্র করিয়াছেন,—

মহান্ ব্রীহপরাকৃষ্টীষাসজাবালভারভারতহৈলিহিলরৌববপ্রবৃক্ষেষ্ণু । ৬।২।৩৮

অর্থাৎ ব্রীহি ইত্যাদি শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। তাহার মধ্যে একটি শব্দ ‘ভারত’। অতএব পানিনিতে মহাভারত শব্দ পাওয়া গেল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ ভিন্ন আর কোন বস্তু “মহাভারত” নামে কখনও অভিহিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই। Weber সাহেব বলেন, এখানে মহাভারত অর্থ ভরতবংশ। এটা কেবল তাঁহার গায়ের জোর। এমন প্রয়োগ কোথাও নাই।

পুনশ্চ, পানিনিসূত্র—

“গবিশ্বিভ্যাং স্থিঃ।” ৮।৩।২৫

গবি ও যুধি শব্দের পর স্থি শব্দের স স্থানে ব হয়। যথা—গবিস্থিঃ, যুধিস্থিঃ।

পুনশ্চ,—

“বহ্লচ ইজঃ প্রাচ্যভরতেষ্ণু।” ২।৪।৬৬

ভরতগোত্রের উদাহরণ “যুধিস্থিরাঃ।” *

পুনশ্চ,—

“স্মিরামবস্তিকুস্তিকুভ্যশ্চ।” ৪।১।১৭৬

পাওয়া গেল “কুস্তী”।

পুনশ্চ,—

“বাস্তদেবার্জুনভ্যাং বুন্।” ৪।৩।২৮

অর্থাৎ, বাস্তুদেব ও অর্জুন শব্দের পর বষ্ঠ্যার্থে বুন্ হয়।

পুনশ্চ,—

“নভাণ্ণপায়বোনাসত্যানমুচিনকুলনখনপুংসকনক্ষত্রনজ্ঞনাকেষু।” ৬।৩।৭৫

ইহাতে “নকুল” পাওয়া গেল।

* উদাহরণটি সিদ্ধান্তকোষদ্বারা, ইহা বলা কর্তব্য।

দ্রোণপর্বতশীর্ষভাগতত্তাম্। ৪।১।১০৩

“দ্রোণায়ন” শব্দ পাওয়া গেল। ইহাতে অশ্বখামা ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। এইরূপ পাঁচটি পাণ্ডবের নামই এবং কুন্তী, দ্রোণ, অশ্বখামা প্রভৃতির নাম পাণিনিমূলে পাওয়া যায়।

যদি মহাভারত গ্রন্থের নাম এবং সেই গ্রন্থের নায়কদিগের নাম পাওয়া গেল, তবে পাণিনির সময়েও মহাভারত পাণ্ডবদিগের ইতিহাস। এখন দেখিতে হইবে, পাণিনি কবেকার লোক।

ভারতজ্যেষ্ঠী Weber সাহেব তাঁহাকেও আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহার মত চলে নাই,—স্বয়ং গোন্ডষ্ট্রুকের পাণিনির অভ্যুদয়-কাল নির্ণীত করিয়াছেন। তিনি যাহা বলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার স্থান এ নহে; কিন্তু বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহার গ্রন্থের সারাংশ বাঙ্গালায় সঙ্কলন করিয়াছেন, অতএব না বলিলেও চলিবে। যাহারা বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িতে ঘৃণা করেন, তাঁহারা গোন্ডষ্ট্রুকের গ্রন্থই ইংরাজিতে পড়িতে পারেন। তাঁহার বিচারে পাণিনি অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, একজ্ঞ Weber সাহেব অতিশয় হুঃখিত। তিনি গোন্ডষ্ট্রুকের প্রতিবাদও করিয়াছেন, এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন, জয়পতাকা আমিই উড়াইয়াছি। কিন্তু আর কেহ তাহা বলে না।

গোন্ডষ্ট্রুকের প্রমাণ করিয়াছেন যে, পাণিনির সূত্র যখন প্রণীত হয়, তখন বুদ্ধদেবের * আবির্ভাব হয় নাই। তবেই পাণিনি অন্ততঃ খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। কিন্তু কেবল তাহাই নহে, তখন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ প্রভৃতি বেদাংশ সকলও প্রণীত হয় নাই। ঋক্, যজুঃ, সাম সংহিতা ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। আখ্যায়ন, সাংখ্যায়ন প্রভৃতি অভ্যুদিত হন নাই। মন্সমূলর বলেন, ব্রাহ্মণ-প্রণয়ন-কাল খ্রিঃ পূঃ সহস্র বৎসর হইতে আরম্ভ। ডাক্তার মার্টিন হোগ বলেন, ঐ শেষ; খ্রিঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে আরম্ভ। অতএব পাণিনির সময় খ্রিঃ পূঃ দশম বা একাদশ শতাব্দী বলিলে বেশী বলা হয় না।

Max Muller, Weber প্রভৃতি অনেকেই এ বিচারে প্রবৃত্ত, কিন্তু কাহারও কথায় গোন্ডষ্ট্রুকের মত খণ্ডিত হইতেছে না। অতএব আচার্য্যের এ মত গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে ইহা স্থির যে, খ্রিষ্টের সহস্রাব্দিক বৎসর পূর্বে যুধিষ্ঠিরাদির বৃত্তান্তসংযুক্ত মহাভারত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এমন প্রচলিত যে, পাণনিকে মহাভারত ও যুধিষ্ঠিরাদির

* মহাভারতে ‘বুদ্ধ’ শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ অংশ যে প্রকৃত, তাহাও অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে।

ব্যুৎপত্তি লিখিতে হইয়াছে। আর ইহাও সম্ভব যে, তাঁহার অনেক পূর্বেরই মহাভারত প্রচলিত হইয়াছিল। কেন না, “বাসুদেবার্জুনাত্ম্যং বুন” এই সূত্রে ‘বাসুদেবক’ ও ‘অৰ্জুনক’ শব্দ এই অর্থে পাওয়া যায় যে, বাসুদেবের উপাসক, অৰ্জুনের উপাসক। অতএব পাণিনি-সূত্রপ্রণয়নের পূর্বেরই কৃষ্ণার্জুন দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। অতএব মহাভারতের যুদ্ধের অনন্ত পরেই আদিম মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহার উচ্ছেদ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

একশে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল পাণিনির নয়, আখ্যায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহসূত্রেও মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। অতএব মহাভারতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বড় গোলযোগ করার কাহারও অধিকার নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা

কৃষ্ণের নাম পাণিনির কোন সূত্রে থাক না থাক, তাহাতে আসিয়া যায় না। কেন না, ঋগ্বেদসংহিতায় কৃষ্ণ শব্দ অনেক বার পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকে এবং ১১৭ সূক্তের ৭ ঋকে এক কৃষ্ণের নাম আছে। সে কৃষ্ণ কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি বসুদেবনন্দন নহেন। তাহার পর দেখিতে পাই, ঋগ্বেদ-সংহিতার অনেকগুলি সূক্তের ঋষি এক জন কৃষ্ণ। তাঁহার কথা পুরে বলিতেছি। অথর্ব-সংহিতায় অসুর কৃষ্ণকেশীর নিধনকারী কৃষ্ণের কথা আছে। তিনি বসুদেবনন্দন সন্দেহ নাই। কেশিনিধনের কথা আমি পশ্চাৎ বলিব।

পাণিনির সূত্রে ‘বাসুদেব’ নাম আছে—সে সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। কৃষ্ণ মহাভারতে বাসুদেব নামে সচরাচর অভিহিত হইয়াছেন। বসুদেবের পুত্র বলিয়াই বাসুদেব নাম

* কৃষ্ণ শব্দ আমি পাণিনির অষ্টাধ্যায় খুঁজিয়া পাই নাই—আছে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু কৃষ্ণ শব্দ যে পাণিনির পূর্বে প্রচলিত ছিল, তাহাযে কোন সংশয় নাই। কেন না, ঋগ্বেদ-সংহিতায় কৃষ্ণ শব্দ পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়। কৃষ্ণনামা বৈদিক কবির কথা পশ্চাৎ বলিতেছি। তত্তির অষ্টম মণ্ডলে ২৩ সূক্তে কৃষ্ণনামা এক জন অনার্য্য রাজার কথা পাওয়া যায়। এই অনার্য্য কৃষ্ণ অশ্বত্থাশ্বতীভীরনিবাসী; যতরাং ইনি যে বাসুদেব কৃষ্ণ নহেন, তাহা নিশ্চিত। পাঠক ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, পাণিনির কোন সূত্রে “কৃষ্ণ” শব্দ থাকিলে তাহা বাসুদেব কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু পাণিনি-সূত্রে “বাসুদেব” নাম যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য। ঠিক তাহাই আছে।

নহে, সে কথা স্থানান্তরে বলিব। বশুদেবের পুত্র না হইলেও বাসুদেব নাম হয়। এই মহাভারতেই পাওয়া যায় পুণ্ড্রাধিপতিরও নাম ছিল বাসুদেব। বশুদেবকে কবিকল্পনা বলিতে হয়, বল—কিন্তু বাসুদেব কবিকল্পনা নহেন।

ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, কৃষ্ণ আদৌ মহাভারতে ছিলেন না, পরে মহাভারতে তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এরূপ বিবেচনা করিবার যে সকল কারণ তাঁহার নির্দেশ করেন, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কেই বলেন, কৃষ্ণকে মহাভারত হইতে উঠাইয়া দিলে মহাভারতের কোন ক্ষতি হয় না। এক হিসাবে নয় বটে। পুত করাসী-এসের বুদ্ধ হইতে মোশটকে উঠাইয়া দিলে কোন ক্ষতি হয় না। Gravelotte, Woerth Metz, Sedan, Paris প্রভৃতি রণজয় সবই বজায় থাকে; কেন না, Moltke হাতে হাতিয়ারে এ সকলের কিছুই করেন নাই। তাঁহার সেনাপতিষ তাকে তাকে বা পক্ষে পক্ষে নির্বাহিত হইয়াছিল। মহাভারত হইতে কৃষ্ণকে উঠাইয়া দিলে সেইরূপ ক্ষতি হয় না। তাহার বেশী ক্ষতি হয় কি না, এ গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন।

হুইলর সাহেবেরও এ বিষয়ে একটা মত আছে। তাঁহার যেক্রপ পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহার মতের প্রতিবাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তথাপি মতটা কিয়ৎপরিমাণে চলিয়াছে বলিয়া, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলাম। তিনি বলেন, দ্বারকা হস্তিনাপুর হইতে সাত শত ক্রোশ ব্যবধান। কাজেই কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদিগের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মহাভারতে কথিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব। কেন অসম্ভব, আমরা তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কাজেই উত্তর করিতে পারিলাম না। বাঙ্গালার মুসলমান রাজপুরুষদিগের সঙ্গে দিল্লীর পাঠান মোগল রাজপুরুষদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যিনিই স্মরণ করিবেন, তিনিই বোধ হয়, হুইলর সাহেবের এই অশ্রাব্য কথায় কর্ণপাত করিবেন না।

বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত Bournouf বলেন যে, বৌদ্ধশাস্ত্রে কৃষ্ণ নাম না পাইলে, ঐ শাস্ত্র প্রচারের উত্তরকালে কৃষ্ণোপাসনা প্রবর্তিত হয়, বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে ললিতবিস্তরে কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মধ্যে সূত্রপিটক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। তাহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে। ঐ গ্রন্থে কৃষ্ণকে অশুর বলা হইয়াছে। কিন্তু নাস্তিক ও হিন্দুধর্মবিরোধী বৌদ্ধেরা কৃষ্ণকে যে অশুর বিবেচনা করিবে, ইহা বিচিত্র নয়। আর ইহাও বক্তব্য, বেদাদিতে ইন্দ্রাদি দেবগণকে মধ্যে মধ্যে অশুর বলা হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ধর্মের প্রধান শত্রু যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছেন “মার”। কৃষ্ণপ্রচারিত অপূর্ব নিকামধর্ম, তৎকৃত সনাতন ধর্মের অপূর্ব সংস্কার, অয়ং কৃষ্ণের উপাসনা বৌদ্ধধর্মপ্রচারের

প্রধান বিষয় ছিল সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহার। কৃষ্ণকেই অনেক সময়ে মার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এ সকল কথা থাক। ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি কথা আছে; সেইটি উদ্ধৃত করিতেছি। কথাটি এই—

“তদ্বৈতস্যোর আদ্রিসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্তা, উবাচ। অপিপাস এব স বভূব। সোহিস্ত-
বেলাম্যামেতদ্রয়ং প্রতিপত্তে অন্ধিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।”

ইহার অর্থ। আদ্রিসসংখ্যায় ঘোর (নামে ঋষি) দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া বলিলেন, (তুমি পিপাসাশূন্য হইলেন) যে অন্তকালে এই তিনটি কথা অবলম্বন করিবে, “তুমি অন্ধিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত।”

এই ঘোর ঋষির পুত্র কণ্ব*। ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষেদের কতকগুলি সূক্তের ঋষি। যথা, প্রথম মণ্ডলে ৩৬ সূক্ত হইতে ৪৩ সূক্ত পর্য্যন্ত; এবং কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঐ মণ্ডলের ১২শ হইতে ২৩শ পর্য্যন্ত সূক্তের ঋষি। এবং কণ্বের অন্য পুত্র প্রাঙ্ঘ ঐ মণ্ডলের ৪৪ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত সূক্তের ঋষি। এখন নিরুক্তকার যাক্স বলেন, “যন্ত বাক্য স ঋষিঃ।” অতএব ঋষিগণ সূক্তের প্রণেতা হউন বা না হউন, বক্তা বটে। অতএব ঘোরের পুত্র এবং পৌত্রগণ ঋষেদের কতকগুলি সূক্তের বক্তা। তাহা যদি হয়, তবে ঘোরশিষ্য কৃষ্ণ তাঁহাদিগের সমসাময়িক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আগে বেদের সূক্তগুলি উক্ত হইয়াছিল, তাহার পর বেদবিভাগ হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্তের কোনও মতেই প্রতিবাদ করা যায় না। অতএব কৃষ্ণ বেদবিভাগকর্তা বেদব্যাসের সমসাময়িক লোক, উপন্যাসের বিষয়-মাত্র নহেন, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় করা যায় না।

ঋগ্বেদসংহিতার অষ্টম মণ্ডলে ৮৫।৮৬ ৯৮৭ সূক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৪২।৪৩।৪৪ সূক্তের ঋষি কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ কি না, তাহার নির্ণয় করা দুষ্কর। কিন্তু কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই বলা যাইতে পারে না যে, তিনি এই সকল সূক্তের ঋষি নহেন; কেন না, ত্রসদশ্য, ত্র্যক্ষণ, পুরুষীত, অজমীত, সিদ্ধুদ্বীপ, সুদাস, মাক্ষাতা, সিবি, প্রতর্দন, কক্ষীবান্ প্রভৃতি রাজর্ষি ঋষিগণ। ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, তাঁহারও ঋগ্বেদ-সূক্তের ঋষি ইহা দেখা যায়। হুই এক স্থানে শূদ্র ঋষির উল্লেখও পাওয়া যায়। কবচ নামে দশম মণ্ডলে এক জন শূদ্র ঋষি আছেন; অতএব ক্ষত্রিয় বলিয়া কৃষ্ণের ঋষি হইতে পারে না। তবে ঋগ্বেদসংহিতার অনুল্লেকমণিকায় শৌনক কৃষ্ণ আদ্রিস ঋষি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

* এই কণ্ব শূদ্রজাতির পালকপিতা কণ্ব নহেন। সে কণ্ব কাশ্যপ; ঘোরপুত্র কণ্ব আদ্রিস।

উপনিষদ সকল বেদের শেষভাগ, এই জন্ত উপনিষদকে বেদান্তও বলে। বেদের যে সকল অংশকে ব্রাহ্মণ বলে, তাহা উপনিষদ হইতে প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয়। অতএব ছান্দোগ্যোপনিষদ হইতে কৌষীতিকব্রাহ্মণ আরও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেও এই আগ্নিরস ঘোরের নাম আছে, এবং কৃষ্ণেরও নাম আছে। কৃষ্ণ তথায় দেবকীপুত্র বলিয়া বর্ণিত হয়েন নাই; আগ্নিরস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি ক্ষত্রিয়ও আগ্নিরস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তদ্বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে একটি প্রাচীন শ্লোক দ্রুত হইয়াছে।

এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চাগ্নিরসঃ স্মৃতাঃ।

রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেতা বিজাতয়াঃ।

৪ অংশ, ২।২

কিন্তু এই রথীতর রাজা সূর্য্যবংশীয়। কৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ যত্ন, যযাতির পুত্র, কাশ্যেই চন্দ্রবংশীয়। এই কথাই সকল পুরাণেতিহাসে লেখে, কিন্তু হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্ব পাওয়া যায় যে, মথুরার যাদবেরা ইক্ষ্বাকুবংশীয়।

এবং ইক্ষ্বাকুবংশি যদুবংশো বিনিঃসৃতঃ।

২৫ অধ্যায়ে, ৫২২ শ্লোকঃ।

কথাটাও খুব সম্ভব, কেন না রামায়ণে পাওয়া যায় যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন মথুরাজয় করিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক, “বাসুদেবার্জুনাত্যাং বুন” এই সূত্র আমরা পানিনি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। কৃষ্ণ এত প্রাচীন কালের লোক যে, পানিনির সময়ে উপাস্ত বলিয়া আর্ধ্যসমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। ইহাই যথেষ্ট।

নবম পরিচ্ছেদ

মহাভারতে প্রসিদ্ধ

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা আছে, এবং মহাভারতে কৃষ্ণপাণ্ডব সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মহাভারতে কৃষ্ণপাণ্ডব সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব?

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা, বা মহাভারতে কথিত কৃষ্ণপাণ্ডবসংস্রায়ী বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণের যে প্রতিকূল ভাব, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, প্রাচীনকালে মহাভারত ছিল বটে, কিন্তু সে এ মহাভারত নহে। ইহার অর্থ যদি এমন বুঝিতে হয় যে, প্রচলিত মহাভারতে সেই প্রাচীন মহাভারতের কিছুই নাই, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করি না; এবং এরূপ স্বীকার করি না বলিয়াই, তাঁহাদের কথার এত প্রতিবাদ করিয়াছি। আর তাঁহাদের কথার মর্মার্থ যদি এই হয় যে, সে প্রাচীন মহাভারতের উপর অনেক প্রসিদ্ধ উপন্যাসাদি চাপান হইয়াছে, প্রাচীন মহাভারত তাহার ভিতর ডুবিয়া আছে, তবে তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নাই।

আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি যে, পরবর্তী প্রসিদ্ধকারদিগের রচনাবাহুল্যে আদিম মহাভারত প্রোধিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিকতা যদি কিছু থাকে, তবে সে আদিম মহাভারতের। অতএব বর্তমান মহাভারতের কোন অংশ আদিমমহাভারতভুক্ত, তাহাই প্রথমে আমাদের বিচার্য্য বিষয়। তাহাতে কৃষ্ণকথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহারই কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকিলে থাকিতে পারে। তাহাতে যাহা নাই, অল্প গ্রন্থে থাকিলেও, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প। কেন না, মহাভারতই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বলিবেন, মহাভারতের কোন অংশই যে প্রসিদ্ধ, তাহারই বা প্রমাণ কি? এই পরিচ্ছেদে তাহার কিছু প্রমাণ দিব।

আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পর্বসংগ্রহাধ্যায়। মহাভারতে যে যে বিষয় বর্ণিত বা বিবৃত আছে, ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে তাহার গণনা করা হইয়াছে। উহা এখনকার গ্রন্থের সূচিপত্র বা Table of Contents সদৃশ। অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের গণনাভুক্ত হইয়াছে। এখন যদি দেখা যায় যে, কোন একটা গুরুতর বিষয় ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ভুক্ত নহে, তবে অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহা প্রসিদ্ধ। একটা উদাহরণ দিতেছি। আশ্বমেধিক পর্বে অমুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা পর্বাধ্যায় পাওয়া যায়। এই দুইটি ক্ষুদ্র বিষয় নয়, ইহাতে হত্রিশ অধ্যায় গিয়াছে। কিন্তু পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে উহার কিছু উল্লেখ নাই, সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, অমুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা সমস্তই প্রসিদ্ধ।

২য়.—অনুক্রমণিকাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, মহাভারতের লক্ষ শ্লোক, এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে কোন্ পর্বের কত শ্লোক, তাহা লিখিত হইয়াছে। যথা—

আদি	—	—	৮৮৮
সভা	—	—	২৫১১
বন	—	—	১১৬৬৪
বিরাট	—	—	২০৫০
উত্তোগ	—	—	৬৩৯৮
ভীষ্ম	—	—	৫৮৮৪
দ্রোণ	—	—	৮৩০২
কর্ণ	—	—	৪৯৬৪
শল্য	—	—	৩২২০
সৌপ্তিক	—	—	৮৭০
দ্রী	—	—	৭৭৫
শান্তি	—	—	১৪৭৩২
অমুশাসন	—	—	৮০০০
আশ্বমেধিক	—	—	৩৩২০
অশ্রমবাসিক	—	—	১৫০৬
মৌসল	—	—	৩২০
মাহাপ্রস্থানিক	—	—	৩২০
স্বর্গারোহণ	—	—	২০২

ইহাতে কিন্তু লক্ষ শ্লোক হয় না; মোট ৮৪,৮৩৬ হয়। অতএব লক্ষ শ্লোক পুরাইবার জন্য পর্বাদ্যায়সংগ্রহকার লিখিলেন :—

“অষ্টাদশৈবমুক্তানি পর্বাদ্যোক্তান্তশেষতঃ।

খিলেষ্ হরিবংশঞ্চ ভবিষ্যঞ্চ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥

দশশ্লোকসহস্রানি বিংশশ্লোকশতানি চ।

খিলেষ্ হরিবংশে চ সংখ্যাতানি মহর্ষিণা ॥

অর্থাৎ “এইরূপে অষ্টাদশপর্ব সবিস্তারে উক্ত হইয়াছে। ইহার পর হরিবংশ ভবিষ্যপর্ব কথিত হইয়াছে। মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোকসংখ্যা করিয়াছেন।”

পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে এইটুকু ভিন্ন হরিবংশের আর কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহাতে ৯৬,৮৩৬ শ্লোক হইল। এক্ষণে প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক গণনা করিয়া নিম্নলিখিত সংখ্যা সকল পাওয়া যায় :—

আদি	—	—	৮৪৭৯
সভা	—	—	২৭০৯
বন	—	—	১৭,৪৭৮
বিরাট	—	—	২৩৭৬
উজ্জোগ	—	—	৭৬৫৬॥
ভীষ্ম	—	—	৫৮৫৬
দ্রোণ	—	—	৯৬৪৯
কর্ণ	—	—	৫০৪৬
শল্য	—	—	৩৬৭১
সৌপ্তিক	—	—	৮১১
দ্রৌ	—	—	৮২৭॥
শান্তি	—	—	১৩,৯৪৩
অনুশাসন	—	—	৭৭৯৬
আশ্বমেধিক	—	—	২৯০০
আজ্ঞমবাসিক	—	—	১১০৫
মৌসল	—	—	২২২
মহাপ্রস্থানিক	—	—	১০৯
অর্গারোহণ	—	—	৩১২
খিল হরিবংশ	—	—	১৬,৩৭৪

মোট ১০৭৩৯০। ইহাতে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ মহাভারতে লক্ষ শ্লোক কখনই ছিল না। পর্বসংগ্রহের পর হরিবংশ লইয়া মোটের উপর প্রায় এগার হাজার শ্লোক বাড়িয়াছে, অর্থাৎ প্রস্কিপ্ত হইয়াছে।

৩য়,—এইরূপ হাসবৃদ্ধির উদাহরণস্বরূপ অনুক্রমগিকাধ্যায়কে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনুক্রমগিকাধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব সার্কিশত শ্লোকময়ী অনুক্রমগিকা লিখিয়াছিলেন।

প্রথম খণ্ড : নবম পরিচ্ছেদ : মহাভারতে প্রকৃষ্ট

ততোহ্যধার্ম্মণ্যং ভূমঃ সংক্ষেপঃ কৃতবানুবিঃ ।

অনুক্রমণিকাধ্যায়ঃ বৃত্তান্তানাং সম্পর্কণাম্ ॥

একশে বর্জমান মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ২৭২ শ্লোক পাওয়া যায় । অন্তর্গত পর্বসংগ্রহাধ্যায় লিখিত হওয়ার পরে এই অনুক্রমণিকাতেই ১২২ শ্লোক বেশি পাওয়া যায় ।

৪র্থ,—পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে ৮৪,৮৩৬ শ্লোক পাওয়া যায় । কিন্তু সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, পর্বসংগ্রহাধ্যায় আদিম মহাভারতকার কর্তৃক সঙ্কলিত নয় এবং আদিম মহাভারত রচিত হইবার সময়েও সঙ্কলিত হয় নাই । মহাভারতেই আছে যে, মহাভারত বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট কহিয়াছিলেন । তাহাই উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট কহিতেছেন । পর্বাদ্যায়সংগ্রহকার এই সংগ্রহ উগ্রশ্রবার উক্তি বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন । বৈশম্পায়নের উক্তি নহে, কাজেই ইহা আদিম বা বৈশম্পায়নের মহাভারতের অংশ নহে । অনুক্রমণিকাধ্যায়েই আছে যে, কেহ কেহ প্রথমাবধি, কেহ বা, আস্তীকপর্বাবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করেন । সুতরাং যখন এই মহাভারত উগ্রশ্রবাঃ ঋষিদিগকে শুনাইতেছিলেন, তখনই পর্বসংগ্রহাধ্যায় দূরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায়, সমস্ত * প্রকৃষ্ট বলিয়া প্রবাদ ছিল । এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় পাঠ করিলেই বিবেচনা করা যায় যে, প্রকৃষ্টাংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে ভবিষ্যতে তাহার নিবারণের জন্য এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলনপূর্বক অনুক্রমণিকাধ্যায়ের পর কেহ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । অতএব এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইবার পূর্বেও যে অনেক অংশ প্রকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই অনুমেয় ।

৫ম,—এ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে, মহাভারত প্রথমতঃ উপাখ্যান ত্যাগ করিয়া চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয় এবং বেদব্যাস তাহাই প্রথমে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান ।

চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্ ।

উপাখ্যানৈবিন্দী তাবস্তারতং প্রোচ্যতে বৃধৈঃ ॥

ততোহ্যধার্ম্মণ্যং ভূমঃ সংক্ষেপঃ কৃতবানুবিঃ ।

অনুক্রমণিকাধ্যায়ঃ বৃত্তান্তানাং সম্পর্কণাম্ ॥

ইদং দৈশায়নঃ পূর্বং পুত্রমধ্যাপয়ং শুকম্ ।

ততোহ্যন্তোভ্যাংচক্রেপেভাঃ শিশ্রোভ্যঃ প্রারদৌ বিভূঃ ॥

আদিপর্ব, ১০১-১০৩

* অবশ্য অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ১০০ শ্লোক ভিন্ন ।

চতুর্দশের নিকট বৈশম্পায়ন মহাভারতলিপি করিয়াছিলেন। অতএব এই চতুর্বিংশতিসহস্রশ্লোকীয় মহাভারতই জনশ্রুতের নিকট পণ্ডিত হইয়াছিল। এবং আদিম মহাভারতে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক ছিল। পরে ক্রমে নানা ব্যক্তির রচনা উহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া মহাভারতের আকার চারিগুণ বাড়িয়াছে। সত্য বটে, ঐ অনুক্রমণিকাতেই লিখিত আছে যে, তাহার পর বেদবাস্য ষষ্টিলক্ষশ্লোকীয় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহার ক্রিয়দংশ দেবলোকে, ক্রিয়দংশ পিতৃলোকে, ক্রিয়দংশ গন্ধর্বলোকে ও এক লক্ষ মাত্র মনুগ্রন্থলোকে পণ্ডিত হইয়া থাকে। এই অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটত কথাটা যে আদিম অনুক্রমণিকাধারের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। দেবলোকে বা পিতৃলোকে বা গন্ধর্বলোকে মহাভারতপাঠ, অথবা বেদবাস্যই হউন বা যেই হউন, ব্যক্তিবিশেষের ষষ্টি লক্ষ শ্লোক রচনা করা আমরা সহজেই অবিশ্বাস করিতে পারি। আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, ২৭২ শ্লোকীয় উপক্রমণিকার মধ্যে ১২২ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। এই ষষ্টি লক্ষ শ্লোক এবং লক্ষ শ্লোকের কথা প্রক্ষিপ্তের অন্তর্গত, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রক্ষিপ্তনির্বাচনপ্রণালী

আমাদিগের বিচার্য বিষয় যে, মহাভারতের কোন্ কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত। ইহা পূর্বপরিচ্ছেদে স্থির হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই বিচার সম্পন্ন করিবার কোন উপায় আছে কি না। অর্থাৎ কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত এবং কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহা স্থির করিবার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় কি না ?

মনুগ্রন্থীবনে যে সকল কার্য সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নির্বাহ করা যায়। তবে বিষয়ভেদে প্রমাণের অল্প বা অধিক বলবত্তা প্রয়োজনীয় হয়। যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সচরাচর জীবনযাত্রার কার্য নির্বাহ করি, তাহার অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ ব্যতীত আদালতে একটা মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হয় না, এবং আদালতে যেসকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিচারক একটা নিষ্পত্তিতে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহার অপেক্ষা বলবান্ প্রমাণ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তে

উপনীত হইতে পারেন না। এই জন্ত বিবরণভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণশাস্ত্র বহু হইয়াছে। যথা,—আদালতের জন্ত প্রমাণসম্বন্ধীয় আইন (Law of Evidence), বিজ্ঞানের জন্ত অনুমানতত্ত্ব (Logic বা Inductive Philosophy) এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণ জন্ত এইরূপ একটি প্রমাণশাস্ত্রও আছে। উপস্থিত তত্ত্ব নিরূপণ জন্ত সেইরূপ কতকগুলি প্রমাণের নিয়ম সংস্থাপন করা যাইতে পারে; যথা—

১ম,—আমরা পূর্ব্বে পর্ব্বলংগ্রেহাধ্যায়ের কথা বলিয়াছি। যাহার প্রসঙ্গ সেই পর্ব্বলংগ্রেহাধ্যায়ে নাই, তাহা যে নিশ্চিত প্রাক্ষিপ্ত, ইহাও বুঝাইয়াছি। এইটিই আমাদের প্রথম সূত্র।

২য়,—অনুক্রমগণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মহাভারতকার ব্যাসদেবই হউন, আর যিনিই হউন, তিনি মহাভারত রচনা করিয়া সার্কশত শ্লোকময়ী অনুক্রমগণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিলেন। ঐ অনুক্রমগণিকাধ্যায়ের ৯৩ শ্লোক হইতে ২৪১ শ্লোক পর্য্যন্ত এইরূপ একটি সারসঙ্কলন আছে। যদিও ইহাতে সার্কশতের অপেক্ষা ৯৮ শ্লোক বেশি হইল, তাহা না ধরিলেও চলে। এমনও হইতে পারে যে ৯৮ শ্লোক ইহারই মধ্যে প্রাক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন এই ১৫৯ শ্লোকের মধ্যে যাহার প্রসঙ্গ না পাইব, তাহা আমরা প্রাক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে বাধ্য।

৩য়,—যাহা পরস্পর বিরোধী তাহার মধ্যে একটি অবশ্য প্রাক্ষিপ্ত। যদি দেখি যে কোন ঘটনা দুই বার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ দুটি বিবরণ ভিন্ন প্রকার বা পরস্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রাক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত। কোন লেখকই অনর্থক পুনরুক্তি, এবং অনর্থক পুনরুক্তি দ্বারা আত্মবিরোধ উপস্থিত করেন না। অনবধানতা বা অক্ষমতা বশতঃ যে পুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহাও অনায়াসে নির্ব্বাচন করা যায়।

৪র্থ,—সুকবিদিগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। মহাভারতের কতকগুলি এমন অংশ আছে যে, তাহার মৌলিকতা সন্দেহে কোন সন্দেহ হইতে পারে না—কেন না, তাহার অভাবে মহাভারতে মহাভারতত্ব থাকে না, দেখা যায় যে, সেগুলির রচনাপ্রণালী সর্ব্বত্র এক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট। যদি আর কোন অংশের রচনা একরূপ দেখা যায় যে, সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে, তাহা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রাক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়।

৫ম,—মহাভারতের কবি এক জন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। মনে কর, যদি কোন হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি যে, স্থানবিশেষে ভীষ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীষ্মের ভীষ্মতা বর্ণিত হইতেছে, তবে জানিব যে ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত।

৬ষ্ঠ,—যাহা অপ্রাসঙ্গিক, তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পূর্বোক্ত পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে কোন লক্ষণ দেখিতে পাই, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

৭ম,—যদি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মধ্যে একটিকে তৃতীয় লক্ষণের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত বোধ হয়, যেটি অল্প কোন লক্ষণের অন্তর্গত হইবে, সেইটিকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এখন এই পর্য্যন্ত বুঝান গেল। নির্বাচনপ্রণালী ক্রমশঃ স্পষ্টতর করা যাইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নির্বাচনের ফল

মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া এবং উপরিলিখিত প্রণালীর অনুবর্ত্তী হইয়া বিচারপূর্বক আমি এইটুকু বুঝিয়াছি যে, এই গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথম, একটি আদিম কঙ্কাল; তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আনুসঙ্গিক কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা বড় সংক্ষিপ্ত। বোধ হয়, ইহাই সেই চতুর্বিংশতিসহস্রশ্লোকাত্মিকা ভারতসংহিতা। তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত; অথচ তাহার অংশ সমুদায় এক লক্ষণাক্রান্ত। আমরা দেখিব যে, মহাভারতের কোন কোন অংশের রচনা অতি উদার, বিকৃতিশূন্য, অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ। অল্প অংশ অমুদার, কিন্তু পারমাণ্বিক দার্শনিকত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং কাব্য্যাংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত; কবিত্বশূন্য নহে, কিন্তু যে কবিত্ব আছে, সে কবিত্বের প্রধান অংশ অঘটনঘটনকৌশল, তদ্বিষয়ে সৃষ্টি-চাতুর্য্য। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেগুলি এক জনের রচনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহা দ্বিতীয় ব্যক্তির রচনা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম

শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক, বা আদিম ; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রচিত হইয়া, তাহার উপর প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কেন না, প্রথম কথিত অংশ উঠাইয়া লইলে, মহাভারত থাকে না ; যাহা থাকে, তাহা কঙ্কাল-বিচ্যুতমাংসপিণ্ডের স্থায় বন্ধনশূন্য এবং প্রয়োজনশূন্য নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যাহা, তাহা উঠাইয়া লইলে, মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় না, কেবল কতকগুলি নিস্প্রয়োজনীয় অলঙ্কার বাদ যায় ; পাণ্ডবদিগের জীবনযুদ্ধ অর্থও থাকে। অতএব প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশগুলিকে আমি প্রথম স্তর, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট রচনাগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচনা করি। প্রথম স্তরে, ও দ্বিতীয় স্তরে, আর একটা গুরুতর প্রভেদ এই দেখিব যে, প্রথম স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সচরাচর পরিচিত নহেন ; নিজে তিনি আপনার দেবত্ব স্বীকার করেন না ; এবং মানুষী ভিন্ন দৈবী শক্তি দ্বারা কোন কৰ্ম সম্পন্ন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে, তিনি স্পষ্টতঃ বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অর্চিত ; নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষিত করেন ; কবিও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে যত্নশীল।

ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তর আছে। তাহাকে তৃতীয় স্তর বলিবেছি।

তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া “বেশ রচিয়াছি” মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পুরিয়া দিয়াছে। মহাভারত পঞ্চম বেদ। এ কথার একটি গুঢ় তাৎপর্য আছে। চারি বেদে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের অধিকার নাই, কিন্তু Mass Education লইয়া তর্কবিতর্ক আজ নূতন ইংরেজের আমলে হইতেছে না। অসাধারণ প্রতিভাশালী ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, বিত্তা ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকার। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, আপামর সাধারণ সকলেরই শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই। কিন্তু তাঁহারা আধুনিক হিন্দুদিগের মত প্রতিভাশালী পূর্বপুরুষদিগকে অবজ্ঞা করিতেন না। তাঁহারা “অতীতের সহিত বর্তমানের বিচ্ছেদকে” বড় ভয় করিতেন। পূর্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই—ভাল, সে কথা বজায় রাখা যাউক। তাঁহারা ভাবিলেন, যদি এমন কিছু উপায় করা যায় যে, যাহা শিখিবার, তাহা স্ত্রীলোকে ও শূদ্রে বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও এক স্থানে পাইবে, তবে সে কথা বজায় রাখিয়া চলা যায়। বরং যাহা সর্জনজনমনোহর, এমন সামগ্রীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া সর্বলোকের নিকট সে শিক্ষা বড় আদরণীয় হইবে। তিন স্তরে সম্পূর্ণ যে মহাভারত এখন আমরা পড়ি,

তাহা আমাদিগের লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যে অক্ষয় কীর্তি।* কিন্তু এই কারণে ভাঙ্গমন অনেক কথাই ইহার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। শাস্তিপূর্ব ও অমুশাসনিক পূর্বের অধিকাংশ, ভীষ্মপূর্বের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যায়, বনপূর্বের মার্কণ্ডেয়সমস্তা পর্বাধ্যায়, উত্তোপপূর্বের প্রজাগর পর্বাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর-সকল-কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। পঞ্চাস্তরে আদিপূর্বের শকুন্তলোপাখ্যানের পূর্বের যে অংশ এবং বনপূর্বের তীর্থযাত্রা পর্বাধ্যায় প্রভৃতি অপকৃষ্ট অংশও এই স্তর-গত।

এই তিন স্তরের, নিম্ন অর্থাৎ প্রথম স্তরই প্রাচীন, এই জন্মই তাহাই মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা সেখানে নাই, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে দেখিলে, তাহা কবিকল্পিত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া আমাদিগের পরিত্যাগ করা উচিত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক বা অতিপ্রকৃত

এত দূরে আমরা যে কথা পাইলাম, তাহা স্থূলতঃ এই :—যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণকথা আছে, তাহার মধ্যে মহাভারত সর্বপূর্ববর্তী। তবে, আমাদিগের মধ্যে যে মহাভারত প্রচলিত, তাহার তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত; এক ভাগ মাত্র মৌলিক। সেই এক ভাগের কিছু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু, সেই ঐতিহাসিকতা কতটুকু?

এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন যে, সে বিচারে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কেন না, মহাভারত ব্যাসদেবপ্রণীত; ব্যাসদেব মহাভারতের যুদ্ধের সমকালিক ব্যক্তি; মহাভারত সমসাময়িক আখ্যান,—Contemporary History, ইহার মৌলিক অংশ অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য।

এখন যে মহাভারত প্রচলিত, তাহাকে ঠিক সমসাময়িক গ্রন্থ বলিতে পারি না। আদিম মহাভারত ব্যাসদেবের প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি তাহা পাইয়াছি? প্রক্ষিপ্ত বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা কি ব্যাসদেবের রচনা? যে মহাভারত এখন প্রচলিত,

* জীপুত্রবিজয়ক্ৰমাং জয়ী ন ভক্তিসোচয়।

কর্ণশ্রেয়সি যুচ্যমানঃ শ্রেয়ঃ এবং ভবেদ্বিহ।

ইতি ভারতমাখ্যানঃ কৃপয়া মুনিনা কৃতঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত। ১। ২। ৪। ২৫।

তাহা উগ্রশ্রবাঃ সৌতি নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিদিগের নিকট বলিতেছেন। তিনি বলেন যে, জনমেজয়ের সর্পসভাে বৈশম্পায়নের নিকট যে মহাভারত শুনিয়াছিলেন, তাহাই তিনি ঋষিদিগের শুনাইবেন। হানাস্তরে কথিত হইয়াছে যে উগ্রশ্রবাঃ সৌতি তাঁহার পিতার কাছেই বৈশম্পায়ন-সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাভারতে ব্যাসের জগদ্বৃতাঙ্কের পর, ৬৩ অধ্যায়ে, বৈশম্পায়ন কর্তৃকই কথিত হইয়াছে যে—

বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমানে।

হুমন্ত জৈমিনিঃ পৈলঃ শুককৈব স্বমাক্ষজয়ঃ।

প্রভুবৃষিষ্ঠো বরষো বৈশম্পায়নমেব চ।

সংহিতাত্তৈঃ পৃথক্ভেদে ভারতস্ত প্রকাশিতাঃ।

আদিপর্ক। ৬৩ অ। ১৫-২৬

অর্থাৎ ব্যাসদেব, বেদ এবং পঞ্চম বেদ মহাভারত হুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, ঋষি পুত্র শুক, এবং বৈশম্পায়নকে শিখাইলেন। তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভারতসংহিতা প্রকাশিত করিলেন।*

তাহা হইলে, প্রচলিত মহাভারত বৈশম্পায়ন প্রণীত ভারতসংহিতা। ইহা জনমেজয়ের সভায় প্রথম প্রচারিত হয়। জনমেজয়, পাণ্ডবদিগের প্রণৌত্র।

সে যাহা হউক, উপস্থিত মহাভারত আমরা বৈশম্পায়নের নিকটও পাইতেছি না। উগ্রশ্রবাঃ বলিতেছেন যে, আমি ইহা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছি। অথবা তাঁহার পিতা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। উগ্রশ্রবাঃ যাহা বলিতেছেন, তাহা আমরা আর এক ব্যক্তির নিকট পাইতেছি। সেই ব্যক্তিই বর্তমান মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ের প্রণেতা, এবং মহাভারতের অনেক স্থানে তিনিই বক্তা।

তিনি বলিতেছেন, নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষি উপস্থিত; সেখানে উগ্রশ্রবাঃ আসিলেন, এবং ঋষিগণের সঙ্গে উগ্রশ্রবার এই ভারত সম্বন্ধে ও অস্ত্রাশ্র বিষয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহাও তিনি বলিতেছেন।

তবে ইহা স্থির যে, (১) প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়াক্ষিকী সংহিতা নহে। (২) ইহা বৈশম্পায়ন-সংহিতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আমরা প্রকৃত বৈশম্পায়ন-সংহিতা

* জৈমিনিভারতের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার অথমেখ-পর্ক বেদর সাহেব দেখিয়াছেন। আর সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। আশ্বলায়ন গৃহ যজ্ঞে আছে “হুমন্তজৈমিনিবৈশম্পায়নপৈল-শুক-ভারত-মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যঃ”। তাহা হইলে হুমন্ত যজ্ঞকার, জৈমিনি ভারতকার, বৈশম্পায়ন মহাভারতকার, এবং পৈল ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

পাইয়াছি কি না, তাহা সন্দেহ। আর পর প্রমাণ করিয়াছি যে, (৩) ইহার আর ভিন্ন কারণ প্রকটিত। সত্যের আমাদের পক্ষে নিত্যান্ত আবশ্যক যে, মহাভারতকে কৃষ্ণচরিত্রের ভিত্তি করিতে গেলে অতি সাবধান হইয়া এই গ্রন্থের ব্যবহার করিতে হইবে।

সেই সাবধানতার জন্য আবশ্যক যে, যাহা অতিপ্রকৃত বা অনৈসর্গিক, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিব না।

আমি এমন বলি না যে, আমরা যাহাকে অনৈসর্গিক বলি, তাহা কাজে কাজেই মিথ্যা। আমি জানি যে, এমন অনেক নৈসর্গিক নিয়ম আছে, যাহা আমরা অবগত নহি। যেমন এক জন বহুজাতীয় মহুয়, একটা খড়ি, কি বৈজ্ঞানিক সংবাদতদ্বীকে অনৈসর্গিক ব্যাপার মনে করিতে পারে, আমরাও অনেক ঘটনাকে সেইরূপ ভাবি। আপনাদিগের এরূপ অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াও বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত, কোন অনৈসর্গিক ঘটনায় বিশ্বাস করিতে পারি না। কেন না, আপনার জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন ঐশিক নিয়ম প্রমাণ ব্যতীত কাহারও স্বীকার করা কর্তব্য নহে। যদি তোমাকে কেহ বলে, আমগাছে তাল ফলিতেছে দেখিয়াছি, তোমার তাহা বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে। তোমাকে বলিতে হইবে, হয় আমগাছে তাল দেখাও, নয় বুঝাইয়া দাও কি প্রকারে ইহা হইতে পারে। আর যে ব্যক্তি বলিতেছে যে, আমগাছে তাল ফলিয়াছে, সে ব্যক্তি যদি বলে, ‘আমি দেখি নাই—শুনিয়াছি,’ তবে অবিশ্বাসের কারণ আরও গুরুতর হয়। কেন না, এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেল না। মহাভারতও তাই। অতিপ্রকৃতের প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাইতেছি না।

বলিয়াছি যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেও অতিপ্রকৃত হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। নিজে চক্ষে দেখিলেও হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, বরং আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি সম্ভব, তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মলঙ্ঘন সম্ভব নহে। বুঝাইয়া দাও যে, যাহাকে অতিপ্রকৃত বলিতেছি, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত, তবে বুঝি। বহুজাতীয়কে ঘড়ী বা বৈজ্ঞানিক সংবাদতদ্বী বুঝাইয়া দিলে, সে ইহা অনৈসর্গিক ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।

আর ইহাও বক্তব্য যে, যদি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় (আমি তাহা করিয়া থাকি), তাহা হইলে, তাঁহার ইচ্ছায় যে কোন অনৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে না, ইহা বলা যাইতে পারে না। তবে যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, এবং যতক্ষণ না এমন বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি

মহুয়া-দেহ ধারণ করিয়া ঐশী শক্তি দ্বারা তাঁহার অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করিভেন, ততক্ষণ আমি অনৈসর্গিক ঘটনা তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি না বা বিশ্বাস করিতে পারি না।

কেবল তাহাই নহে। যদি স্বীকার করা যায় যে, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে অভিপ্রেত ঘটনাও ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলেও গোল মিটে না। বাহা তাঁহার দ্বারা সিদ্ধ, তাহাতে যেন বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু বাহা তাঁহার দ্বারা সিদ্ধ নহে, এমন সকল অনৈসর্গিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিব কেন? সাধু অশুর অন্তরীক্ষে সৌভনগর স্থাপিত করিয়া যুদ্ধ করিল; বাণের সহস্র বাহু; অশ্বখামা ব্রহ্মশিরা অস্ত্র ত্যাগ করিলে তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইতে লাগিল; এবং পরিশেষে অশ্বখামার আদেশানুসারে, উত্তরার গর্ভস্থ বালককে গর্ভমধ্যে নিহত করিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করিব কেন?

তার পর কৃষ্ণের নিজ-কৃত অনৈসর্গিক কর্মেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিলেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তিনি মানবশরীর ধারণ করিয়া যদি কোন অনৈসর্গিক কর্ম করেন, তবে তাহা তাঁহার দৈবী বা ঐশী শক্তির দ্বারা। কিন্তু দৈবী বা ঐশী শক্তি দ্বারা যদি কর্ম সম্পাদন করিভেন, তবে তাঁহার মানব-শরীরধারণের প্রয়োজন কি? যিনি সর্বকর্তা, সর্বশক্তিমান, ইচ্ছাময়—ঈহার ইচ্ছায় এই সমস্ত জীবের সৃষ্টি ও ধ্বংস হইয়া থাকে, তিনি মহুয়াশরীরধারণ না করিয়াও কেবল তাঁহার ঐশী শক্তির প্রয়োগের দ্বারা, যে কোন অশুরের বা মানুষের সংহার বা অস্ত্র যে কোন অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করিতে পারেন। যদি দৈবী শক্তি দ্বারা বা ঐশী শক্তি দ্বারা কার্য নিৰ্বাহ করিভেন, তবে তাঁহার মহুয়াশরীরধারণের প্রয়োজন নাই। যদি ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্বক মহুয়ের শরীর ধারণ করেন, তবে দৈবী বা ঐশী শক্তির প্রয়োগ তাঁহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত হইতে পারে না।

তবে শরীরধারণের প্রয়োজন কি? এমন কোন কর্ম আছে কি যে, জগদীশ্বর শরীরধারণ না করিলে সিদ্ধ হয় না?

ইহার উত্তরের প্রথমে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, জগদীশ্বরের মানবশরীরধারণ কি সম্ভব?

প্রথমে ইহার মীমাংসা করা যাইতেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব ?

বস্তুত: কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনার প্রথমই কাহারও কাহারও কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব ? এ দেশের লোকের বিশ্বাস, কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। শিক্ষিতের বিশ্বাস যে, কথাকাটা অতিশয় অবৈজ্ঞানিক, এবং আমাদের খ্রিষ্টান উপদেশকদিগের মতে অতিশয় উপহাসের যোগ্য বিষয়।

এখানে একটা নহে, দুইটি প্রশ্ন হইতে পারে (১) ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না, (২) তাহা হইলে কৃষ্ণ ঈশ্বরবতার কি না। আমি এই দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর দিব না। প্রথম প্রশ্নের কিছু উত্তর দিতে ইচ্ছা করি।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের খ্রিষ্টিয়ান গুরুদিগের সঙ্গে আমাদের এই স্কুল কথা লইয়া মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব বলিয়া মানিতে হয়, নহিলে যি শু টিকেন না। আমাদের প্রধান বিবাদ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের সঙ্গে।

ইহাদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন, যেখানে আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সেখানে আবার ঈশ্বরের অবতার কি ? তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আমরা তাঁহাদিগের সঙ্গে কোন বিচার করি না। তাঁহাদের ঘৃণা করিয়া বিচার করি না, এমত নহে। তবে জানা আছে যে, এ বিচারে কোন পক্ষের উপকার হয় না। তাহারা আমাদের ঘৃণা করেন, তাহাতে আপত্তি নাই।

তাহার পর আর কতকগুলি লোক আছেন যে, তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তাহারা বলিবেন, ঈশ্বর নিগুণ। সগুণেরই অবতার সম্ভব। ঈশ্বর নিগুণ, সুতরাং তাঁহার অবতার অসম্ভব।

এ আপত্তিরও আমাদের বড় সোজা উত্তর দিতে হয়। নিগুণ ঈশ্বর কি, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, সুতরাং এ আপত্তির মীমাংসা করিতে সক্ষম নহি। আমি জানি যে বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নিগুণ বলিয়াই মানেন। আমি পণ্ডিতও নহি, ভাবুকও নহি, কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক পণ্ডিতগণও আমার মত, নিগুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারেন না, কেন না মহুয়ের এমন কোন চিন্তাবৃত্তি নাই, যদ্বারা আমরা নিগুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নিগুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নিগুণ বুঝিতে

পারি না, কেন না আমাদের সে শক্তি নাই। মুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নিগূণ, এবং এই কথার উপর একটা দর্শনশাস্ত্র গড়িতে পারি, কিন্তু যাহা কথায় বলিতে পারি, তাহা যে মনে বুঝি, ইহা অনিশ্চিত। “চতুর্কোণ গোলক” বলিলে আমাদের রসনা বিকীর্ণ হয় না বটে, কিন্তু “চতুর্কোণ গোলক” মানে ত কিছুই বুঝিলাম না। তাই হার্বট স্পেন্সর এত কাল পরে নিগূণ ঈশ্বর ছাড়িয়া দিয়া সগুণেরও অপেক্ষা যে সগুণ ঈশ্বর (“Something higher than Personality”) তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছেন। অতএব আইস, আমরাও নিগূণ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরকে নিগূণ বলিলে শ্রষ্টা, বিধাতা, পাতা, ত্রাণকর্তা কাহাকেও পাই না। এমন স্বাক্ষরিতে কাজ কি ?

যাঁহারা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহাদেরও ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার পক্ষে অনেকগুলি আপত্তি আছে। এক আপত্তি এই যে, ঈশ্বর সগুণ হউন, কিন্তু নিরাকার। যিনি নিরাকার, তিনি আকার ধারণ করিবেন কি প্রকারে ?

উত্তরে, জিজ্ঞাসা করি, যিনি ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করিলে নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন ? তাঁহার সর্বশক্তিমানতার এ সীমানির্দেশ কর কেন ? তবে কি তাঁহাকে সর্বশক্তিমান বলিতে চাও না ? যিনি এই জড় জগৎকে আকার প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে নিজে আকার গ্রহণ করিতে পারেন না কেন ?

যাঁহারা এ আপত্তি না করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন ও বলেন যে, যিনি সর্বশক্তিমান, তাঁহার জগৎ-শাসনের জন্ত, জগতের হিত জন্ত, মনুষ্যকলের ধারণ করিবার প্রয়োজন কি ? যিনি ইচ্ছাক্রমেই কোটি কোটি বিশ্ব সৃষ্ট ও বিলুপ্ত করিতেছেন, রাবণ কুন্তকর্ণ কি কংস শিশুপাল-বধের জন্ত তাঁহাকে নিজে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, বালক হইয়া মাতৃসুত পান করিতে হইবে, ক, খ, গ, ঘ শিখিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার পর দীর্ঘ মনুষ্য-জীবনের অপার দুঃখ ভোগ করিয়া শেষে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া, আহত বা কখন পরাজিত হইয়া, বহুযাসে চুরাঙ্গাদের বধসাধন করিতে হইবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।

যাঁহারা এইরূপ আপত্তি করেন, তাঁহাদের মনের ভিতর এমনি একটা কথা আছে যে, এই মনুষ্য-জন্মের যে সকল দুঃখ—গর্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তন্যপান, শৈশব, শিক্ষা, জয়,

“Our conception of the Deity is then bounded by the conditions which bound all human knowledge and therefore we cannot represent the Deity as he is, but as he appears to us.”—Mansel, *Metaphysics*, p. 884.

পাকসহ, ভর, মরণ, এ সকলে আদর্শও যেমন কই পাই, ঈশ্বরও বৃষ্টি সেইরূপ। তাহাদিগের মূল বৃত্তিতে এইরূপ আসে না যে, তিনি স্বর্গরূপের অতীত,—তাহার কিছুতেই স্বর্গ নাই, কই নাই। ভগবতের স্বজন, পালন, শর, যেমন তাহার লীলা (Manifestation), এ সকল তেমনই তাহার লীলামাত্র হইতে পারে। তুমি বলিতেছ, তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে বাহাদিগকে ইচ্ছাক্রমে সংহার করিতে পারেন, তাহাদের স্বংসের জন্ত তিনি মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কাল ব্যাপিয়া আয়াল পাইবেন কেন? তুমি ভুলিয়া বাইতেছ যে, বাহার কাছে অনন্ত কালও পলক মাত্র, তাহার কাছে মুহূর্ত্তে ও মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কালে প্রভেদ কি?

তবে এই যে অনুরোধ কথাটা আমরা বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে পুরাণাদিতে শুনিয়া আসিতেছি, এ কথা শুনিয়া অনেকের অবতার সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে পারে বটে। কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্ত যে অসংখ্য ঈশ্বরকে ভুতলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে। যিনি অনন্তশক্তিমান, তাহার কাছে কংস শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক যাহারা হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা দুরাত্মা বিশেষের নিধন। আসল কথাটা, ভগবদগীতায় অতি সংক্ষেপে বলা হইতেছে :—

“পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দৃষ্টতাম্।

ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥”

এ কথাটা অতি সংক্ষিপ্ত। “ধর্ম্মসংরক্ষণ” কি কেবল ছই একটা দুরাত্মা বধ করিলেই হয়? ধর্ম্ম কি? তাহার সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে?

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্বদ্বন্দ্বীণ ক্ষুষ্টি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম অমূল্যলনসাপেক্ষ, এবং অমূল্যলন কর্ম্মসাপেক্ষ।* অতএব কর্ম্মই ধর্ম্মের প্রধান উপায়। এই কর্ম্মকে স্বধর্ম্মপালন (Duty) বলা যায়।

মনুষ্য কতকটা নিজ রক্ষা, ও বৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়া স্বতঃই কর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে কর্ম্মের দ্বারা সকল বৃত্তির সর্বদ্বন্দ্বীণ ক্ষুষ্টি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ঘটে, তাহা দুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিকবৃত্তিশূন্য; আমরা শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্ম্মের প্রধান বিঘ্ন। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমরা

* যৎকৃত এই ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ধর্ম্মতত্ত্বে দেখ।

প্রথম পদ : অসন্তোষ পরিত্যাগ : ইহা তুমিইতে অবজ্ঞা হওয়া কি সম্ভব । ১৬

স্বাস্থ্য অতি দুঃখ । অসন্তোষ বহিঃস্বীকার করিয়া লোকসমাজে জনিত যে, অসন্তোষেই সন্তোষের আস্তরণের প্রদর্শন হইতে পারে । এই সমস্তই ইহাশয়তাবাদের প্রয়োজন । সমস্ত কর্ম জানে না । কর্ম বিরোধ করিলে বর্ষে পরিণত হয়, তাহা জানে না ; ইহাশয়তাবাদ হইলে সে শিকা হইবার দেখী লভ্যবনা । এমনকি ইহাশয়তাবাদের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহাশয়তাবাদ কি ? এ কথা জানি খড়িরা বলিতেছি না । ভগবদগীতার ভগবদ্ভক্তির তাৎপর্য্যও এই প্রকার ।

তদানন্ততঃ সততঃ কার্য্যং কর্ম সমাচর ।

অসন্তোষাচরন্ কৰ্ম পরমাপ্রোতি পুরুষঃ ॥ ১১ ॥

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্নিতা জনকাননঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্চন্ কৰ্ত্তু মর্হসি ॥ ২০ ॥

বদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠত্তদেবেতয়ো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকন্তদম্ভবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

ন মে পার্থাস্তি কৰ্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাস্তববাস্তব্যং বৰ্ত্ত এব চ কর্মদি ॥ ২২ ॥

যদি ব্হং ন বর্জ্যং জাতু কর্মণ্যতজিতঃ ।

মম বজ্রানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

উৎসীদেদুগিরিমে লোকা ন কুর্ধ্যাৎ কর্ম চেনহম্ ।

সকলন্ত চ কৰ্ত্তা ত্রামুপহত্মামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

গীতা, ৩ অ ।

"পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কর্ম্মাহুষ্ঠান করিলে মোক্ষলাভ করেন ; অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মাহুষ্ঠান কর, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিয়া তাহা করিয়া থাকে, এবং তিনি যাহা মাত্র করেন, তাহারাই তাহারই অহুষ্ঠান অহুভর্ত্তা হয় । অতএব তুমি লোকদিগের ধর্ম্মরক্ষার্থ কর্ম্মাহুষ্ঠান কর । দেখ, ত্রিভুবনে আমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই, হতভ্রাং আমার কোন প্রকার কর্ম্মব্যও নাই, তথাপি আমি কর্ম্মাহুষ্ঠান করিতেছি * । যদি আমি আলস্যহীন হইয়া কখন কর্ম্মাহুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে, সমুদায় লোকে আমার অহুভর্ত্তা হইবে, অতএব আমি কর্ম্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং আমি বর্ষদকর ও প্রজাগণের মলিনতায় হেতু হইব ।"

কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ ।

* কৃষ্ণ অর্থাৎ তিনি শরীরধারী নহন, তিনি এই কথা বলিতেছেন ।

সেখর বৈজ্ঞানিকদিগের শেষ ও প্রধান আপত্তির কথা এখনও বলি নাই। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন সত্য, এবং তিনি স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, ইহাও সত্য। কিন্তু তিনি গাভীর কোচমানের মত স্বহস্তে রাশ ধরিয়া বা নৌকার কর্ণধারের মত স্বহস্তে হাল ধরিয়া এই বিশ্বসংসার চালান না। তিনি কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্তী হইয়া চলিতেছে। এই নিয়মগুলি অচলও বটে, এবং জগতের স্থিতিপক্ষে যথেষ্টও বটে। অতএব ইহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং হস্তক্ষেপণ করিবার স্থানও নাই ও প্রয়োজন নাই। সুতরাং ঈশ্বর মানব-দেহ ধারণ করিয়া যে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা।

ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্তী হইয়া চলে, এ কথা মানি। সেইগুলি জগতের রক্ষা ও পালন পক্ষে যথেষ্ট, এ কথাও মানি। কিন্তু সেগুলি আছে বলিয়া যে ঈশ্বরের নিজের কোন কাজের স্থান ও প্রয়োজনও নাই, এ কথা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, বুঝিতে পারি না। জগতের কিছুই এমন উন্নত অবস্থায় নাই যে, যিনি সর্বশক্তিমান্ তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহার আর উন্নতি হইতে পারে না। জাগতিক ব্যাপার আলোচনা করিয়া, বিজ্ঞানশাস্ত্রের সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারি যে, জগৎ ক্রমে অসম্পূর্ণ ও অপরিণতাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ও পরিণতাবস্থায় আসিতেছে। ইহাই জগতের গতি এবং এই গতিই জগৎকর্তার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। তার পর, জগতের বর্তমান অবস্থাতে এমন কিছু দেখি না যে, তাহা হইতে বিবেচনা করিতে পারি যে, জগৎ চরম উন্নতিতে পৌঁছিয়াছে। এখনও জীবের সুখের অনেক বাকি আছে, উন্নতির বাকি আছে। যদি তাই বাকি আছে, তবে ঈশ্বরের হস্ত-ক্ষেপণের বা কার্যের স্থান বা প্রয়োজন নাই কেন? স্বজন, রক্ষা, পালন, ধ্বংস ভিন্ন জগতের আর একটা নৈসর্গিক কার্য আছে,— উন্নতি। মনুষ্যের উন্নতির মূল, ধর্মের উন্নতি। ধর্মের উন্নতিও ঐশিক নিয়মে সাধিত হইতে পারে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু কেবল নিয়মফলে যত দূর তাহার উন্নতি হইতে পারে, ঈশ্বর কোন কালে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলে তাহার অধিক উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, এমত বুঝিতে পারি না। এবং এরূপ অধিক উন্নতি যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহাই বা কি প্রকারে বলিব?

আপত্তিকারকেরা বলেন যে, নৈসর্গিক যে সকল নিয়ম, তাহা ঈশ্বরকৃত হইলেও তাহা অতিক্রমপূর্বক জগতে কোন কাজ হইতে দেখা যায় নাই। এজন্ত এ সকল অতিপ্রকৃত ক্রিয়া (Miracle) মানিতে পারি না। ইহার শ্রাঘ্যতা স্বীকার করি; তাহার

ঐশ্বর্য খণ্ড : জায়গিল পরিচ্ছেদ : ঐশ্বর্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব ? ৪৬

কারণও পূর্বপরিচ্ছেদে নির্দিষ্ট করিয়াছি। আমাদের ইহাও বলিতে হয় যে, এরূপ অনেক ঐশ্বর্যবতাদের প্রবাদ আছে যে, তাহাতে অবতার অতিপ্রকৃতির সাহায্যেই স্বকাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। খ্রিষ্ট অবতারের এরূপ অনেক কথা আছে। কিন্তু খ্রিষ্টের পক্ষসমর্থনের ভার খ্রিষ্টানদিগের উপরই থাকুক। আরও, বিষ্ণুর অবতারের মধ্যে মৎস্য, কূৰ্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতির এইরূপ কার্য্য ভিন্ন অবতারের উপাদান আর কিছুই নাই। এখন, বুদ্ধিমান পাঠককে ইহা বলা বাহুল্য যে, মৎস্য, কূৰ্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপজ্ঞাসের বিষয়োক্ত পশুগণের, ঐশ্বর্যবতারের স্বার্থ দাবি দাওয়া কিছুই নাই। গ্রন্থান্তরে দেখাইব যে, বিষ্ণুর দশ অবতারের কথাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং সম্পূর্ণরূপে উপজ্ঞাস-মূলক। সেই উপজ্ঞাসগুলিও কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও দেখাইব। সত্য বটে এই সকল অবতার পুরাণে কীৰ্ত্তিত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপজ্ঞাস স্থান পাইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। প্রকৃত বিচারে ত্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঐশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

কৃষ্ণের যে বৃত্তান্তটুকু মৌলিক, তাহার ভিতর অতিপ্রকৃতির কোন সহায়তা নাই। মহাভারত ও পুরাণসকল, প্রাক্কিণ্ড ও আধুনিক নিকৰ্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের নিরর্থক রচনায় পরিপূর্ণ, এজন্য অনেক স্থলে কৃষ্ণের অতিপ্রকৃতির সাহায্য গ্রহণ করা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, সেগুলি মূল গ্রন্থের কোন অংশ নহে। আমি ক্রমে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, এবং যাহা বলিতেছি তাহা সপ্রমাণ করিব। দেখাইব যে, কৃষ্ণ অতিপ্রকৃত কার্য্যের দ্বারা, বা নৈসর্গিক নিয়মের বিলম্বন দ্বারা, কোন কার্য্য সম্পন্ন করেন নাই। অতএব সে আপত্তি কৃষ্ণ সম্বন্ধে খাটিবে না।

আমরা যাহা বলিলাম, কেবল তাহা আমাদের মত, এমন নহে। পুরাণকার ঋষিদিগেরও সেই মত, তবে লোকপরম্পরাগত কিস্কদন্তীর সত্যমিথ্যানিৰ্ব্বাচন-পদ্ধতি সে কালে ছিল না বলিয়া অনেক অনৈসর্গিক ঘটনা পুরাণেতিহাসভুক্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে আছে,—

মহুত্বধৰ্ম্মশীলস্ত লীলা সা জগতঃ পতেঃ ।

অগ্ন্যাগ্নেনেকরূপানি ধন্যরাতীৰু মুকৃতি ॥

মনসৈব জগৎসৃষ্টিং সংহারক্ক কৰোতি যঃ ।

তত্ত্বারিপক্ষপণে কোহ্যমুত্তমবিস্তরঃ ॥

তথাপি যো মহুত্বাণাং ধৰ্ম্মস্তমহুবৰ্ত্ততে ।

হুৰ্কন ব্ৰহ্মবতা সন্ধিং হীনৈযুজ্জং কৰোত্যদৌ ॥

স্বপ্ন-সৌপ্তিক্যবানক কথা কেন্দ্র করিয়াছেন।

করোতি যোগ্যতকৃৎকিরেব পলায়নম্।

যজ্ঞদেহিনাঃ ক্রোধানিতোবমহুবর্তনঃ।

লীলা অগংগতেতত্ত্ব চন্দ্রতঃ সংপ্রবর্ততে।

৪ অংশ, ২২ অধ্যায়, ১৪-১৮

“অগংগতি হইয়াও যে তিনি শত্রুদিগের প্রতি অনেক অত্মনিক্ষেপ করিলেন, ইহা তিনি মহুশ্রুধর্ম্মশীল বলিয়া তাঁহার লীলা। নহিলে যিনি মনের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করেন, অরিক্ত্য জন্ত তাঁহার বিস্তর উত্তম কেন? তিনি মহুশ্রুদিগের ধর্ম্মের অমুবর্তী, একজন্ত তিনি বলবানের সঙ্গে সন্ধি এবং হীনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, সাম, দান, ভেদ প্রদর্শন-পূর্ব্বক দণ্ডপাত করেন, কখনও পলায়নও করেন। মহুশ্রুদেহীদিগের ক্রিয়ার অমুবর্তী সেই অগংগতির এইরূপ লীলা তাঁহার ইচ্ছামুসারে ঘটিয়াছিল।”

আমি ঠিক এই কথাই বলিতেছিলাম। ভরসা করি, ইহার পর কোন পাঠক বিশ্বাস করিবেন না যে, কৃষ্ণ মহুশ্রুদেহে অতিমামুষ্যশক্তির দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।*

অতএব বিচারের তৃতীয় নিয়ম সংস্থাপিত হইল।

বিচারের নিয়ম তিনটি পুনর্ব্বার স্মরণ করাই :—

১। যাহা প্রকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণ করিব, তাহা পরিত্যাগ করিব।

* “It is true that in the Epic poems Rama and Krishna appear as incarnations of Vishnu, but they at the same time come before us as human heroes, and these two characters (the divine and the human) are so far from being inseparably blended together, that both of these heroes are for the most part exhibited in no other light than other highly gifted men—acting according to human motives and taking no advantage of their divine superiority. It is only in certain sections which have been added for the purpose of enforcing their divine character that they take the character of Vishnu. It is impossible to read either of these two poems with attention, without being reminded of the later interpolation of such sections as ascribe a divine character to the heroes, and of the unskillful manner in which these passages are often introduced and without observing how loosely they are connected with the rest of the narrative, and how unnecessary they are for its progress.”

Lassen's *Indian Antiquities* quoted by Muir.

“In other places (অর্থাৎ ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায় ভিন্ন) the divine nature of Krishna is less decidedly affirmed, in some it is disputed or denied; and in most of the situations he is exhibited in action, as a prince and warrior, not as a divinity. He exercises no superhuman faculties in defence of himself, or his friends, or in the defeat and destruction of his foes. The Mahabharata, however, is the work of various periods, and requires to be read through carefully and critically, before its weight as an authority can be accurately appreciated.

Wilson, *Preface to the Vishnu Purana*.

७। बाईस अक्षरों का, वह अक्षरों का न, जो बाईस अक्षरों का न

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

शुक्राचार्य

২য়,—এক ব্যক্তি এক বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে না। যে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে, সে এক বিষয়ই পুনঃপুনঃ গ্রন্থ হইতে গ্রন্থান্তরে বর্ণিত বা বিবৃত করিবার জন্য গ্রন্থ লেখে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণে দেখা যায় যে, এক বিষয়ই পুনঃপুনঃ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সবিস্তারে কথিত হইয়াছে। এই কৃষ্ণচরিত্রই ইহার উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্রহ্মপুরাণের পূর্বভাগে আছে, আবার বিষ্ণুপুরাণের ৫ম অংশে আছে, বায়ুপুরাণে আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম ও ১১শ স্কন্ধে আছে, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ৩য় খণ্ডে আছে, এবং পদ্ম ও বামনপুরাণে ও কুর্শ্মপুরাণে সংক্ষেপে আছে। এইরূপ অসংখ্য বিষয়েরও বর্ণনা পুনঃপুনঃ কখন ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে আছে। এক ব্যক্তির লিখিত ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের এরূপ ঘটনা অসম্ভব।

৩য়.—আর যদিও এক ব্যক্তি এই অষ্টাদশ পুরাণ বিভিন্ন ভাবে, তাহা হইলে, কখনো অসঙ্গত বিবরণের সম্ভাবনা কিছু থাকে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে, এইরূপ গুরুতর বিরুদ্ধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই ককচরিত্র ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল বর্ণনা পরস্পর সঙ্গত নহে।

৪র্থ.—বিষ্ণুপুরাণে আছে ;—

আখ্যানেন্দ্রাপ্যুখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পতথিভিঃ ।
 পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥
 প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোভূৎ স্মৃতো বৈ লোমহর্ষণঃ ।
 পুরাণসংহিতাং তত্শব্দো ব্যাসো মহামুনিঃ ॥
 স্মৃতিচারিবর্জাশ্চ মিত্রয়ঃ শাংশপায়নঃ ।
 অকৃতব্রণোহথ সাবর্ণিঃ যদৃ শিষ্টান্তস্ত চাভবন্ ॥
 কাশ্যপঃ সংহিতাকর্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ ।
 লোমহর্ষণিকা চাত্তা তিসূনাং মূলসংহিতা ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ, ৬ অধ্যায়, ১৬-১২ শ্লোক ।

পুরাণার্থবিৎ (বেদব্যাস) আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পতথি দ্বারা পুরাণসংহিতা করিয়াছিলেন। লোমহর্ষণ নামে স্মৃত বিখ্যাত ব্যাসশিষ্য ছিলেন। ব্যাস মহামুনি তাঁহাকে পুরাণসংহিতা দান করিলেন। স্মৃতি, অগ্নিবর্জা, মিত্রয়, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ, সাবর্ণি—তাঁহার এই ছয় শিষ্য ছিল। (তাঁহার মধ্যে) কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন সেই লোমহর্ষণিকা মূল সংহিতা হইতে তিনখানি সংহিতা প্রস্তুত করেন।

পুনশ্চ ভাগবতে আছে ;—

ত্রৈয়াক্ষণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ ।
 শিংশপায়নহারীতো বট্টু পৌরাণিকা ইমে ॥
 অধীযন্ত ব্যাসশিষ্যাং সংহিতাং মণ্ডিতমুখাং ॥
 এতৈককামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্ক্সাঃ সমধ্যগাম্ ॥
 কশ্যপোহহং সাবর্ণী রামশিষ্টোহকৃতব্রণঃ ।
 অধীমহি ব্যাসশিষ্ট্যাক্ষরাতো মূলসংহিতাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১২ স্কন্ধ, ৭ অধ্যায়, ৪-৬ শ্লোক ।

ত্রৈয়াক্ষণি, কাশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন, হারীত এই ছয় পৌরাণিক ।

* ভাগবতের বক্তা ব্যাসপুত্র শুকদেব। “বৈশম্পায়নহারীতো” ইতি পাঠান্তরও আছে।

সাহস্রাব্দে সাধননি নিরুত্তর,—

স্বাক্ষরিত হইল সাধননিরুত্তর।

পুরাণে অসিদ্ধাংশে,—

আশ্রয় ব্যাসঃ পুরাণনি স্বতো বৈ লোকমৰ্জকঃ।

স্বয়তিষ্ঠামি বর্জ্যঃ মিথ্যায় শাস্ত্রপায়নঃ।

কৃতব্রতোহং সাবর্ণিঃ শিষ্টাশ্রম চাক্ষব্।

শাস্ত্রপায়নামমৃতকঃ পুরাণানাঞ্চ সংহিতাঃ।

এই সকল বচনে জানিতে পারা যাইতেছে যে, একককার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত নহে। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্টগণ পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে প্রচলিত নাই। যাহা প্রচলিত আছে তাহা কাহার প্রণীত, কবে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

এক্ষণে ইউরোপীয়দিগের যে সাধারণ ভ্রম, তাহার বিষয়ে কিছু বলা যাউক।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা মনে করেন যে, একও খানি পুরাণ একও ব্যক্তির লিখিত। এই ভ্রমের বশীভূত হইয়া তাঁহারা বর্তমান পুরাণ সকলের প্রণয়নকাল নিরূপণ করিতে বসেন। বস্তুতঃ কোনও পুরাণান্তর্গত সকল বৃত্তান্তগুলি এক ব্যক্তির প্রণীত নহে। বর্তমান পুরাণ সকল সংগ্রহ মাত্র। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা। কথাটা একটু সবিস্তারে বুঝাইতে হইতেছে।

‘পুরাণ’ অর্থে, আদৌ পুরাতন; পশ্চাৎ পুরাতন ঘটনার বিবৃতি। সকল সময়েই পুরাতন ঘটনা ছিল, এই জ্ঞান সকল সময়েই পুরাণ ছিল। বেদেও পুরাণ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে, গোপথব্রাহ্মণে, আশ্বলায়ন শূত্রে অথর্ব সংহিতায়, বৃহদারণ্যকে, ছান্দোগ্যোপনিষদে, মহাভারতে, রামায়ণে, মানবদর্শনশাস্ত্রে সর্বত্রই পুরাণ প্রচলিত থাকার কথা আছে। কিন্তু ঐ সকল কোনও গ্রন্থেই বর্তমান কোনও পুরাণের নাম নাই। পাঠকের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে লিপিবদ্ধা অর্থাৎ লেখা পড়া প্রচলিত থাকিলেও গ্রন্থ সকল লিখিত হইত না; মুখে মুখে রচিত, অধীত এবং প্রচারিত হইত। প্রাচীন পৌরাণিক কথা সকল ঐরূপ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া অনেক সময়েই কেবল কিম্বদন্তী মাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। পরে সময়বিশেষে ঐ সকল কিম্বদন্তী এবং প্রাচীন রচনা একত্রে সংগৃহীত হইয়া এক একখানি পুরাণ সংকলিত হইয়াছিল। বৈদিক শূক্ত সকল ঐরূপে সংকলিত হইয়া ঋক্ যজুঃ সাম সংহিতাদ্বয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। যিনি বেদবিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি এই বিভাগকৃত ‘ব্যাস’ এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

‘ব্যাস’ তাঁহার উপাধিমাাত্র—নাম নহে। তাঁহার নাম কৃষ্ণ এবং স্বীপে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিত। এখানে পুরাণসঙ্কলনকর্তার বিষয়ে দুইটি মত হইতে পারে। একটি মত এই যে, যিনি বেদবিভাগকর্তা, তিনিই যে পুরাণসঙ্কলনকর্তা ইহা না হইতে পারে, কিন্তু যিনি পুরাণসঙ্কলনকর্তা, তাঁহারও উপাধি ব্যাস হওয়া সম্ভব। বর্তমান অষ্টাদশ পুরাণ এক ব্যক্তি কর্তৃক অথবা এক সময়ে যে বিভক্ত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত হওয়ার প্রমাণ ঐ সকল পুরাণের মধ্যেই আছে। তবে যিনিই কতকগুলি পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিভক্ত করিয়া একখানি সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনিই ব্যাস নামের অধিকারী। হইতে পারে যে এই জন্তই কিম্বদন্তী আছে যে, অষ্টাদশ পুরাণই ব্যাসপ্রণীত। কিন্তু ব্যাস যে এক ব্যক্তি নহেন, অনেক ব্যক্তি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন, এরূপ বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। বেদবিভাগকর্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, অষ্টাদশপুরাণপ্রণেতা ব্যাস, বেদান্তসূত্রকার ব্যাস, এমন কি পাতঞ্জল দর্শনের টীকাকার এক জন ব্যাস। এ সকলই এক ব্যাস হইতে পারেন না। সে দিন কাশীতে ভারত মহামণ্ডলের অধিবেশন হইয়াছিল, সংবাদপত্রে পড়িলাম, তাহাতে দুই জন ব্যাস উপস্থিত ছিলেন। এক জনের নাম হরেকৃষ্ণ ব্যাস, আর এক জনের নাম শ্রীযুক্ত অধিকা দত্ত ব্যাস। অনেক ব্যক্তি যে ব্যাস উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বেদবিভাগকর্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, এবং অষ্টাদশপুরাণের সংগ্রহকর্তা আঠারটি ব্যাস যে এক ব্যক্তি নন, ইহাই সম্ভব বোধ হয়।

দ্বিতীয় মত এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নই প্রাথমিক পুরাণসঙ্কলনকর্তা। তিনি যেমন বৈদিক সূত্রগুলি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ একখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু, ভাগবত, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে সেইরূপই বুঝায়। অতএব আমরা সেই মতই অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহাতেও প্রমাণীকৃত হইতেছে যে বেদব্যাস একখানি পুরাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আঠারখানি নহে। সেখানি নাই। তাঁহার শিষ্যেরা তাহা ভাঙিয়া তিনখানি পুরাণ করিয়াছিলেন, তাহাও নাই। কালক্রমে, নানা ব্যক্তির হাতে পড়িয়া তাহা আঠারখানি হইয়াছিল।

ইহার মধ্যে যে মতই গ্রহণ করা যাউক, পুরাণবিশেষের সময়নিরূপণ করিবার চেষ্টায় কেবল এই ফলই পাওয়া যাইতে পারে যে, কবে কোন পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল,

তাহারই ঠিকানা হয়। কিন্তু তাও হয় বলিয়াও আমার বিশ্বাস হয় না। কেন না, সকল গ্রন্থের রচনা বা সঙ্কলনের পর নূতন রচনা প্রস্তুত হইতে পারে ও পুরাণ সকলে তাহা হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। অতএব কোন অংশ ধরিয়া সঙ্কলনসময় নিরূপণ করিব ? একটা উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি।

মৎস্যপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সম্বন্ধে এই দুইটি শ্লোক আছে ;—

“রথন্তরাজ কল্পস্ত বৃত্তান্তমধিকৃত্য যৎ।

সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুক্তম্।

যত্র ব্রহ্মবরাহস্ত চরিতং বর্ণ্যতে মুখ্যং।

তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্তমুচ্যতে ॥”

অর্থাৎ যে পুরাণে রথন্তর কল্পবৃত্তান্তাধিকৃত কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুক্ত কথা নারদকে সাবর্ণি বলিতেছেন এবং যাহাতে পুনঃপুনঃ ব্রহ্মবরাহচরিত কথিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকসংযুক্ত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ।

এক্ষণে যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা সাবর্ণি নারদকে বলিতেছেন না। নারায়ণ নামে অশ্ব ঋষি নারদকে বলিতেছেন। তাহাতে রথন্তরকল্পের প্রসঙ্গমাত্র নাই, এবং ব্রহ্মবরাহচরিতের প্রসঙ্গমাত্র নাই। এখনকার প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তে প্রকৃতিখণ্ড ও গণেশখণ্ড আছে, যাহার কোন প্রসঙ্গ দুই শ্লোকে নাই। অতএব প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। যাহা ব্রহ্মবৈবর্ত নামে চলিত আছে, তাহা নূতন গ্রন্থ। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-সঙ্কলন-সময় নিরূপণ করা অপূর্ব রহস্য বলিয়াই বোধ হয়।

উইলসন্ সাহেব পুরাণ সকলের এইরূপ প্রণয়নকাল নিরূপিত করিয়াছেন :—

ব্রহ্মপুরাণ	খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ শতাব্দী।
পদ্মপুরাণ	” ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে।*
বিষ্ণুপুরাণ	” দশম শতাব্দী।
বাহুপুরাণ	সময় নিরূপিত হয় নাই, প্রাচীন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।
ভাগবত পুরাণ	” ত্রয়োদশ শতাব্দী।
নারদপুরাণ	” ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দী, অর্থাৎ দুই শত বৎসরের গ্রন্থ।
মার্কণ্ডেয় পুরাণ	” নবম কি দশম শতাব্দী।
অগ্নিপুরাণ	অনিশ্চিত অতি অভিনব।
ভবিষ্যপুরাণ	ঠিক হয় নাই।

* তাহা হইলে, এই পুরাণ দুই, তিন, কি চারি শত বৎসরের গ্রন্থ।

নিকপুৰাণ	দ্বিতীয় অষ্টম কি সপ্তম শতাব্দীর একটি ভবিষ্ণু।
বরাহপুৰাণ	চতুর্থ শতাব্দী।
কৃষ্ণপুৰাণ	ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পাঁচখানি পুরাণের সংগ্রহ।
বামনপুৰাণ	৩৪ শত বৎসরের গ্রন্থ।
কৃষ্ণপুৰাণ	প্রাচীন নহে।
মৎস্তপুৰাণ	পদ্মপুরাণেরও পর।
গারুড় পুৰাণ	} প্রাচীন পুরাণ নাই। বর্তমান গ্রন্থ পুণ্য নয়।
ব্রহ্মবৈবৰ্ত্ত পুৰাণ	
ব্রহ্মাণ্ড পুৰাণ	

পাঠক দেখিবেন, ইহার মতে (এই মতই প্রচলিত) কোনও পুরাণই সহস্র বৎসরের অধিক প্রাচীন নয়। বোধ হয়, ইংরাজি পড়িয়া যাহার নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্যায় না ঘটিয়াছে, তিনি ভিন্ন এমন কোন হিন্দুই নাই, যিনি এই সময়নির্ধারণ উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। দুই একটা কথার দ্বারাই ইহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

এ দেশের লোকের বিশ্বাস যে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক এবং বিক্রমাদিত্য খ্রিঃ পূঃ ৫৬ বৎসরে জীবিত ছিলেন। কিন্তু সে সকল কথা এখন উড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তার ভাও দাজি স্থির করিয়াছেন যে, কালিদাস খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। এখন ইউরোপ শুদ্ধ এবং ইউরোপীয়দিগের দেশী শিষ্যগণ সকলে উচ্চৈঃস্বরে সেই ডাক ডাকিতেছেন। আমরাও এ মত অগ্রাহ্য করি না। অতএব কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হউন। সকল পুরাণই তাঁহার অনেক পরে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাই উইলসন্ সাহেবের উপরিলিখিত বিচারে স্থির হইয়াছে। কিন্তু কালিদাস মেঘদূতে লিখিয়াছেন—

“যেন শ্রামং বপুর্ভিতরাং কাস্তিমালম্প্যতে তে
বর্হেণেব ক্ষুরিতকটিনা গোপবেশস্ত বিকোঃ।”

১৫ শ্লোকঃ।

যে পাঠক সংস্কৃত না জানেন, তাঁহাকে শেষ ছত্রের অর্থ বুঝাইলেই হইবে। ময়ূর-পুঙ্কের দ্বারা উজ্জ্বল বিষ্ণুর গোপবেশের সহিত ইন্দ্রধনুশোভিত মেঘের উপমা হইতেছে। এখন, বিষ্ণুর গোপবেশ নাই, বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণেরই গোপবেশ ছিল। ইন্দ্রধনুর সঙ্গে উপমেয় কৃষ্ণচূড়ান্ত ময়ূরপুঙ্ক। আমি বিনীতভাবে ইউরোপীয় মহামহোপাধ্যায়দিগের নিকট নিবেদন করিতেছি, যদি ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে কোন পুরাণই ছিল না, তবে কৃষ্ণের ময়ূরপুঙ্কচূড়ার কথা আসিল কোথা হইতে? এ কথা কি বেদে আছে, না মহাভারতে আছে,

না বলিবরূপ আছে।—কল্যাণ না। পুরাণ বা ভ্রমরবর্জী গীতগোবিন্দাদি কবির ভিন্ন আর কোথাও নাই। আছে, হরিবংশে বটে; কিন্তু হরিবংশও ত উইলসন্ সাহেবের মতে বিষ্ণুপুরাণেরও পরবর্তী। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, কালিদাসের পূর্বে অর্থাৎ অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পূর্বে হরিবংশ অথবা কোন বৈক্য পুরাণ প্রচলিত ছিল।

আর একটা কথা বলিয়াই এ বিষয়ের উপসংহার করিব। এখন যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রচলিত, তাহা প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত না হইলেও, অন্ততঃ একাদশ শতাব্দীর অপেক্ষাও প্রাচীন গ্রন্থ। কেন না, গীতগোবিন্দকার জয়দেব গোস্বামী গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের সভাপতিত। লক্ষ্মণ সেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের লোক। ইহা বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রমাণীকৃত, এবং ইংরেজদিগের দ্বারাও স্বীকৃত। আমরা পরে দেখাইব যে, এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ তখন প্রচলিত ও অতিশয় সম্মানিত না থাকিলে, গীতগোবিন্দ লিখিত হইত না, এবং বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণকথার পঞ্চদশ অধ্যায় তখন প্রচলিত না থাকিলে গীতগোবিন্দের প্রথম স্লোক “মেঘৈমে হ্রমম্বরম্” ইত্যাদি কখনও রচিত হইত না। অতএব এই ভ্রষ্ট ব্রহ্মবৈবর্তও একাদশ শতাব্দীর পূর্বগামী। আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত না জানি আরও কত কালের। অথচ উইলসন্ সাহেবের বিবেচনায় ইহা দুই শত বার বৎসরের গ্রন্থ হইতে পারে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পুরাণ

আঠারখানি পুরাণ মিলাইলে অনেক সময়ই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকগুলি স্লোক কতকগুলি পুরাণে একই আছে। কোনখানে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর আছে। কোনখানে তাহাও নাই। এই গ্রন্থে এইরূপ কতকগুলি স্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে বা হইবে। নন্দ মহাপদ্মের সময়নিরূপণ জ্ঞাত যে কয়টি স্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এ কথার উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অপেক্ষা আর একটা গুরুতর উদাহরণ দিতেছি। ব্রহ্মপুরাণের উত্তরভাগে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ও বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উভয়ে কোন প্রভেদ নাই; অক্ষরে অক্ষরে এক। এই পঞ্চম অংশে আটশটি অধ্যায়। বিষ্ণুপুরাণের এই

সকলকে কবিরাজের দ্বারা কবিরাজের কবিরাজিতে যে সকল কবিরাজি আছে, এবং কবিরাজের কবিরাজিতে যে কবিরাজি আছে, বিষ্ণুপুরাণের কবিরাজিতে যে সকল কবিরাজি আছে। এই দুই পুস্তকে এই সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রমাণ বা তারতম্য নাই। নিম্নলিখিত তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণে এরূপ ঘটা সম্ভব।

১ম.—কবিরাজ হইতে বিষ্ণুপুরাণ চুরি করিয়াছেন।

২য়.—বিষ্ণুপুরাণ হইতে কবিরাজ চুরি করিয়াছেন।

৩য়.—কবিরাজ হইতে বিষ্ণুপুরাণ চুরি করেন নাই; এই কৃষ্ণকবিরাজি লেখা আদিম বৈষ্ণবিক পুরাণসংহিতার অংশ। কবিরাজ ও বিষ্ণু উভয় পুস্তকেই এই অংশ রক্ষিত হইয়াছে।

প্রথম দুইটি কারণ যথার্থ কারণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, এরূপ প্রচলিত গ্রন্থ হইতে আটশ অধ্যায় স্পষ্ট চুরি অসম্ভব, এবং অন্য কোনও স্থলেও এরূপ দেখা যায় না। যে এরূপ চুরি করিবে, সে অন্ততঃ কিছু পরিবর্তন করিয়া লইতে পারে এবং রচনাও এমন কিছু নয় যে, তাহার কিছু পরিবর্তন হয় না। আর কেবল এই আটশ অধ্যায় দুইখানি পুরাণে একরূপ দেখিলেও, না হয়, চুরির কথা মনে করা যাইত, কিন্তু বলিয়াছি যে, অনেক ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের অনেক শ্লোক পরস্পরের সহিত ঐক্যবিশিষ্ট। এবং অনেক ঘটনা সম্বন্ধে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিলেও অনেক ঘটনা সম্বন্ধে আবার পুরাণে পুরাণে বিশেষ ঐক্য আছে। এস্থলে, পূর্বকথিত একখানি আদিম পুরাণসংহিতার অস্তিত্বই প্রমাণীকৃত হইতেছে। সেই আদিম সংহিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নবাসরচিত না হইলেও হইতে পারে। তবে সে সংহিতা যে অতি প্রাচীনকালে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, আমরা পরে দেখিব যে, পুরাণকথিত অনেক ঘটনার অশ্বত্থীয় প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায়, অথচ সে সকল ঘটনা মহাভারতে বিবৃত হয় নাই। সুতরাং এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, পুরাণকার তাহা মহাভারত হইতে লইয়াছেন।

যদি আমরা বিলাতী ধরণে পুরাণ সকলের সংগ্রহসময় নিরূপণ করিতে বসি, তাহা হইলে কিরূপ ফল পাই দেখা যাউক। বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে চতুর্বিংশাধ্যায়ে ঋগ্বেদ রাজাদিগের বংশাবলী কীর্ণিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে যে সকল বংশাবলী কীর্ণিত হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণ বেদব্যাসের পিতা পরাশরীর দ্বারা কলিকালের আরম্ভ সময়ে কথিত হইয়াছিল, বলিয়া পুরাণকার ভূমিকা করিতেছেন। সে সময়ে নন্দবংশীয়াদি আধুনিক রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু উক্ত রাজগণের

কবিতার বা পদ্যকবিতার কোনরূপেরই নহে। উক্ত রাজাদিগের নাম ইহাতে থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগের নামের উল্লেখ করিতে গেলে, অতিথবাসীর আশ্রয় বলহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইলে, পুরাণরূপিত বলিয়া প্রতীয় করা যায় না। অতএব সংগ্রহকার বা প্রক্ষেপকারক এই সকল রাজার কথা লিখিবার সময় বলিয়াছেন, অযুক রাজা হইবেন, তাহার পর অযুক রাজা হইবেন, তাহার পর অযুক রাজা হইবেন। তিনি যে সকল রাজাদিগের নাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তাঁহাদিগের রাজত্ব যথাক্রমে সৌন্দর্য্য, স্ববন্দ্য, সংস্কৃতগ্রন্থ, প্রস্তরলিপি ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

যথা,—নন্দ, মহাপদ, মৌর্য, চন্দ্রগুপ্ত, বিম্বসার, অশোক, পুষ্পমিত্র, পুলিমান, শকরাজগণ, অঙ্করাজগণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে লেখা আছে,—“নর নাগাঃ পদ্মাবত্যাঃ কান্তিপূৰ্ণাঃ মথুরায়ামৃগলাপ্রয়াগঃ মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্তান্তি।” * এই গুপ্তবংশীয়দিগের সময় Fleet সাহেবের কল্যাণে নিরূপিত হইয়াছে। এই বংশের প্রথম রাজাকে মহারাজগুপ্ত বলে। তার পর ঘটোৎকচ ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। তার পর সমুদ্রগুপ্ত। ইহার খ্রিঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক। তার পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত, স্বন্দগুপ্ত, বুদ্ধগুপ্ত—ইহারা খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক। এই সকল গুপ্তগণ রাজা হইয়াছিলেন বা রাজত্ব করিতেছেন, ইহা না জানিলে, পুরাণসংগ্রহকার কখনই একরূপ লিখিতে পারিতেন না। অতএব ইনি গুপ্তদিগের সমকাল বা পরকালবর্তী। তাহা হইলে, এই পুরাণ খ্রিষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বা প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, এই গুপ্তরাজাদিগের নাম বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এই চতুর্থাংশ এক সময়ের রচনা, এবং অস্মাত্ত অংশ অস্মাত্ত সময়ের রচনা ; সকলগুলিই কোনও অনিদিষ্ট সময়ে একত্রিত হইয়া বিষ্ণুপুরাণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আজিকার দিনেও কি ইউরোপে, কি এদেশে, সচরাচর ঘটতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা একত্রিত হইয়া একখানি সংগ্রহগ্রন্থে নিবদ্ধ হয়, এবং ঐ সংগ্রহের একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়। যথা “Percy Reliques,” অথবা “রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সংকলিত ফলিত জ্যোতিষ।” আমার বিবেচনায় সকল পুরাণই এইরূপ সংগ্রহ। উপরি-উক্ত দুইখানি পুস্তকই আধুনিক সংগ্রহ ; কিন্তু যে সকল বিষয় ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন। সংগ্রহ আধুনিক বলিয়া সেগুলি আধুনিক হইল না।

তাহার এমন অনেক সময়েই ঘটনা স্মৃতিতে পারে যে, সংগ্রহকার নিজে অনেক পুস্তক রচনা করিয়া সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশিত করিয়াছেন অথবা প্রাচীন ইত্যাদি নূতন কল্পনামূলক এবং অত্যাশ্চর্য্য অলঙ্কারে রঞ্জিত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না, কিন্তু ভাগবত সম্বন্ধে ইহা বিশেষ প্রকারে বক্তব্য।

প্রবাদ আছে যে, ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত। বোপদেব দেবগিরির রাজা হোমজির সভাপতি। বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু অনেক হিন্দুই উহা বোপদেবের রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না। বৈকবেরা বলেন, ভাগবতদেবী শাক্তেরা এইরূপ প্রবাদ রটাইয়াছে।

বাস্তবিক ভাগবতের পুরাণত্ব লইয়া অনেক বাদবিতণ্ডা ঘটিয়াছে। শাক্তেরা বলেন, ইহা পুরাণই নহে,—বলেন, দেবীভাগবতই ভাগবত পুরাণ। তাঁহারা বলেন, “ভাগবত ইদং ভাগবতং” এইরূপ অর্থ না করিয়া “ভগবত্যা ইদং ভাগবতং” এই অর্থ করিবে।

কেহ কেহ এইরূপ শঙ্কা করে বলিয়া জীধরস্বামী ইহার প্রথম শ্লোকের টীকাতে লিখিয়াছেন—“ভাগবতং নামান্ত্রনিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্”। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ইহা পুরাণ নহে—দেবীভাগবতই প্রকৃত পুরাণ, এরূপ আশঙ্কা জীধরস্বামীর পূর্বে হইতেই প্রচলিত ছিল; এবং তাহা লইয়া বিবাদও হইত। বিবাদকালে উভয় পক্ষে যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নামগুলি বড় মাজ্জিত কচির পরিচায়ক। একখানির নাম “হর্জুনমুখচপেটিকা,” তাহার উত্তরের নাম “হর্জুনমুখমহাচপেটিকা” এবং অশ্রু উত্তরের নাম “হর্জুনমুখপদ্মপাটিকা”। তার পর “ভাগবত-স্বরূপ-বিষয়শঙ্কানিরাসত্রয়োদশঃ” ইত্যাদি অশ্রু পুস্তকও এ বিষয়ে প্রণীত হইয়াছিল। আমি এই সকল পুস্তক দেখি নাই, কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন এবং Bournouf সাহেব “চপেটিকা” “মহাচপেটিকা” এবং “পাটিকা”র অনুবাদও করিয়াছেন। Wilson সাহেব তাঁহার বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদে ভূমিকায় এই বিবাদের সারসংগ্রহ লিখিয়াছেন। আমাদের সে সকল কথায় কোন প্রয়োজন নাই। যাহার কৌতূহল থাকে, তিনি Wilson সাহেবের গ্রন্থ দেখিবেন। আমার মতের স্থূল মর্ম্ম এই যে, ভাগবত পুরাণও অনেক প্রাচীন কথা আছে। কিন্তু অনেক নূতন উপস্থাপনও তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এবং প্রাচীন কথা যাহা আছে, তাহাও নানাপ্রকার অলঙ্কারবিশিষ্ট এবং অত্যাশ্চর্য্য দ্বারা অতিরঞ্জিত হইয়াছে। এই পুরাণখানি অশ্রু অনেক পুরাণ হইতে আধুনিক বোধ হয়, তা না হইলে ইহার পুরাণত্ব লইয়া এত বিবাদ উপস্থিত হইবে কেন?

পুত্রবধূর মধ্যে যে সকল পুত্রবধূর বৃদ্ধকর্মিরের আশ্রয় নাই, সে সকলের আশ্রয়চনার আশ্রয়বিনোদ কেবলও প্রয়োজন নাই। যে সকল আছে বৃদ্ধকর্মিরের কোলও প্রসন্ন আছে, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত এই চারিখানিতেই বিস্তারিত বৃত্তান্ত আছে। তাহার মধ্যে আবার ব্রহ্মপুরাণ বিষ্ণুপুরাণে একই কথা আছে। অতএব এই গ্রন্থে কিছু ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত ভিন্ন অন্য কোন পুরাণের ব্যবহার প্রয়োজন হইবে না। এই তিন পু্রাণ সন্ধ্যাে খাড়া আশ্রয়দিগের বৃত্তব্য, তাহা বলিয়াছি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ সন্ধ্যাে আরও কিছু সময়ান্তরে বলিব। এক্ষণে কেবল আমাদের হরিবংশ সন্ধ্যাে কিছু বলিতে বাকি আছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

হরিবংশ

হরিবংশেই আছে যে, মহাভারত কথিত হইলে পর উগ্রশ্রবাঃ সৌতি শৌনকাদি ঋষির প্রার্থনামুসারে হরিবংশ কীর্তন করিতেছেন। অতএব উহা মহাভারতের পরবর্তী গ্রন্থ। কিন্তু মহাভারতের কত পরে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, ইহা নিরূপণ আবশ্যক। মহাভারতের পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে হরিবংশের প্রসঙ্গ কেবল শেষ শ্লোকে আছে, তাহা ৩৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অন্তর্গত বিষয় সকল ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে সংক্ষেপে যেরূপ কথিত হইয়াছে, হরিবংশের অন্তর্গত বিষয় সন্ধ্যাে সেখানে সেরূপ কিছু কথিত হয় নাই। ঐ শ্লোক পাঠ করিয়া এমনই বোধ হয় যে, যখন প্রথম ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায় লঙ্ঘিত হইয়াছিল, তখন হরিবংশের কোন প্রসঙ্গই ছিল না। পরিশেষে লক্ষ শ্লোক মিলাইবার জন্ত কেহ ঐ শ্লোকটি যোজন্য করিয়া দিয়াছেন। হরিবংশে এক্ষণে তিন পর্ব পাওয়া যায়;—হরিবংশপর্ব, বিষ্ণুপর্ব ও ভবিষ্যপর্ব। কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত মহাভারতের শ্লোকে কেবল হরিবংশপর্ব ও ভবিষ্যপর্বের নাম আছে, বিষ্ণুপর্বের নাম মাত্র নাই, হরিবংশপর্ব ও ভবিষ্যপর্ব ১২,০০০ শ্লোক ইহাই লিখিত আছে। এক্ষণে তিন পর্ব ১৬,০০০ শ্লোকের উপর পাওয়া যায়। অতএব নিশ্চিতই মহাভারতে ঐ শ্লোক প্রতিষ্ট হইবার পরে বিষ্ণুপর্ব হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অষ্টাদশপর্ব মহাভারত অনুবাদ করিয়া হরিবংশের অনুবাদ সেই সঙ্গে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাহার কারণ তিনি এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন,—

“অষ্টাদশপর্ব মহাভারতের অতিরিক্ত হরিবংশ নামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটা পর্ব বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং উহাকে আচর্য্য পর্ব বা উনবিংশ পর্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ হরিবংশ ভারতভাগের একটা পর্ব নহে। উহা মূল মহাভারত রচনার বহুকাল পরে শাস্ত্রিকল্পে উহাতে পরিবেশিত হইয়াছে। হরিবংশের রচনাঅণালী ও আংশিক পঞ্চালোচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়জনক অসঙ্গতি অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অস্বত্ব করিতে সমর্থ হইবেন। যদিও মূল মহাভারতের সর্গসংখ্যার অনুসারে হরিবংশের কলকল্পিত বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহাতে হরিবংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণ না হইয়া বরং ঐ কলকল্পিতবর্ণনেরই আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মূল মহাভারত গ্রন্থের সহিত হরিবংশ অস্বাভাবিক করিলে লোকের মনে পূর্বোক্ত ভ্রম দৃঢ়ীভূত হইবে, আশঙ্কা করিয়া উহা এক্ষণে অস্বাভাবিক করিতে কান্দি রাখিলাম।”

হরেন্দ্র হোমস্ উইলসন্ সাহেবও হরিবংশের সম্বন্ধে ঐ কথা বলেন। তিনি বলেন;—

“The internal evidence is strongly indicative of a date considerably subsequent to that of the major portion of the Mahabharata.”*

আমরাও সেইরূপ বিবেচনা হয়। আর হরিবংশ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অন্তর্ভুক্তপর্ববর্তী হইলেও এমন সন্দেহ করিবার কারণও আছে যে, বিষ্ণুপর্ব তাহাতে অনেক পয়ে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এ সকল কথার নিশ্চয়তা সম্পাদন অতি দুঃসাধ্য।

সুবুদ্ধিত বালবদন্ত্যর হরিবংশের পুঙ্খপ্রস্তুত বা মামক বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে। ইউরোপীয় বিচারে স্থির হইয়াছে, সুবুদ্ধি খ্রিঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক। অতএব তখনও হরিবংশ প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্তু কবে ইহা প্রণীত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উহা মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণের পরবর্তী, এবং ভাগবত ও লক্ষ্মীবৈবর্তের পূর্ববর্তী।

কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতে সাহসী হই, সেটি অতি গুরুতর কথা, এবং এই কৃষ্ণচরিত্রবিচারের মূলমন্ত্র বলিলেও হয়। আমরা পরপরিলেছে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

* Horace Hayman Wilson's *Essays Analytical, Critical and Philosophical on subjects connected with Sanskrit Literature*, Vol. I, Dr. Reinhold Rost's Edition.

সমুদয় পরিচ্ছেদ

ইতিহাসটির পৌরোপাধ্য

উপনিষদে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, জগদীশ্বর এক ছিলেন, বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন।* ইহা প্রসিদ্ধ অষ্টভুতবানের মূলকথা। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা অনেক সম্মানের পর, সেই অষ্টভুতবানের নিকটে আসিতেছেন। তাঁহারা স্বাক্ষর, জগতের সবটাই অষ্টভুত এক, ক্রমশঃ বহু হইয়াছে। ইহাই প্রসিদ্ধ Evolution কালের মূলকথা। এক হইতে বহু করিলে, কেবল সংখ্যা বহু বৃদ্ধি না—একাদিশ এবং বহুদশ বৃদ্ধিতে হইবে। বাহ্য অতিরিক্ত ছিল, তাহা অতিরিক্ত অল্পে পরিণত হয়। বাহ্য “Homogeneous” ছিল, তাহা পরিণতিতে “Heterogeneous” হয়। বাহ্য “Uniform” ছিল, তাহা “Multifarious” হয়। কেবল জড়জগৎ সম্বন্ধে এই নিয়ম সত্য, এমন নহে। জড়জগতে, জীবজগতে, মানসজগতে, সমাজজগতে সর্বত্র ইহা সত্য। সমাজজগতের অন্তর্গত বাহ্য, সে সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে। সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমাজজগতের অন্তর্গত, তাহাতেও খাটে। উপন্যাস বা আখ্যান সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহাতেও ইহা সত্য। এমন কি বাজারের গল্প সম্বন্ধে ইহা সত্য। রাম যদি শ্রামকে বলে, “আমি কাল রাতে অন্ধকারে শুইয়াছিলাম, কি একটা শব্দ হইল, আমার বড় ভয় করিতে লাগিল” তবে নিশ্চয়ই শ্রাম যত্নর কাছে গিয়া গল্প করিবে, “রামের ঘরে কাল রাতে ভূতে কি রকম শব্দ করিয়াছিল।” তার পর ইহাই সম্ভব যে, যত্ন গিয়া মধুর কাছে গল্প করিবে যে, “কাল রাতে রাম ভূত দেখিয়াছিল,” এবং মধুও নিধুর কাছে বলিবে যে, “রামের বাড়ীতে বড় ভূতের দৌরাণ্ড্য হইয়াছে।” এবং পরিশেষে বাজারে রাষ্ট্র হইবে যে, ভূতের দৌরাণ্ড্য রাম অপরিবারে কড় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

এ গেল বাজারে গল্পের কথা। প্রাচীন উপাখ্যান সম্বন্ধে এরূপ পরিণতির একটা বিশেষ মিলন দেখিতে পাই। প্রথমাবস্থায় নামক—যেমন বিষ্ণু হইতে বিষ্ণু। দ্বিতীয়াবস্থায়, রূপক—যেমন বিষ্ণুর তিন পাদ, কেহ বলেন, সূর্য্যের উদয়, মধ্যাহ্নস্থিতি, এবং অস্ত; কেহ বলেন, ঈশ্বরের ত্রিলোকব্যাপিতা, কেহ বলেন, ভূত, বর্ষমান, ভবিষ্যৎ। তার পর তৃতীয়াবস্থায় ইতিহাস—যেমন বলিবামনবৃন্তান্ত। চতুর্থাবস্থায় ইতিহাসের অতিরঞ্জন। পুরাণাদিতে তাহা দেখা যায়।

* সাংখ্যমতঃ। বহু ভাঃ প্রকারেণৈতি। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২ বরী, * অম্বাঃ।

এ কথার উদাহরণান্তর স্বরূপ, আমরা উর্বশী-পুরুষের উপাখ্যান লইতে পারি। ইহার প্রথমাবস্থা, যজুর্বেদসংহিতায়। তথায় উর্বশী, পুরুষ, ছইখানি অরণিকার্ত্তমাত্র। বৈদিক কালে দিয়াশালাই ছিল না; চকমকি ছিল না; অন্ততঃ যজ্ঞাগ্নি জন্ত এ সমস্ত ব্যবস্থিত হইত না। কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিয়া যান্ত্রিক অগ্নির উৎপাদন করিতে হইত। ইহাকে বলিত, “অগ্নিচয়ন।” অগ্নিচয়নের মন্ত্র ছিল। যজুর্বেদসংহিতার (মাধ্যমিনী শাখার) পঞ্চম অধ্যায়ের ২ কণ্ডিকায় সেই মন্ত্র আছে। উহার তৃতীয় মন্ত্রে একখানি অরণিকে, পঞ্চমে অপরখানিকে পূজা করিতে হয়। সেই ছই মন্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ এই :—

“হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্ত আমরা তোমাকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিলাম। অস্ত্র হইতে তোমার নাম উর্বশী”। ৩।

(উৎপত্তির জন্ত, কেবল স্ত্রী নহে, পুরুষও চাই। একজন্ত উক্ত স্ত্রীকল্পিত অরণির উপর দ্বিতীয় অরণি স্থাপিত করিয়া বলিতে হইবে)

“হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্ত আমরা তোমাকে পুরুষরূপে কল্পনা করিলাম। অস্ত্র হইতে তোমার নাম পুরুষা”। ৫।*

চতুর্থ মন্ত্রে অরণিস্পষ্ট আজ্ঞার নাম দেওয়া হইয়াছে আয়ু।

এই গেল প্রথমাবস্থা। দ্বিতীয়াবস্থা ঋগ্বেদসংহিতার ৮ ১০ মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে। এখানে উর্বশী পুরুষা আর অরণিকার্ত্ত নহে; ইহার। নায়ক নায়িকা। পুরুষা উর্বশীর বিরহশক্তি। এই রূপকাবস্থা। রূপকে উর্বশী (৫ম স্বকে) বলিতেছেন, “হে পুরুষা, তুমি প্রতিদিন আমাকে তিনবার রমণ করিতে।” যজ্ঞের তিনটি অগ্নি ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে।† পুরুষাকে উর্বশী “ইলাপুত্র” বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ইলা শব্দের অর্থ পৃথিবী §। পৃথিবীরই পুত্র অরণিকার্ত্ত।

* সত্যত সামগ্র্যীকৃত অনুবাদ।

† সাহেবেরা বলেন, ঋগ্বেদসংহিতা আর সকল সংহিতা হইতে প্রাচীন। ইহার অর্থ এমন নয় যে, ঋগ্বেদসংহিতার সকল সূক্তগুলি সাম ও যজুর্বেদসংহিতার সকল মন্ত্র হইতে প্রাচীন। যদি এ অর্থে এ কথা কেহ বলিয়া থাকেন বা বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি অতিশয় ভ্রান্ত। এ কথার প্রকৃত তাৎপৰ্য্য এই যে, ঋগ্বেদসংহিতার এমন কতকগুলি সূক্ত আছে যে, সেগুলি সকল বেদমন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন। নচেৎ ঋগ্বেদসংহিতার এমন অনেক সূক্ত পাওয়া যায় যে, তাহা স্পষ্টতঃ আধুনিক বলিয়া সাহেবেরাই স্বীকার করেন। অনেকগুলি ঋক্ সামবেদসংহিতাতেও আছে, ঋগ্বেদসংহিতাতেও আছে। সংহিতা কেহ কাহারও অপেক্ষা প্রাচীন নহে, তবে কোন মন্ত্র অস্ত্র মন্ত্রের অপেক্ষা প্রাচীন। এরূপ প্রাচীন মন্ত্র ঋগ্বেদসংহিতার বেশী আছে, কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতার এমন অনেক মন্ত্রও আছে যে, তাহা যজুর্বেদমন্ত্রের অনেক মন্ত্রের অপেক্ষা আধুনিক। দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত ইহার একটি উদাহরণ।

‡ সম্ভবতঃ প্রকৃতি এই রূপের অর্থ করেন, উর্বশী উবা, পুরুষা সূর্য। Solar myth এই পণ্ডিতেরা কোন সূক্তেই দৃষ্টিতে পানেন না। বহুবচন বাহা উদ্ধৃত করিলাম তাহাতে এবং তিনবার সংসর্গের কথার পাঠক বুঝিবেন যে, এই রূপের প্রকৃত অর্থই উপরে লিখিত হইল।

§ সর্পাশালাং পশু থাকে।

গোহৃবাচবিদ্ধা ইলা ইত্যমরঃ।

মহাভারতে পুরুষবা ঐতিহাসিক চন্দ্রবংশীয় রাজা। চন্দ্রের পুত্র বৃধ, বৃধের পুত্র ইলা, ইলার পুত্র পুরুষবা। উর্ধ্বশীর গর্ভে ইহার পুত্র হয়; তাহার নাম আয়ু।* যজুর্বেদ যাহা উপরে উক্ত করিয়াছি, তাহা দেখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, আয়ু সেই অরণিস্পষ্ট আখ্য। মহাভারতে এই আয়ুর পুত্র বিখ্যাত নহব। নহবের পুত্র বিখ্যাত যযাতি। যযাতির পুত্রের মধ্যে ছই জনের নাম যছ ও পুরু। যছ, যাদবদিগের আদিপুরুষ; পুরু, কুরুপাণ্ডবের আদিপুরুষ। এই তৃতীয়াবস্থা। তৃতীয়াবস্থায় অরণিকাঠ ঐতিহাসিক সত্যাহ।

চতুর্থ অবস্থা, বিষ্ণু, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে। পুরাণ সকলে তৃতীয় অবস্থার ইতিহাস নূতন উপজ্ঞাসে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার ছইটি নমুনা দিতেছি। একটি এই,—

উর্ধ্বশী ইন্দ্রভায় নৃত্য করিতে করিতে মহাবাহু পুরুষবাকে দেখিয়া মোহিত হওয়ায় নৃত্যের তালভঙ্গ হওয়াতে ইন্দ্রের অভিশাপে পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ স্বর্গলষ্টা হইয়া পুরুষবার সহিত বাস করিয়াছিলেন।

আর একটি এইরূপ;—

পূর্বকালে কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু ধর্মপুত্র হইয়া গন্ধমাদন পর্বতে বিপুল তপস্বী করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার উগ্র তপস্বী ভীত হইয়া তাঁহার বিদ্যার্থ কতিপয় অঙ্গরার সহিত বসন্ত ও কামদেবকে প্রেরণ করেন। সেই সকল অঙ্গরা যখন তাঁহার ধ্যানভঙ্গে অশক্তা হইল, তখন কামদেব অঙ্গরোগণের উরু হইতে ইহাকে সৃজন করিলেন। ইনিই তাঁহার তপোভঙ্গে সমর্থ হন। ইহাতে ইন্দ্র অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইহার রূপে মোহিত হইয়া ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইনিও সম্মত হইলেন। পরে মিত্র ও বরুণ তাঁহাদিগের ঐরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করিলে ইনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে তাঁহাদের শাপে ইনি মনুষ্যভোগ্যা (অর্থাৎ পুরুষবার পত্নী) হন।

এই সকল কথার আলোচনায় আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, যজুর্বেদসংহিতার ৫ অধ্যায়ের সেই মন্ত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহার পর, ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত। তার পর মহাভারত। তার পর পদ্মাদি পুরাণ।

আমরা যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণচরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিব, তাহারও পৌৰ্ব্বাপর্য্য এই নিয়মের অমুখর্ত্তী হইয়া নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। ছই একটি উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি।

প্রথম উদাহরণ স্বরূপ পুতনাধবদ্ব্যস্ত দেওয়া যাউক।

ইহার প্রথমাবস্থা কোন গ্রন্থে নাই, কেবল অভিধানই আছে, যেমন বিবু ধাতু হইতে বিষ্ণু। পরে দেখি পুতনা যথার্থতঃ স্মৃতিকাগারস্থ শিশুর রোগ। কিন্তু পুতনা

* কখন কখন এই নাম “আয়ু” লিখিত হইয়াছে।

শকুনিকও বলে; অতএব মহাভারতে পুতনা শকুনি। বিষ্ণুপুরাণে আর এক সোপান উঠিল; রূপকে পরিণত হইল। পুতনা “বালঘাতিনী” অর্থাৎ বালহত্যা যাহার ব্যবসায়; “অভিজীয়া”; তাহার কলেবর “মহৎ”; নন্দ দেখিয়া ত্রাসযুক্ত ও বিস্মিত হইলেন। তথাপি এখনও সে মানবী।* হরিবংশে ছুইটা কথাই মিলান হইল। পুতনা মানবী বটে, কংসের ধাত্রী। কিন্তু সে কামরূপিনী পক্ষিণী হইয়া ব্রজে আসিল। রূপক আর নাই; এখন আখ্যান বা ইতিহাস। তৃতীয়াবস্থা এইখানে প্রথম প্রবেশ করিল। পরিশেষে ভাগবতে ইহার চূড়ান্ত হইল। পুতনা রোগও নয়, পক্ষিণীও নয়, মানবীও নহে। সে ঘোররূপা রাক্ষসী। তাহার শরীর ছয় কোশ বিস্তৃত হইয়া পতিত হইয়াছিল, দাঁতগুলো এক একটা লালল-দণ্ডের মত, নাকের গর্ভ গিরিকন্দরের তুল্য, স্তন দুইটা গণ্ডশৈল অর্থাৎ ছোট রকমের পাঁহাড়, চক্ষু অঙ্কুপের তুল্য, পেটটা জলশূন্য হ্রদের সমান, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা শীড়া ক্রমশঃ এত বড় রাক্ষসীতে পরিণত হইল, দেখিয়া পাঠক আনন্দ লাভ করিবেন আমরা ভরসা করি, কিন্তু মনে রাখেন যে, ইহা চতুর্থ অবস্থা।

ইহাতে পাই, অগ্রে মহাভারত; তার পর বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ; তার পর হরিবংশ; তার পর ভাগবত।

আর একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। কাল শব্দের পর ইয় প্রত্যয় করিলে কালির শব্দ পাওয়া যায়। কালিয়ের নাম মহাভারতে নাই। বিষ্ণুপুরাণে কালিয়বৃত্তান্ত পাই। পড়িয়া জানিতে পারা যায় যে, ইহা কাল, এবং কালভয়নিবারণ কৃষ্ণপাদপদ্ম সম্বন্ধীয় একটি রূপক। সাপের একটি মাঝ ফণা থাকে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের “মধ্যম ফণার” কথা আছে। মধ্যম বলিতে তিনটি বুঝায়। বুঝিলাম যে, দূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানাভিমুখী কালিয়ের তিনটি ফণা। কিন্তু হরিবংশকার রূপকের প্রকৃত তাৎপর্য্য নাই বুঝিতে পারেন, বা তাহাতে নূতন অর্থ দিবার অভিপ্রায় রাখুন, তিনি দুইটি ফণা বাড়াইয়া দিলেন। ভাগবতকার তাহাতে লজ্জষ্ট নছেন—একেবারে সহস্র ফণা করিয়া দিলেন।

এখন বলিতে পারি কি না যে, আগে মহাভারত, পরে বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ, পরে হরিবংশ, পরে ভাগবত।

এখন আর উদাহরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণচরিত্র লিখিতে লিখিতে অনেক উদাহরণ আপনি আসিয়া পড়িবে। স্থূল কথা এই যে, যে গ্রন্থে অমৌলিক, অনৈসর্গিক,

* কোন অনুবাদকার অনুবাদে “রাক্ষসী” কথাটা বসাইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের মূলে এমন কথা নাই।

উপস্থাপনভাগ যত বাড়িয়াছে, সেই গ্রন্থ তত আধুনিক। এই নিয়মানুসারে, আলোচ্য গ্রন্থ সকলের পৌর্বাপর্য্য এইরূপ অবধারিত হয়।

প্রথম। মহাভারতের প্রথম স্তর।

দ্বিতীয়। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ।

তৃতীয়। হরিবংশ।

চতুর্থ। ঐমদ্ভাগবত।

ইহা ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের ব্যবহার বিধেয় নহে। মহাভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অমৌলিক বলিয়া অব্যবহার্য্য, কিন্তু তাহার অমৌলিকতা প্রমাণ করিবার জন্য, ঐ সকল অংশের কোথাও কোথাও সমালোচনা করিব। ব্রহ্মপুরাণ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কেন না বিষ্ণুপুরাণে যাহা আছে, ব্রহ্মপুরাণেও তাহা আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ পরিত্যাগ্য, কেন না, মৌলিক ব্রহ্মবৈবর্ত লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি ঐরাবীর বৃত্তান্ত জন্য একবার ব্রহ্মবৈবর্ত ব্যবহার করিতে হইবে। অষ্টাঙ্গ পুরাণে কৃষ্ণকথা অতি সংক্ষিপ্ত, এক্ষণে সে সকলের ব্যবহার নিষ্পল। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশ ভিন্ন চতুর্থাংশও কদাচিৎ ব্যবহার করার প্রয়োজন হইবে—যথা স্তম্ভক মণি, সত্যভামা, ও জাম্ববতীবৃত্তান্ত।

পুরাণ সকলের প্রসিদ্ধবিচার দুইটি। মহাভারতে যে সকল লক্ষণ পাইয়াছি, তাহা হরিবংশে ও পুরাণে লক্ষ্য করা ভার। কিন্তু মহাভারত সম্বন্ধে আর যে দুইটা * নিয়ম করিয়াছি যে, যাহা অনৈসর্গিক, তাহা অনৈতিহাসিক ও অতিশ্রুত বলিয়া পরিত্যাগ করিব; আর যাহা নৈসর্গিক, তাহাও যদি মিথ্যার লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব; এই দুইটি নিয়ম পুরাণ সম্বন্ধেও খাটিবে।

এক্ষণে আমরা কৃষ্ণচরিত্রকথনে প্রস্তুত।

দ্বিতীয় খণ্ড

বন্দাবন

যো যোহয়তি ছুতানি দেহপাশাহুবন্ধনৈঃ ।

সর্গস্ত রক্ষণার্থায় তস্মৈ মোহান্বনে নমঃ ॥

শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

যজ্ঞবল্ক্য

প্রথম খণ্ডে আমরা পুরুষবার পুত্র আরুর কথা বলিয়াছি। আরু যজ্ঞবল্ক্যের যজ্ঞে মৃত্যু। কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতার ১০ম মণ্ডলে তিনি ঐতিহাসিক রাজা। ১০ম মণ্ডলের ৪৯ সূক্তের ঋষি বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। ইন্দ্র বলিতেছেন, “আমি কেমনে আরুর বশীভূত করিয়া দিয়াছি।”

আরুর পুত্র নহব। নহবের পুত্র যযাতি। এই নহব ও যযাতির নামও ঋগ্বেদসংহিতায় আছে। যযাতির পাঁচ পুত্র ইতিহাস পুরাণে কথিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ যজ্ঞ, কনিষ্ঠ পুরু। আর তিন জনের নাম তুর্বসু, জহ্না, অণু। ইহার মধ্যে পুরু, যজ্ঞ এবং তুর্বসুর নাম ঋগ্বেদসংহিতায় আছে (১০ম, ৪৮৪৯ সূক্ত)। কিন্তু ইহার যে যযাতির পুত্র বা পরম্পরের তাই এমন কথা ঋগ্বেদসংহিতায় নাই।

কথিত আছে, যযাতির জ্যেষ্ঠ চারি পুত্র তাঁহার আজ্ঞাপালন না করায় তিনি ঐ চারি পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া, কনিষ্ঠ পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এই পুরুর বংশে দ্রুমন্ত, ভরত, কুরু এবং অজমীঢ় ইত্যাদি কুপতিরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্রুম্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি কোরবেরা এই পুরুর বংশ। এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবেরা যজ্ঞর বংশ। অন্ততঃ পুরাণে ইতিহাসে সচরাচর ইহাই পাওয়া যায় যে, যযাতিপুত্র যজ্ঞ হইতে মথুরাবাসী যাদবদিগের উৎপত্তি।

কিন্তু হরিবংশে আর এক কথা পাওয়া যায়। হরিবংশের হরিবংশপর্বে যে যজ্ঞবংশ-কথন আছে, তাহাতে যযাতিপুত্র যজ্ঞরই বংশকথন। কিন্তু বিষ্ণুপর্বে ভিন্ন প্রকার আছে। তথায় আছে যে, হর্যাস্থ নামে এক জন ইক্ষ্বাকুবংশীয়, অযোধ্যায় রাজা ছিলেন। তিনি মধুবনাধিপতি মধুর কন্যা মধুমতীকে বিবাহ করেন। এই মধুবনই মথুরা। হর্যাস্থ অযোধ্যা হইতে কোন কারণে বিদূরিত হইলে, ঋগুরবাড়ী আসিয়া বাস করেন। ইহারই পুত্র যজ্ঞ। হর্যাস্থের লোকান্তরে ইনি রাজা হইলেন। যজ্ঞর পুত্র মাধব, মাধবের পুত্র সবত, সবতের পুত্র ভীম। মধুর পুত্র লবণকে নামের জাতা শত্রু বিজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত

করিয়া মথুরানগর নির্মাণ করেন। হরিবংশে বলে, রাঘবেরা মথুরা ত্যাগ করিয়া গেলে, ভীম তাহা পুনর্ব্বার অধিকার করেন, এবং এই যত্নসম্বৃত বংশই মথুরাবাসী যাদবগণ।

ঋষেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৬২ সূক্তে যত্ন ও তুর্বা (তুর্ব্বশু) এই দুই জনের নাম আছে (১০ ঋক্), কিন্তু তথায় ইহাদিগকে দাসজাতীয় রাজা বলা হইয়াছে।

কিন্তু ঐ মণ্ডলের ৪২ সূক্তে ইন্দ্র বলিতেছেন, “তুর্ব্বশু ও যত্ন এই দুই ব্যক্তিকে আমি বলবান্ বলিয়া খ্যাতিাপন্ন করিয়াছি (৮ ঋক্)।” ঐ সূক্তের ৩ ঋকে আছে, “আমি দশ্যজাতিকে “আর্য্য” এই নাম হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি।”* তবে দাসজাতীয় রাজাকে যে তিনি খ্যাতিাপন্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে কি বুঝিতে পারা যায়? এই যত্ন আর্য্য না অনার্য্য? ইহা ঠিক বুঝা গেল না।

পুনশ্চ, প্রথম মণ্ডলের ৩৬ সূক্তে ১৮ ঋকের অর্থ এইরূপ—“অগ্নির দ্বারা তুর্ব্বশু, যত্ন ও উগ্রদেবকে দূর হইতে আমরা আহ্বান করি।” অনার্য্য রাজ সম্বন্ধে আর্য্য ঋষির এরূপ উক্তি সম্ভব কি?

যাহা হউক, তিন জন যত্নর কথা পাই।

(১) যমাতিপুত্র।

(২) ইন্দুকুবংশীয়।

(৩) অনার্য্য রাজা।

কৃষ্ণ, কোন যত্নর বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা মীমাংসা করা দুর্ব্বট। যখন তাঁহাদের মথুরায় ভিন্ন পাই না, এবং ঐ মথুরা ইন্দুকুবংশীয়দিগের নির্ম্মিত, তখন এই যাদবেরা ইন্দুকুবংশীয় নহে, ইহা জোর করিয়া বলা যায় না।

যে যত্নবংশেই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করুন, তদ্বংশে মধু সম্বৃত বৃষ্ণি, অঙ্গক, কুকুর ও ভোজ প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৃষ্ণি অঙ্গক কুকুর ও ভোজবংশীয়েরা, একত্রে মথুরায় বাস করিতেন। কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয়, কংস ও দেবকী ভোজবংশীয়। কংস ও দেবকীর এক পিতামহ।

* এই কৃষ্ণ ঋকের অনুবাদ রমেশ বাবুর অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণের জন্ম

কংসের পিতা উগ্রসেন যাদবদিগের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণের পিতা বসুদেব, দেবকীর স্বামী।

বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া যখন গৃহে আনিতেছিলেন, তখন কংস ক্রীতিপূর্বক, তাঁহাদের রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, ঐ দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্র কংসকে বধ করিবে। তখন আপদের শেষ করিবার জন্ত কংস দেবকীকে বধ করিতে উদ্ধত হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে শাস্ত করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, তাঁহাদের যতগুলি পুত্র হইবে, তিনি স্বয়ং সকলকে কংসহস্তে সমর্পণ করিবেন। ইহাতে আপাততঃ দেবকীর প্রাণরক্ষা হইল, কিন্তু কংস বসুদেব ও দেবকীকে অবরুদ্ধ করিলেন। এবং তাঁহাদের প্রথম ছয় সন্তান বধ করিলেন। সপ্তমগর্ভস্থ সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হইয়াছিল। পুরাণে কথিত হইয়াছে, বিষ্ণুর আজ্ঞামুসারে যোগনিদ্রা সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া বসুদেবের অশ্রু পত্নীর গর্ভে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

সেই অশ্রু পত্নী রোহিণী। মথুরার অদূরে, ঘোষপল্লীতে নন্দ নামে গোপব্যবসায়ীর বাস। তিনি বসুদেবের আশ্রয়। রোহিণীকে বসুদেব সেই নন্দের গৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেইখানে রোহিণী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্র, বলরাম।

দেবকীর অষ্টম গর্ভে ক্রীষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। এবং যথাকালে রাজ্যে ভূমিষ্ঠ হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে সেই রাজ্যেই নন্দালয়ে লইয়া গেলেন। সেই রাজ্যে নন্দপত্নী যশোদা একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ইনি সেই বৈষ্ণবী শক্তি যোগনিদ্রা। ইনি যশোদাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন, ইত্যবসরে বসুদেব পুত্রটিকে স্মৃতিকাগারে রাখিয়া কন্যাটি লইয়া স্বভবনে আসিলেন। সেই কন্যাকে তিনি কংসকে আপন কন্যা বলিয়া সমর্পণ করিলেন। কংস তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে পারিলেন না। যোগনিদ্রা আকাশপথে চলিয়া গেলেন, এবং বলিয়া গেলেন যে, কংসের নিধনকারী কোন স্থানে জন্মিয়াছেন। কংস তার পর ভগিনীকে কারামুক্ত করিল। কৃষ্ণ নন্দালয়ে রহিলেন।

এ সকল অনৈসর্গিক ব্যাপার; আমরা পূর্বকৃত নিয়মানুসারে ত্যাগ করিতে বাধ্য। তবে ইহার মধ্যে একটু ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। কৃষ্ণ মথুরায় যত্ববংশে,

দেবকীর গর্ভে, বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবে তাঁহাকে তাঁহার পিতা নন্দালয়ে * রাখিয়া আসিয়াছিলেন। নন্দালয়ে পুত্রকে লুকাইয়া রাখার জন্ত তাঁহাকে কংসনাশবিষয়িণী দৈববাণীর বা কংসের প্রাণভয়ের আশ্রয় লইতে হয় নাই। ভাগবত পুরাণে এবং মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তিতেই আছে যে, কংস এই সময়ে অতিশয় দুরাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। সে ঔরঙ্গজেবের মত, আপনার পিতা উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়া, আপন রাজ্যাধিকার করিয়াছিল। যাদবদিগের উপর এরূপ পীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল যে, অনেক যাদব ভয়ে মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া অল্প দেশে গিয়া বাস করিতেছিলেন। বসুদেবও আপনার অস্ত্রা পত্নী রোহিণীকে ও তাঁহার পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিয়াছিলেন। এখানে কৃষ্ণকেও কংসভয়ে সেই নন্দালয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। ইহা সম্ভব এবং ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শৈশব

কৃষ্ণের শৈশব সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অনৈসর্গিক কথা পুরাণে কথিত হইয়াছে। একে একে তাহার পরিচয় দিতেছি।

১। পুতনাবধ। পুতনা কংসপ্রেরিতা রাক্ষসী। সে পরমরূপবতীর বেশ ধারণ করিয়া নন্দালয়ে কৃষ্ণবধার্থ প্রবেশ করিল। তাহার স্তনে বিষ বিলেপিত ছিল। সে ক্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ নিপীড়িত করিয়া স্তন্যপান করিলেন যে, পুতনার প্রাণ বহির্গত হইল। সে তখন নিজ রূপ ধারণ করিয়া ছয় ক্রোশ ভূমি ব্যাপিয়া নিপতিত হইল।

মহাভারতেও শিশুপালবধ-পর্ক্যাধ্যায়ের পুতনাবধের প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল, পুতনাকে শকুনি বলিতেছেন। শকুনি বলিলে, গৃধ্র, চীল এবং শ্যামাপক্ষীকেও বুঝায়। বলবান্ শিশুর একটা ক্ষুদ্র পক্ষী বধ করা বিচিত্র নহে।

* কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে আমি কৃষ্ণের নন্দালয়ে বাসের কথা অবিরাস করিয়াছিলাম। এবং তাহার পৌষকতার মহাভারত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। সেই সকল কথা আমি পুনরুৎপন্ন হইতে উদ্ধৃত করিব। এক্ষণে আমার ইহাই বক্তব্য যে, এক্ষণে পুনরায় বিশেষ বিচার করিয়া সে মত কিয়দংশে পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনার জাতি স্বীকার করিতে আমার আগন্তি নাই—কৃষ্ণজি ব্যক্তির জাতি সচরাচরই খটরা থাকে।

কিন্তু পুতনার আর একটা অর্থ আছে। আমরা বাহাকে “পেন্সনো পাওয়া” বলি, মৃতিকাগারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম পুতনা। সকলেই জানে যে, শিশু বলের সহিত স্তম্ভপান করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না। বোধ হয়, ইহাই পুতনাবধ।

২। শকটবিপর্যয়। যশোদা, কৃষ্ণকে একখানা শকটের নীচে গুয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণের পদাঘাতে শকট উল্টাইয়া পড়িয়াছিল। অবেদনসংহিতায় ইন্দ্রকৃত উবার শকটভঞ্জনের একটা কথা আছে। এই কৃষ্ণকৃত শকটভঞ্জন, সে প্রাচীন রূপকের নূতন সংস্কারমাত্র হইতে পারে। অনেকগুলি বৈদিক উপাখ্যান কৃষ্ণলীলাসুগত হইয়াছে, এমন বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

৩। তাহার পর মাতৃকোড়ে কৃষ্ণের বিশ্বস্তরক্ষীধারণ, এবং স্বীয় ব্যাদিতানন-মধ্যে যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখান। এটা প্রথম ভাগবতে দেখিতে পাই। ভাগবতকারেরই রচিত উপস্থাপন বোধ হয়।

৪। তৃণাবর্ষ। তৃণাবর্ষ নামে অশুর কৃষ্ণকে একদা আকাশবার্গে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। ইহার ঘেরাপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ইহা চক্রবায়ু, মাত্র। চক্রবায়ুর রূপ ধরিয়াই অশুর আসিয়াছিল, ভাগবতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। এই উপাখ্যানও প্রথম ভাগবতেই দেখিতে পাই। স্মৃতরাং ইহাও অমৌলিক সন্দেহ নাই। চক্রবায়ুতে ছেলে তুলিয়া ফেলাও বিচিত্র নহে।

৫। কৃষ্ণ একদা মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সে কথা অস্বীকার করায়, যশোদা তাহার মুখের ভিতর দেখিতে চাহিলেন। কৃষ্ণ হাঁ করিয়া বদনমধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেন। এটিও কেবল ভাগবতীয় উপস্থাপন।

৬। ভাগবতকার আরও বলেন, কৃষ্ণ হাঁটিয়া বেড়াইতে শিখিলে তিনি গোপীদিগের গৃহে অত্যন্ত দৌরাণ্য করিতেন। অস্ত্রাস্ত্র দৌরাণ্যমধ্যে, ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন। বিয়ুপূরণেও এ কথা নাই; মহাভারতেও নাই।

হরিবংশে ননী মাখন চুরির কথা প্রসঙ্গক্রমে আছে। ভাগবতেই ইহার বাড়বাড়ি। যে শিশুর ধর্ম্মার্থজ্ঞান জন্মিবার সময় হয় নাই, সে খাড়া চুরি করিলে কোন দোষ হইল না। যদি বল যে, কৃষ্ণকে তোমরা ঈশ্বর্য্যবতার বল; তাহার কোন বয়সেই জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে না। তাহার উত্তরে কৃষ্ণোপাসকেরা বলিতে পারেন যে, ঈশ্বরের চুরি নাই। জগতই বাঁহার—সব সৃত নবনীত মাখন বাঁহার সৃষ্ট—তিনি কার ধন লইয়া চোর হইলেন? সবই ত তাঁহার। আর যদি বল, তিনি মানবধর্ম্মাবলম্বী—মানবধর্ম্মে

চুরি অবশ্য পাপ, তাহার উত্তর এই যে, মানবধর্মাবলম্বী শিশুর পাপ নাই, কেন না, শিশুর ধর্মার্থ জ্ঞান নাই। কিন্তু এ সকল বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজনই নাই—কেন না, কথাটাই অযুক্তক। যদি মৌলিক কথা হয়, তবে ভাগবতকার, এ কথা যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর।

ভাগবতকার বলিয়াছেন যে, ননী মাখন ভগবান্ নিজের জন্ত বড় চুরি করিতেন না ; বানরদিগকে খাওয়াইতেন। বানরদিগকে খাওয়াইতে না পাইলে শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতেন। ভাগবতকার বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ সর্বভূতে সমদর্শী ; গোপীরা যথেষ্ট ক্রীড়নবনীত খায়,—বানরেরা পায় না, এজন্য গোপীদিগের লইয়া বানরদিগকে দেন। তিনি সর্বভূতের দৈব, গোপী ও বানর তাঁহার নিকট ননী মাখনের তুল্যাধিকারী।

এই শিশু সর্বজনের জন্ত সজ্জদয়তাপরবশ, সর্বজনের দুঃখমোচনে উদ্যুক্ত। তিথ্যাক্ষাতি বানরদিগের জন্ত তাঁহার কাতরতার ভাগবতকার এই পরিচয় দিয়াছেন। আর একটি দুঃখিনী ফলবিক্রেত্রীর কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণের নিকট সে ফল লইয়া আসিলে কৃষ্ণ অঞ্জলি ভরিয়া তাহাকে রত্ন দিলেন। কথাগুলির ভাগবত ব্যতীত প্রমাণ কিছু নাই ; কিন্তু আমরা পরে দেখিব, পরহিতই কৃষ্ণের জীবনের ব্রত।

৭। যমলার্জুনভঙ্গ। একদা কৃষ্ণ বড় “দুরন্তপনা” করিয়াছিলেন বলিয়া, যশোদা তাঁহার পেটে দড়ি বাঁধিয়া, একটা উদুখলে বাঁধিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ উদুখল টানিয়া লইয়া চলিলেন। যমলার্জুন নামে দুইটা গাছ ছিল। কৃষ্ণ তাহার মধ্য দিয়া চলিলেন। উদুখল, গাছের মূলে বাধিয়া গেল। কৃষ্ণ তথাপি চলিলেন। গাছ দুইটা ভাঙ্গিয়া গেল।

এ কথা বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতের শিশুপালের তিরস্কারবাক্যে আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি ? অর্জুন বলে কুরচি গাছকে ; যমলার্জুন অর্থে জোড়া কুরচি গাছ। কুরচি গাছ সচরাচর বড় হয় না, এবং অনেক গাছ ছোট দেখা যায়। যদি চারাগাছ হয়, তাহা হইলে বলবান্ শিশুর বলে ঐরূপ অবস্থায় তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু ভাগবতকার পূর্বপ্রচলিত কথার উপর, অতিরঞ্জন চেষ্টা করিতে ক্রটি করেন নাই। গাছ দুইটি কুবেরপুত্র ; শাপনিবন্ধন গাছ হইয়াছিল, কৃষ্ণস্পর্শে মুক্ত হইয়া স্বধামে গমন করিল। কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার কালে গোকূলে যত দড়ি ছিল, সব যোড়া দিয়াও কচি ছেলের পেট বাঁধা গেল না। শেষে কৃষ্ণ দয়া করিয়া বাঁধা দিলেন।

বিষ্ণুর একটি নাম দামোদর। বহিরিন্দ্ৰিয়নিগ্রহকে দম বলে। উদ্ উপর, স্ব গমনে, এজন্য উদর অর্থে উৎকৃষ্ট গতি। দমের দ্বারা যিনি উচ্চস্থান পাইয়াছেন তিনিই

দামোদর। বেদে আছে বিষ্ণু তপস্তা করিয়া বিষ্ণু লাভ করিয়াছেন, নহিলে তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ মাত্র। শঙ্করাচার্য্য দামোদর শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, “দমাদিসাধনে উদরা উৎকৃষ্টা গতির্বা তয়া গম্যত ইতি দামোদরঃ।” মহাভারতেও আছে, “দমাদামোদরং বিদুঃ।”

কিন্তু দামন শব্দে গোরুর দড়িও বুঝায়। যাহার উদর গোরুর দড়িতে বাঁধা হইয়াছিল, সেও দামোদর। গোরুর দড়ির কথাটা উঠিবার আগে দামোদর নামটা প্রচলিত ছিল। নামটি পাইয়া ভাগবতকার দড়ি বাঁধার উপস্থাসিটি গড়িয়াছেন, এই বোধ হয় না কি ?

এক্ষণে নন্দাদি গোপগণ পূর্ব্ববাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন। কৃষ্ণ নন্দাবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা বৃন্দাবন গেলেন, এইরূপ পুরাণে লিখিত আছে। বৃন্দাবন অধিকতর সুখের স্থান, এজ্ঞাও হইতে পারে। হরিবংশে পাওয়া যায়, এই সময়ে ঘোষ নিবাসে বড় বৃকের ভয় হইয়াছিল। গোপেরা তাই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৈশোরলীলা

এই বৃন্দাবন কাব্যজগতে অতুল্য সৃষ্টি। হরিৎ-পুষ্পশোভিত পুলিনশালিনী কলনাদিনী কালিন্দীকূলে কোকিল-ময়ূর-ধ্বনিত-কুঞ্জবনপরিপূর্ণা, গোপবালকগণের শৃঙ্গবেগুর মধুর রবে শকুময়ী, অসংখ্যকুমারমোদসুবাসিতা, নানাভরণভূষিতা বিশালায়তলোচনা ব্রজসুন্দরীগণসমলঙ্কতা বৃন্দাবনস্থলী, স্মৃতিমাত্র হৃদয় উৎফুল্ল হয়। কিন্তু কাব্যরস আন্বাদন জন্ত কালবিলম্ব করিবার আমাদের সময় নাই। আমরা আরও গুরুতর তত্ত্বের অন্বেষণে নিযুক্ত।

ভাগবতকার বলেন, বৃন্দাবনে আসার পর কৃষ্ণ ক্রমশঃ তিনটি অনুর বধ করিলেন,— (১) বৎসানুর, (২) বকানুর, (৩) অঘানুর। প্রথমটি বৎসরূপী, দ্বিতীয়টি পক্ষিরূপী, তৃতীয়টি সর্পরূপী। বলবান্ বালক, ঐ সকল জন্ত গোপালগণের অনিষ্টকারী হইলে, তাহাদিগকে বধ করা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার একটিরও কথা বিষ্ণুপুরাণে বা মহাভারতে,

এমন কি, হরিবংশেও পাওয়া যায় না। সুতরাং অমৌলিক বলিয়া তিনটি অনুরের কথাই আমাদের পরিত্যাজ্য।

এই বৎসাস্থ, বকাস্থ এবং অঘাস্থবধোপাখ্যান মধ্যে সেরূপ তথ্য খুঁজিলে না পাওয়া যায়, এমত নহে। বদ্ ধাতু হইতে বৎস; বন্ক্ ধাতু হইতে বক, এবং অঘ্ ধাতু হইতে অঘ। বদ্ ধাতু প্রকাশে, বন্ক্ কোটিল্যে, এবং অঘ্ পাপে। যাহারা প্রকাশবাদী বা নিন্দক তাহারা বৎস, কুটিল শত্রুপক্ষ বক, এবং পাণীরা অঘ। কৃষ্ণ অপ্রাপ্তকৈশোরেই এই ত্রিবিধ শত্রু পরাজয় করিলেন। যজ্ঞকর্ষদের মাধ্যগ্নিনী শাখার একাদশ অধ্যায়ে অগ্নিচয়নমন্ত্রের ৮০ কণ্ডিকায় যে মন্ত্র, তাহাতেও এইরূপ শত্রুদিগের নিপাতনের প্রার্থনা দেখা যায়। মন্ত্রটি এই;—

“যে অরে। যাহারা আমাদের অবাকি, যাহারা ঘেবী, যাহারা নিন্দক এবং যাহারা লিখাংহ, এই চারি প্রকার শত্রুকেই ভয়সাং কর।” *

এই মন্ত্রে বেশির ভাগ অরতি অর্থাৎ যাহারা ধন দেয় না, (ভাষায় জুয়াচোর) তাহাদের নিপাতেরও কথা আছে। কিন্তু ভাগবতকার এই রূপক রচনাকালে এই মন্ত্রটি যে স্মরণ করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয়। অথবা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, ঐ রূপকের মূল ঐ মন্ত্রে আছে।

তার পর ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা, কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্ত একদা মায়ার দ্বারা সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণকে হরণ করিলেন। কৃষ্ণ আর এক সেটু রাখাল ও গোবৎসের সৃষ্টি করিয়া পূর্ববৎ বিহার করিতে লাগিলেন। কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মাও কৃষ্ণের মহিমা বুঝিতে অক্ষম। তার পর এক দিন, কৃষ্ণ দাবানলের আগুন সকলই পান করিলেন। শৈবদিগের নীলকণ্ঠের বিষপানের উপহাস আছে। বৈষ্ণবচূড়ামণি তাহার উত্তরে কৃষ্ণের অগ্নিপানের কথা বলিলেন।

এই বিখ্যাত কালিয়দমনের কথা বলিবার স্থান। কালিয়দমনের কথা প্রসঙ্গমাত্র মহাভারতে নাই। হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে। ভাগবতে বিশিষ্টরূপে সন্তোষারিত হইয়াছে। ইহা উপহাস মাত্র—অনৈসর্গিকতায় পরিপূর্ণ। কেবল উপহাস নহে—রূপক। রূপকও অতি মনোহর।

উপহাসটি এই। যমুনার এক হ্রদে বা আবর্তে কালিয় নামে এক বিষধর সর্প সপরিবারে বাস করিত। তাহার বহু কণা। বিষ্ণুপুরাণের মতে তিনটি, † হরিবংশের

* সানজমীকৃত অনুবাদ।

† “সখ্যং কণাং” ইত্যেত তিনটি বুঝায়।

মতে পাঁচটি, ভাগবতে সহস্র। তাহার কালিক কী পুত্র পোষ ছিল। তাহাদিগের বিবে সেই আবর্জনের জল এমন বিবসয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তৎকর্ত্ত নিকটে কেহ ভিত্তিতে পারিত না। অনেক ভ্রজবালক ও গোবৎস সেই জল পান করিয়া প্রাণ হারাইত। সেই বিঘের জালায়, জীরে কোন ভূগ লভা বৃক্ষাদিও বাঁচিত না। পক্ষিগণও সেই আবর্জনের উপর দিয়া উড়িয়া গেলে বিবে জর্জরিত হইয়া জলমধ্যে পতিত হইত। এই মহাসর্পের দমন করিয়া বৃন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধান, ক্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত হইল। তিনি উল্লফনপূর্বক ভ্রজমধ্যে নিপতিত হইলেন। কালির তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ফণার উপর আরোহণ করিয়া, কবীধর গোপবালক কৃত্য করিতে লাগিলেন। ভ্রজক সেই বৃত্তে নিপতিত হইয়া কবিরবমনপূর্বক মুমূর্ষু হইল। তখন তাহার বসিতাশয় কক্ষকে সমুদ্রতীরীয় জ্বল করিতে লাগিল। ভাগবতকার তাহাদিগের মুখে যে জ্বল বসাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ভ্রজকমাদনাগণকে দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা বলিয়া বোধ হয়। বিষ্ণুপুরণে তাহাদের মুখনির্গত জ্বল বড় মধুর; পড়িয়া বোধ হয়, সমুদ্রপর্যায়গণকে কেহ পরলোদগারিণী মনে করেন করুন, নাগপর্যায়গণ সুধাবিধী বটে। শেষ কালিয় নিজেও কৃষ্ণজ্যোতি আরম্ভ করিল। ক্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়া, যমুনা পরিত্যাগপূর্বক সমুদ্রে গিয়া বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কালিয় সপরিবারে পলাইল। যমুনা প্রসন্ন-মলিলা হইলেন।

এই গেল উপস্তাস। ইহার ভিতর যে রূপক আছে, তাহা এই। এই কলবাহিনী কৃষ্ণসলিলা কালিন্দী অঙ্ককারময়ী ঘোরনাদিনী কালশ্রোতস্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্জ আছে। আমরা যে সকলকে দুঃসময় বা বিপৎকাল মনে করি, তাহাই কালশ্রোতের আবর্জ। অতি ভীষণ বিবসয় সমুদ্রশব্দে সকল এখানে লুকায়িত ভাবে বাস করে। ভ্রজকের শ্রায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভ্রজকের শ্রায় তাহাদের কুটিল গতি, এবং ভ্রজকের শ্রায় অমোঘ বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধবিশেষে এই ভ্রজকের তিন ফণা। আর যদি মনে করা যায় যে, আমাদের ইন্দ্রিয়রতিই সকল অনর্থের মূল, তাহা হইলে, পক্ষেত্রিয়ভেদে ইহার পাঁচটি ফণা, এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাবিলে, ইহার সহস্র ফণা। আমরা ঘোর বিপদাবর্গে এই ভ্রজকমের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে তিনি এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর মূর্ত্তিবিকাশপূর্বক, অভয়বংশী বাদন করেন, শুনিতে পাইলে জীব আশাবিত্ত হইয়া স্রুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। করালনাদিনী

কালতরঙ্গিনী প্রসরসলিলা হয়। এই কৃষ্ণসলিলা ভীমনাদিনী কালস্রোতস্বতীর আশ্রমমধ্যে অমঙ্গলভুজঙ্গমের মস্তকারুঢ় এই অভয়বংশীধর মূর্তি, পুরাণকারের অপূর্ব সৃষ্টি। যে গড়িয়া পূজা করিবে, কে তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিতে সাহস করিবে?

আমরা ধেমুকাসুর (গর্দভ) এবং প্রলম্বাসুরের বধবৃত্তান্ত কিছু বলিব না, কেবল উহা বলরামকৃত—কৃষ্ণকৃত নহে। বজ্রহরণ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা আমরা অন্য পরিচ্ছেদে বলিব, এখন কেবল গিরিযজ্ঞবৃত্তান্ত বলিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব।

বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন নামে এক পর্বত ছিল, এখনও আছে। গৌসাই ঠাকুরেরা এক্ষণে যেখানে বৃন্দাবন স্থাপিত করিয়াছেন, সে এক দেশে, আর গিরিগোবর্দ্ধন আর এক দেশে। কিন্তু পুরাণাদিতে পড়ি উহা বৃন্দাবনের সীমান্তস্থিত। ঐ পর্বত এক্ষণে যে ভাবে আছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে উহা কোন কালে, কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয়, অনেক সহস্র বৎসর ঐ ক্ষুদ্র পর্বত ঐ অবস্থাতেই আছে, এবং ইহার উপর সংস্থাপিত হইয়া উপন্যাস রচিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ঐ গিরি তুলিয়া সপ্তাহ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

উপন্যাসটা এই। বর্ষাস্তে নন্দাদি গোপগণ বৎসর বৎসর একটা ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেন। তাহার আয়োজন হইতেছিল। দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেন ইহা হইতেছে? তাহাতে নন্দ বলিলেন, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিতে শস্ত জন্মে, শস্ত খাইয়া আমরা ও গোপগণ জীবনধারণ করি, এবং গো সকল দুগ্ধবতী হয়। অতএব ইন্দ্রের পূজা করা কর্তব্য। কৃষ্ণ বলিলেন, আমরা কৃষী নহি। গাভীগণই আমাদের অবলম্বন, অতএব গাভীগণের পূজা, অর্থাৎ তাহাদিগকে উত্তম ভোজন করানই আমাদের বিধেয়। আর আমরা এই গিরির আশ্রিত, ইহার পূজা করুন। ব্রাহ্মণ ও কুর্ধার্ভগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান। তাহাই হইল। অনেক দীনদরিদ্র কুর্ধার্ভ এবং ব্রাহ্মণগণ (তাহারা দরিদ্রের মধ্যে) ভোজন করিলেন। গাভীগণ খুব খাইল। গোবর্দ্ধনও মূর্ত্তিমান হইয়া রাশি রাশি অন্নবান্ধন খাইলেন। কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নিজেই এই মূর্ত্তিমান গিরি সাজিয়া খাইয়াছিলেন।

ইন্দ্রযজ্ঞ হইল না। এখন পাঠক জানিতে পারেন যে, আমাদের পুরাণেতিহাসোক্ত দেবতা ও ব্রাহ্মণ সকল ভারি বদরাগী। ইন্দ্র বড় রাগ করিলেন। মেঘগণকে আজ্ঞা দিলেন, বৃষ্টি করিয়া বৃন্দাবন ভাসাইয়া দাও। মেঘ সকল তাহাই করিল। বৃন্দাবন ভাসিয়া যায়। গোবৎস ও ব্রজবাসিগণের চুঃখের আর সীমা রহিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন উপাড়িয়া বৃন্দাবনের উপর ধরিলেন। সপ্তাহ বৃষ্টি হইল, সপ্তাহ তিনি পর্বত

এক হাতে তুলিয়া ধরিয়া রাখিলেন। বৃন্দাবন রক্ষা পাইল। ইন্দ্র হার মানিয়া, কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ ও সন্ধি স্থাপন করিলেন।

মহাভারতে শিশুপালবাক্যে এই গিরিযজ্ঞের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল বলিতেছে যে, কৃষ্ণ যে বন্দীকৃত্য গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিল, তাই কি একটা বিচিত্র কথা? কৃষ্ণের প্রভূত অন্নব্যঞ্জনভোজন সম্বন্ধেও একটু ব্যঙ্গ আছে। এই পর্য্যন্ত। কিন্তু গোবর্দ্ধন আজিও বিদ্যমান,—বন্দীকৃত নয়, পর্বত বটে। কৃষ্ণ কি এই পর্বত সাত দিন এক হাতে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন? ষাঁহার ঠাঁহাকে ঈশ্বর্যবতার বলেন, ঠাঁহার বলিতে পারেন, ঈশ্বরের অসাধ্য কি? স্বীকার করি—কিন্তু সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করি, ঈশ্বর্যবতারের পর্বতধারণের প্রয়োজন কি? ষাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত মেঘ এক কোঁটাও বৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না, সাত দিন পাহাড় ধরিয়া বৃষ্টি হইতে বৃন্দাবন রক্ষা করিবার ঠাঁহার প্রয়োজন কি? ষাঁহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত মেঘ বিদূরিত, বৃষ্টি উপশান্ত, এবং আকাশ নির্মল হইতে পারিত, ঠাঁহার পর্বত তুলিয়া ধরিয়া সাত দিন খাড়া থাকিবার প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, ইহা ভগবানের লীলা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিব কি? ইহাও সত্য, কিন্তু আগে বুঝিব যে, ইনি ভগবান, তাহার পর গিরিধারণ ঠাঁহার ইচ্ছাবিস্তারিত লীলা বলিয়া স্বীকার করিব। এখন, ইনি ভগবান, ইহা বুঝিব কি প্রকারে? ইহার কার্য্য দেখিয়া। যে কার্য্যের অভিপ্রায় বা সুসঙ্গতি বুঝিতে পারিলাম না, সেই কার্য্যের কৰ্ত্তা ঈশ্বর, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় কি? না বুঝিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় কি? যদি তাহা না যায়, তবে অনৈসর্গিক পরিত্যাগের যে নিয়ম আমরা সংস্থাপন করিয়াছি, তাহারই অম্লবর্তী হইয়া এই গিরিধারণবৃত্তান্তও উপস্থাসমধ্যে গণনা করাই বিধেয়। তবে এতটুকু সত্য থাকিতে পারে যে, কৃষ্ণ গোপগণকে ইন্দ্রযজ্ঞ হইতে বিরত করিয়া গিরিযজ্ঞে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তার পর বাকি অনৈসর্গিক ব্যাপারটা গোবর্দ্ধনের উৎখাত ও পুনঃস্থাপিত অবস্থা অনুসারে গঠিত হইয়াছে।

এরূপ কার্য্যের একটা নিগূঢ় তাৎপর্য্যও দেখা যায়। যেমন বুঝিয়াছি, তেমনই বুঝাইতেছি।

এই জগতের একই ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়া কোন দেবতা নাই। ইন্দ্র ঋতু বর্ষণে, তাহার পর রক্ত প্রত্যয় করিলে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া যায়। অর্থ হইল যিনি বর্ষণ করেন। বর্ষণ করে কে? যিনি সর্ব্বকৰ্ত্তা, সর্ব্বত্র বিধাতা, তিনিই বৃষ্টি করেন,—বৃষ্টির জন্য এক জন পৃথক্ বিধাতা কল্পনা করা বা বিশ্বাস করা যায় না। তবে

ইন্দের জন্ত বজ্র বা সাধারণ বজ্রে ইন্দের ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। একুপ ইন্দেরপূজার একটা অর্থও আছে। ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি, তাঁহার গুণ সকল অনন্ত, কার্য অনন্ত, শক্তি সকলও সংখ্যায় অনন্ত। একুপ অনন্তের উপাসনা কি প্রকারে করিব? অনন্তের ধ্যান হয় কি? বাহ্যের হয় না, তাহারাই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পৃথক পৃথক উপাসনা করে। একুপ শক্তি সকলের বিকাশস্থল জড়জগতে বড় জাঙ্জল্যমান। সকল জড়পদার্থে তাঁহার শক্তির পরিচয় পাই। তৎ-সাহায্যে অনন্তের ধ্যান সুসাধ্য হয়। এই জন্ত প্রাচীন আৰ্য্যগণ তাঁহার জগৎপ্রসবিতৃষ্ স্মরণ করিয়া সূর্য্যে, তাঁহার সর্বাধিকতা স্মরণ করিয়া বরুণে, তাঁহার সর্বভূতের আধারভূতি স্মরণ করিয়া অগ্নিতে, তাঁহাকে জগৎপ্রাণ স্মরণ করিয়া বায়ুতে, এবং তদ্রূপে অন্ত্যস্ত জড়পদার্থে তাঁহার আরাধনা করিতেন।* ইন্দের এইরূপ তাঁহার বর্ষণকারিণী শক্তির উপাসনা করিতেন। কালে, লোকে উপাসনার অর্থ ভুলিয়া গেল, কিন্তু উপাসনার আকারটা বলবান্ রহিল। কালে এইরূপই ঘটিয়া থাকে; ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা সহস্রক্রে তাহাই ঘটয়াছে; ভগবদগীতায় এবং মহাভারতের অন্ত্র দেখিব যে, কৃষ্ণ ধর্ম্মের এই মৃতদেহের সংকারে প্রবৃত্ত—তৎপরিবর্তে অতি উচ্চ ঈশ্বরোপাসনাতে লোককে প্রবৃত্ত করিতে যত্ববান্। বাহ্য পরিণত বয়সে প্রচারিত করিয়াছিলেন, এই গিরিযজ্ঞ তাহার প্রবর্তনায় তাঁহার প্রথম উত্তম। জগদীশ্বর সর্বভূতে আছেন; মেঘেও যেমন আছেন, পর্বতে ও গোবৎসেও সেইরূপ আছেন। যদি মেঘের বা আকাশের পূজা করিলে তাঁহার পূজা করা হয়, তবে পর্বত বা গোগণের পূজা করিলেও তাঁহারই পূজা করা হইবে। বরং আকাশাদি জড়পদার্থের পূজা অপেক্ষা দরিদ্রদিগের এবং গোবৎসের সপরিতোষ ভোজন করান অধিকতর ধর্ম্মানুসৃত। গিরিযজ্ঞের তাৎপর্য্যটা এইরূপ বুঝি।

* যখন আমি প্রথম "প্রচার" নামক পত্রে এই মত প্রকাশিত করি, তখন অনেক অনেক কথা বলিয়াছিলেন। অনেকে ভাবিয়াছিলেন, আমি একটা নতুন মত প্রচার করিতেছি। তাঁহারা জানেন না যে, এ আমার মত নহে, সন্ন্যাসিন্দ্রকায় বাবুর মত। আমি বাবুর বাক্য নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি—

"মাহাত্ম্যাদি দেবতার এক আত্মা বহুধা ক্রুরে। একতান্মনোহন্তে দেবোঃ প্রত্যঙ্গানি ভবতি। * * * * * আত্মা এব এবাং রথো ভবতি, আত্মা অবাং, আত্মা আহুধন, আত্মা ইবং, আত্মা সর্বদেবত।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্রজগোপী—বিষ্ণুপুরাণ

কৃষ্ণদেবীদিগের নিকট যে কথা কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান কলঙ্ক, এবং আধুনিক কৃষ্ণ-উপাসকদিগের নিকট যাহা কৃষ্ণভক্তির কেন্দ্রস্বরূপ, আমি এক্ষণে সেই ভাবে উপস্থিত। কৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপীদিগের সম্বন্ধের কথা বলিতেছি। কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনায় এই ভাব অতিশয় গুরুতর। এই জন্ম এ কথা আমরা অতিশয় বিস্তারের সহিত কহিতে বাধ্য হইব।

মহাভারতে ব্রজগোপীদিগের কথা কিছুই নাই। সভাপর্বে শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে শিশুপালকৃত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদি মহাভারতপ্রণয়নকালে ব্রজগোপীগণঘটিত কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপালবধবৃত্তান্ত প্রণীত করিয়াছেন, তিনি কখনই কৃষ্ণনিন্দাকালে তাহা পরিভ্রাণ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত যে, আদিম মহাভারত প্রণয়নকালে এ কথা চলিত ছিল না—তাহার পরে গঠিত হইয়াছে।

মহাভারতে কেবল ঐ সভাপর্বে দ্রৌপদীবজ্রহরণকালে, দ্রৌপদীকৃত কৃষ্ণস্তবে ‘গোপীজনপ্রিয়’ শব্দটা আছে, যথা—

“আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপতা চিন্তিতে হরিঃ।

গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়।।”

বৃন্দাবনে গোপীদিগের বাস। গোপ থাকিলেই গোপী থাকিবে। কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর, মাধুর্য্যময় এবং ক্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি গোপ গোপী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। হরিবংশে আছে যে, অীকৃষ্ণ বালিকা যুবতী বৃদ্ধা সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। এবং যমলাঞ্ছনভঙ্গ প্রভৃতি উৎপাতকালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়া গোপনমগীর্ণ রোদন করিত এক্রূপ লেখা আছে। অতএব এই ‘গোপীজনপ্রিয়’ শব্দে সুন্দর শিশুর প্রতি জীজনশুলভ স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না।

আমরা পূর্বে যে নিয়ম করিয়াছি, তদনুসারে মহাভারতের পর বিষ্ণুপুরাণ দেখিতে হয়, এবং পূর্বে যেমন দেখিয়াছি, এখনও তেমনই দেখিব যে, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এবং ভাগবত পুরাণে উপন্যাসের উত্তরোত্তর জীবদ্ধি হইয়াছে। এই ব্রজগোপীভাব মহাভারতে নাই, বিষ্ণুপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে,

তাহার পর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তাহার স্রোত বহিয়াছে।

এই সকল কথা সবিস্তারে বুঝাইবার জন্য আমরা বিষ্ণুপুরাণে যতটুকু গোপীনিগের কথা আছে, তাহা সমস্ত উদ্ধৃত করিতেছি। দুই একটা শব্দ এরূপ আছে যে, তাহার দুই রকম অর্থ হইতে পারে, একজন আমি মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়া পশ্চাৎ তাহা অর্থবাদিত করিলাম।

“কৃষ্ণস্ত বিমলং যোম শরচ্চন্দ্রস্ত চন্দ্রিকাম্।

তথা কুমুদিনীং ফল্গাম্যাদিতদিগন্তরাম্ ॥ ১৪ ॥

বনমাজিৎ তথা কৃষ্ণভৃঙ্গমালাং মনোরমাম্।

বিলোক্য সহ গোপীভির্দগ্ধনন্দক্রে রতিং প্রতি ॥ ১৫ ॥

সহ রামেণ মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম্।

জর্গো কলগদং শৌরিনার্নাতম্বী-কৃত-ব্রতম্ ॥ ১৬ ॥

রম্যং গীতধ্বনিং শ্রদ্ধা সন্ত্যজ্যাবসথাস্তদা।

আজগ্মুথরিতা গোপ্যো যত্রান্তে মধুসূদনঃ ॥ ১৭ ॥

শটৈঃ শটৈর্জগৌ গোপী কাচিৎ তস্ত লয়াশ্রুগম্।

নস্তাবধানা কাচিৎ তমেব মনসা স্মরন্ ॥ ১৮ ॥

কাচিৎ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রোক্তা লজ্জামুপাগতা।

যযৌ চ কাচিৎ প্রেমাক্ষা তৎপার্ষমবিলজ্জিতা ॥ ১৯ ॥

কাচিদাবসথস্ত্যক্তঃস্থিতা দৃষ্টা বহিগুর্জন্।

তদ্রম্যেদেন গোবিন্দং দধৌ মীলিতুনোচনা ॥ ২০ ॥

তচ্চিহ্নাবিশৃপাহনান কীর্ণপুণ্ড্রা তথা।

তদপ্রাশ্মিমহাদ্ভাববিনীমোহেনমুদ্রা ॥ ২১ ॥

চিস্তয়ন্তী জগৎস্থতিং পরব্রহ্মস্বরূপিনীম্।

নিকচ্ছাসতয়া মুক্তিং গতাত্মা গোপকঙ্করা ॥ ২২ ॥

গোপীপরিব্রতে। ব্যস্ত্রিঃ শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্।

মানয়ামাস গোবিন্দো বাসারতুরদ্যোৎসবঃ ॥ ২৩ ॥

গোপ্যাস্ত বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্ঠাস্বায়ত্ত্বমুদ্রয়ঃ।

অগ্ৰদেশং গতে কৃষ্ণে চেকুর্বন্দাবনান্তরম্ ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণে নিকঙ্করদয়া ইদমুচুঃ পরস্পরম্।

কৃষ্ণোহহমেত্তল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যত্যং গতিঃ।

অত্রা ব্রবীতি কুরুত মনু নীতিনিশাম্যতাম্ ॥ ২৫ ॥
 দুই কামিনী । ভিত্তাজ কুরুতঃস্ববিত্তি চাপরা ।
 বাহুদ্যাকোটা কুরুত লীলালঙ্ঘনমদে ॥ ২৬ ॥
 অত্রা ব্রবীতি তে নোদা নিশাধীন দীপ্তমিহ ।
 অথং বৃষ্টিভরেনাত্তে বৃষ্টি দোষধীনো ময়া ॥ ২৭ ॥
 খেত্বেকৌহরং ময়া কিস্তো বিচরন্ত বর্বেচ্ছয়া ।
 গোপী ব্রবীতি বৈ চাত্ৰা কুরুলীলায়ুকাবিনী ॥ ২৮ ॥
 এবং নানাভকারায় কুরুচেটায় তাত্তদা ।
 গোপো ব্যগ্রাঃ সমক্কেরু রমাঃ সন্মাদনং বনম্ ॥ ২৯ ॥
 বিলোঠ্যাকা ভূষং গ্রাহ গোপী গৌশবরাদনা ।
 পুলকাকিতসর্কাদী বিকাশিনরনোৎপলা ॥ ৩০ ॥
 ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাকার-রেখাবজ্রালি ! পশ্যত ।
 পদাশ্চেতানি কুরুত লীলালঙ্ঘতগামিনঃ ॥ ৩১ ॥
 কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্য মদালসা ।
 পদানি তস্তাশ্চৈতানি ঘনানুগতনুনি চ ॥ ৩২ ॥
 পুষ্পাবচয়মদ্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদবো ধ্রুবম্ ।
 যেনাগ্রাক্রান্তিমাভ্রাণি পদানুগ্ৰহ মতাশ্বনঃ ॥ ৩৩ ॥
 অদ্রোপবিশ্ণু সা তেন কাপি পুট্পৈরলঙ্ঘতা ।
 অগ্ৰজয়নি সর্বায়া বিষ্ণুভ্যক্তিতো যয়া ॥ ৩৪ ॥
 পুষ্পবন্ধনসন্ধান-কৃতমানামপাশু তাম্ ।
 নন্দগোপস্থতো যাত্তো মার্গেণানেন পশ্যত ॥ ৩৫ ॥
 অস্থয়ানেহসমর্থ্যাশ্চা নিতম্ভভরমস্থবা ।
 যা গন্তব্যে ক্রতং যাতি নিম্নপাদাগ্রসংস্থিতিঃ ॥ ৩৬ ॥
 হস্তগত্যাগ্রহস্তেয়ং তেন যাতি তথা সখি ।
 অনায়ত্তপদদ্যাসা লক্ষ্যতে পদপঙ্কতিঃ ॥ ৩৭ ॥
 হস্তসংস্পর্শমাত্রেন ধুস্তেইনযা বিমানিতা ।
 নৈরাশ্রমন্দগামিষ্ঠা নিবৃত্তং লক্ষ্যতে পদম্ ॥ ৩৮ ॥
 নুনশ্রুতা স্বরামীতি পুনরেত্য়ামি তেহস্তিকম্ ।
 তেন কৃষ্ণেন যেইনযা স্বরিতা পদপঙ্কতিঃ ॥ ৩৯ ॥
 প্রবিষ্টো গহনং কুরুঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে ।
 নিবর্ত্তধ্বং শশাক্ত নৈতদ্বীদিতিগোচরে ॥ ৪০ ॥

নিবৃত্তান্তান্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে ।
 যমুনাতীরমাগত্য অশ্রুজলচরিতং তদা ॥ ৪১ ॥
 ততো দদুশ্চরায়ান্তং বিকাশি-মুখপঙ্কজম্ ।
 গোপার্শ্বলোকাগোলারং কৃষ্ণমক্লিষ্ট-চেষ্টিতম্ ॥ ৪২ ॥
 কাচিদালোক্য গোবিন্দমায়ান্তমভিহর্ষিতা ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি গ্রাহ নাজ্ঞতুর্দৈরয়ং ॥ ৪৩ ॥
 কাচিদ্রজভঙ্গুরং কৃষ্ণা ললাটফলকং হরিম্ ।
 বিলোক্য নেত্রভৃঙ্গাভ্যাং পম্পো তমুখপঙ্কজম্ ॥ ৪৪ ॥
 কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিত-বিলোচনা ।
 তসৈব রূপং ধ্যায়ন্তী ষোণাকুণ্ডেব চাবভে ॥ ৪৫ ॥
 ততঃ কান্ধিৎ প্রিয়ালটৈঃ কান্ধিচন্দ্রভঙ্গ-বীকটৈঃ ।
 নিহ্নেহহনয়মন্ত্রাশ্চ করম্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৪৬ ॥
 তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভির্গোপীভিঃ সহ সাদরম্ ।
 ররাম দাসগোষ্ঠীভিরুদার-চরিতো হরিঃ ॥ ৪৭ ॥
 রাসমণ্ডল-বন্ধোহপি কৃষ্ণপার্ষ্মমুজ্জ্বলতা ।
 গোপীজনেন নৈবাত্তদেকস্থানস্থিরাশ্রয়ন ॥ ৪৮ ॥
 হন্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্ ।
 চকার তৎকরম্পর্শনিমীলিতদৃশাং হরিঃ ॥ ৪৯ ॥
 ততঃ স ববুভে রাসশ্চলদলয়নিবনঃ ।
 অল্পযাতশরৎকাব্য-গেয়গীতিরহুক্রমাং ॥ ৫০ ॥
 কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুম্বদাকরম্ ।
 অগৌ গোপীজনশ্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ ॥ ৫১ ॥
 পরিবর্ত্তশ্রমেণৈকং চলদলয়লাগিনীম্ ।
 দদৌ বাহলতাং স্বক্কে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ॥ ৫২ ॥
 কাচিং প্রবিলসঘাহঃ পরিবভ্য চূচু তম্ ।
 গোপী গীতজ্জতিব্যাঙ্গ-নিপুণা মধুহৃদনম্ ॥ ৫৩ ॥
 গোপীকপোলসংশ্লেশমভিপত্য হরেতু জৌ ।
 পুলকোকাসম-শস্ত্রায় শ্বেদাচ্ছ ঘনতাং গতৌ ॥ ৫৪ ॥
 রাসগেহং অগৌ কৃষ্ণো বাবৎ তারতরঙ্গধনিঃ ।
 সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবৎ তা দ্বিগুণং জন্তঃ ॥ ৫৫ ॥
 গতে তু গমনং চকুর্বলনে সংমুখং যযুঃ ।

প্রতিসোমাস্ত্রলোমাত্যাং ভেদ্যগোপাঙ্গনা ইন্দিম ॥ ৫৬ ॥

ন তথা সহ গোপীভী রম্য মধুসূদনঃ ।

বধাৎকোটিপ্রমিতঃ ক্ষণেন বিনাভবৎ ॥ ৫৭ ॥

তা বার্থ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্জাতৃভিতৃথা ।

কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাক্ষৌ রমহস্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥ ৫৮ ॥

দোহপি কৈশোরকবয়ো যানয়ন্ মধুসূদনঃ ।

যেমে তাভিরমেয়াঙ্গা ক্ষপাঙ্ক ক্ষপিতাহিতঃ ॥ ৫৯ ॥

বিষ্ণুপুরাণম্, পঞ্চমাংশঃ, ১৩ অঃ ।

“নির্মলাকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, ফুলকুমুদিনী, দিক্ সকল গন্ধামোদিত, ভুলমালা-
শব্দে বনরাজি মনোরম, দেখিয়া কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত ক্রৌড়া করিতে মানস করিলেন ।
বলরামের সহিত সৌরি অতীব মধুর জ্বীনপ্রিয় নানাভঙ্গীসম্মিলিত অক্ষুটপদ সঙ্গীত গান
করিলেন । রম্য গীতধ্বনি শুনিয়া তখন গৃহপরিভ্যাগপূর্বক বধা মধুসূদন আছেন, সেইখানে
গোপীগণ দ্বারা ঘিরা হইয়া আসিল । কোন গোপী তাঁহার লয়ায় গমনপূর্বক ধীরে ধীরে
গায়িতে লাগিল । কেহ বা কৃষ্ণকে মনোমধ্যে স্মরণপূর্বক তাঁহাতে একমনা হইল । কেহ বা
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া লজ্জিতা হইল । কেহ বা লজ্জাহীন ও প্রেমাক্ষা হইয়া তাঁহার পার্শ্বে
আসিল । কেহ বা গৃহমধ্যে থাকিয়া বাহিরে গুরুজনকে দেখিয়া নিমীলিতলোচনা হইয়া
গোবিন্দকে তদ্ব্যয়ের সহিত ধ্যান করিতে লাগিল । অত্যা গোপকছা কৃষ্ণচিন্তাজনিত
বিপুলান্ধাদে কীর্ণপুণ্য হইয়া এবং কৃষ্ণকে অপ্রাপ্তিহেতু যে মহাছুঃখ তদ্বারা তাহার অশেষ
পাতক বিলীন হইলে, পরব্রহ্মস্বরূপ জগৎকারণকে চিন্তা করিয়া পরোক্ষার্থজ্ঞানহেতু মুক্তিলাভ
করিল । গোবিন্দ শরচ্চন্দ্রমনোরম রাত্রিতে গোপীজন কর্তৃক পরিবৃত হইয়া রাসারম্ভরসে
সমুৎসুক হইলেন । কৃষ্ণ অস্ত্র চলিয়া গেলে গোপীগণ কৃষ্ণচেষ্টার অনুকারিণী হইয়া দলে
দলে বৃন্দাবনমধ্যে কিরিয়া বেড়াইতে লাগিল ; এবং কৃষ্ণে নিরুজ্জ্বল হইয়া পরস্পরকে
এইরূপ বলিতে লাগিল, ‘আমি কৃষ্ণ, এই ললিতগতিতে গমন করিতেছি, তোমরা আমার
গমন অবলোকন কর ।’ অত্যা বলিল, ‘আমি কৃষ্ণ, আমার গান শ্রবণ কর ।’ অপরা
বলিল, ‘হৃষ্ট কালিয়া । এইখানে থাক, আমি কৃষ্ণ,’ এবং বাহ আকোচন-পূর্বক কৃষ্ণলীলার
অনুকরণ করিল । আর কেহ বলিল, ‘হে গোপগণ । তোমরা নির্ভয়ে এইখানে থাক,
বৃথা বৃষ্টির ভয় করিও না, আমি এইখানে গোবর্জন ধরিয়া আছি ।’ অত্যা কৃষ্ণলীলায় কারিণী

* রাগ অর্থে বৃত্ত্যবশেষ :—“অভ্যেক্ষ্যবৃত্ত্যবশতানাং ক্রীড়াংসোঃ ধীরতাং বতলীলং ব্রজভাঃ বৃত্ত্যবশেষঃ রসো নাম”
ইতি ভীষমঃ ।

গোপী বলিল, 'এই ধেনুককে আমি নিক্ষেপ করিয়াছি, তোমরা যত্নসূচকরূপে বিচরণ কর।' এইরূপে সেই সকল গোপী তৎকালে নানাপ্রকার কৃষ্ণচেষ্টাভূবর্তিনী হইয়া ব্যগ্রভাবে রম্য যুদ্ধাবন বনে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এক গোপবরাজনা গোপী ভূমি দেখিয়া সর্বত্র পুলক-রোমাক্ত হইয়া এবং নয়নোৎপল বিকসিত করিয়া বলিতে লাগিল, 'হে সখি! দেখ, এই অক্ষয়জ্যোত্স্নরেখাবস্ত পদচিহ্নসকল লীলালঙ্কৃতগামী কৃষ্ণের। কোন পুণ্যবতী মদালসা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে; তাহারই এই সকল ঘন এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্নগুলি। সেই মহাত্মার (কৃষ্ণের) পদচিহ্নের অগ্রভাগ মাত্র এখানে দেখা যাইতেছে, অতএব নিশ্চিত দামোদর এইখানে উক্ত পুংসকল অবচিৎ করিয়াছেন। তিনি কোনও গোপীকে এইখানে বসিয়া পুংসের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সে জগ্নাস্তরে সর্বাত্মা বিস্মকে অচিৎ করিয়া থাকিবে। পুংসবন্ধনসম্মানে সে গর্বিতা হইয়া থাকিবে, তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নন্দগোপনৃত এই পথে গমন করিয়াছেন দেখ। আর এই পাদাচিহ্ন সকলের নিয়তা দেখিয়া (বোধ হইতেছে) নিতম্বভারমহুরা কেহ তাঁহার সঙ্গে গমনে অসমর্থ হইয়া গন্তব্যে দ্রুত গমনের চেষ্টা করিয়াছিল। হে সখি, আর এইখানে পদচিহ্ন সকল দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সেই অনায়ত্তপদস্থাসা গোপীকে তিনি হস্তে গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে হস্তসংস্পর্শ পরেই সেই ধূর্তের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল; কেন না এ পদচিহ্ন দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, সে নৈরাশ্রহেতু মন্দগামিনী হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হইয়াছিল। আর সেই কৃষ্ণ নিশ্চিত ইহাকে বলিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই গিয়া আমি তোমার নিকট পুনর্বীর আসিতেছি। সেই জন্ত ইহার পদপঙ্কতি আবার দ্বিগুণিত হইয়াছে। এখন গহনে কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছেন বোধ হয়, কেন না আর পদচিহ্ন দেখা যায় না। এখানে আর চক্ষুরিণ প্রবেশ করে না। আইস ফিরিয়া যাই।"

"অনন্তর গোপীগণ দেখিল, বিকশিতমুখপঙ্কজ ত্রৈলোক্যের রক্ষাকর্তা অক্লিষ্টকর্মা কৃষ্ণ আসিলেন। কেহ গোবিন্দকে আগত দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। কোন গোপী ললাটফলকে ভ্রূভঙ্গ করিয়া, হরিকে দেখিয়া, তাঁহার মুখপঙ্কজ নেত্রভঙ্গদ্বয়ের দ্বারা পান করিতে লাগিল। কেহ গোবিন্দকে দেখিয়া নিম্নলিখিত লোচনে যোগারূঢ়া দৃষ্টি শোভিত হইয়া তাঁহার রূপ ধ্যান করিতে লাগিল। অনন্তর মাধব তাহাদিগকে অমুনয়নীয় বিবেচনায় কাহাকে বা প্রিয়ালাপের দ্বারা ভ্রূভঙ্গবীকণের দ্বারা, কাহাকে বা করস্পর্শের দ্বারা সান্বনা করিলেন। হরি প্রসন্নচিত্তা গোপীদিগের সহিত সাদরে রাসমণ্ডলমধ্যে জৌড়া করিতে

লাগিলেন। কিন্তু তাহারা কৃষ্ণের পার্শ্ব ছাড়ে না, এক স্থানে স্থির থাকে, একত্র সেই গোপীদিগের সহিত রাসমণ্ডলবন্ধন হইল না। পরে একে একে গোপীদিগকে হস্তের দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহারা উহার করস্পর্শে নিম্নলিখিতচক্ৰ হইলে, কৃষ্ণ রাসমণ্ডলী প্রস্থত করিলেন। অতঃপর গোপীদিগের চক্ৰলবলয়শক্তি এবং গোপীগণগীত শরৎকায়্যগানের দ্বারা অল্পমাত্র রাসক্ৰীড়ার তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ পরচক্ৰ ও কৌতুকী ও কুমুদ সম্বন্ধীয় গান করিলেন। গোপীগণ পুনঃপুনঃ এক কৃষ্ণনামই গায়িতে লাগিল। এক গোপী মর্ত্তনজনিত গ্রামে প্রাপ্ত হইয়া চক্ৰলবলয়কনিবিশিষ্ট বাহুলতা মধুসূদনের কাছে স্থাপিত করিল। কপটভার নিপুণা কোন গোপী কৃষ্ণকীতের অভিঞ্জে বাহুদ্বারা উহারকে আসীন করিয়া মধুসূদনকে চুম্বিত করিল। কৃষ্ণের ভূজের কোন গোপীর কণোলসংগের প্রাপ্ত হইয়া পুলকোদগমরূপ শব্দোৎপাদনের ক্ষমতা খেদামুমেদ প্রাপ্ত হইল। তারতর ধ্বনিতে কৃষ্ণ যাবৎকাল রাসগীত গায়িতে লাগিলেন, তাবৎকাল গোপীগণ ‘সাধু কৃষ্ণ, সাধু কৃষ্ণ’ বলিয়া দ্বিগুণ গায়িল। কৃষ্ণ গেলে তাহারা গমন করিতে লাগিল, কৃষ্ণ আবর্ত্তন করিলে তাহারা সম্মুখে আসিতে লাগিল, এইরূপ অতিলোম অল্পলোম গতির দ্বারা গোপালনাগণ হরিকে ভজনা করিল। মধুসূদন গোপীদিগের সহিত সেইখানে ক্রীড়া করিলেন। তাহারা উহারকে বিনা, স্পন্দমাত্রকে কোটি বৎসর মনে করিতে লাগিল। ক্রীড়াভূরাগিনী গোপালনাগণ পতির দ্বারা, পিতার দ্বারা, ভ্রাতার দ্বারা নিবারণিত হইয়াও রাজিকালে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিল। শত্রুধ্বংসকারী অমেয়াত্মা মধুসূদনও আপনাকে কিশোরবরক জানিয়া, রাজে তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন।*

এই অল্পবাদ সম্বন্ধে একটি কথা বক্তব্য এই যে, “রম্”—ধাতুনিম্পন্ন শব্দের অর্থে আমি ক্রীড়ার্থে “রম্” ধাতু বুঝিয়াছি; যথা, “রতিপ্রিয়া” অর্থে আমি ‘ক্রীড়াভূরাগিনী’ বুঝিয়াছি। আদৌ “রম্” ধাতু ক্রীড়ার্থেই ব্যবহৃত। উহার যে অর্থান্তর আছে, তাহা ক্রীড়ার্থ হইতেই পশ্চাৎ নিম্পন্ন হইয়াছে। ‘রতি’ ও ‘রতিপ্রিয়’ শব্দ এই অর্থে যে কৃষ্ণলীলায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা অনেক উদাহরণ আছে। পাঠক হরিবংশের সপ্তষষ্ঠিতম পুস্তকান্তরে অষ্টষষ্ঠিতম অধ্যায়ে এইরূপ প্রয়োগ দেখিবেন।* তথায়

* স ভর বরনা ক্রীড়ার্থংগাঠৈঃ সনাননঃ।

রেখে বৈ বিবসঃ কৃষ্ণঃ পুরা বর্ণিতো যথা।

তাং ক্রীড়মানং গোপানাং কৃষ্ণং ভাঙীকরাসিনম্।

রসরতিম্ গ বহনো বনোঃ ক্রীড়নকৈতভা।

ক্রীড়াশিল্প গোপালনকে 'রতিশ্রিয়' গোপাল বলা হইয়াছে। আর এই অর্থই এখানে সমাজ, কেন না, 'রাস' একটি ক্রীড়াবিশেষ। অতীতি ভানতরঙ্গের কোন কোন স্থানে ইচ্ছা ক্রীড়া বা নৃত্য প্রচলিত আছে। রাসের অর্থ কি, তাহা জ্ঞান বাসী বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন—

“সম্ভোগব্যতিবন্ধতানং ক্রীপুংলাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যারিনোদো রাসো নাম।”

অর্থাৎ ক্রীপুরুষে পরম্পরের হাত ধরিয়া গায়িতে গায়িতে এবং মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস। বালকবালিকার একরূপ নৃত্য করে আমরা দেখিয়াছি, এবং বাহারা বাল্য অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাও দেশবিশেষে একরূপ নৃত্য করে শুনিয়াছি। ইহাতে আদিসের নামগন্ধও নাই।

‘রাস’ একটা খেলা, এবং ‘রতি’ শব্দে খেলা। অতএব রাসবর্ণনে ‘রতি’ শব্দ ব্যবহৃত হইলে অনুবাদকালে তৎপ্রতিশব্দস্বরূপ ‘ক্রীড়া’ শব্দই ব্যবহার করিতে হয়।

এই রাসলীলাবৃত্তান্ত কিয়ৎপরিমাণে দুর্বোধ্য। ইহার ভিতরে যে গুঢ় তাৎপর্য আছে, তাহা আমি এছাত্তরে পরিস্ফুট করিয়াছি। কিন্তু এখানে এ তত্ত্ব অসম্পূর্ণ রাখা অসুচিত, এজন্য যাহা বলিয়াছি, তাহা পুনরুক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি।

আমি “ধর্মতত্ত্ব” গ্রন্থে বলিয়াছি যে, মহুগ্ৰহই মহুগ্ৰের ধর্ম। সেই মহুগ্ৰহ বা ধর্মের উপাদান আমাদের বৃত্তিগুলির অহুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা। সেই বৃত্তিগুলিকে শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী এবং চিন্তরঞ্জিনী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্যাদির পর্যালোচনা করিয়া আমরা নির্মল এবং অতুলনীয় আনন্দ অমুভূত করি, সেই সকলের নাম দিয়াছি চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক্ অহুশীলনে, সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপামুভূতি হইতে পারে। চিন্তরঞ্জিনীবৃত্তির অহুশীলন অভাবে “ধর্মের হানি হয়। যিনি আদর্শ মহুগ্ৰ, তাহার কোন বৃত্তিই অনহুশীলিত বা ক্ষুণ্ণহীন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই রাসলীলা কৃষ্ণ এবং গোপীগণ কৃত সেই চিন্তরঞ্জিনীবৃত্তি অহুশীলনের উদাহরণ।

কৃষ্ণ-পক্ষে ইহা উপভোগমাত্র, কিন্তু গোপী-পক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনা। এক দিকে অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্যবিকাশ, আর এক দিকে অনন্তসুন্দরের উপাসনা। চিন্তরঞ্জিনীবৃত্তির

অন্তে স পরিগারন্তি গোপা মূর্তমানসঃ।

গোপালাঃ কৃষ্ণমেবাচ্চ গারন্তি স রতিশ্রিয়াঃ।”

এই তিন বাক্যে “রস” ধাতু হইতে নিম্ন শব্দ তিনবার ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ণা, “রসে”, “রসরতি”, “রতিশ্রিয়া”, তিন বারই ক্রীড়ার্থে, অর্থাৎ কোন মতেই ঘটান যায় না। কেন না গোপালদিগের কথা হইতেছে।

চরম অস্থায়ীতার সেই বুদ্ধিভিত্তিকে ঈশ্বরস্বীকার। এটীকাল ভারতে জীবনের জ্ঞানমার্গ বিদ্বিধ; কোননা; কোনদিন অমৃতের নিকট। প্রীতিমোহের সঙ্গে কর্মসম্বন্ধ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, কথিত হইয়াছে, “সাক্ষাৎপদ্ধতির মূলে”। অমৃতাপ নানা কারণে অদ্বিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্যের মোহবশিত যে অমৃতাপ, তাহা মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই জীবজাতির জীবনসার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহাতে বর্তমান। শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্রামলসলিলা যমুনা, প্রকৃতিতত্ত্বসুসুভাসিত কৃষ্ণবিহঙ্গমকুঞ্জিত বৃন্দাবন-বনস্থলী, এবং তন্মধ্যে অনন্তসুন্দরের স্বশরীরে বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণগীতি। এইরূপ সর্ব-প্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা গোপীগণের ভক্তি উদ্ভিজ্জা হইলে, তাহারা কৃষ্ণামুরাগিনী হইয়া আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা কহিতে লাগিল, এবং কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অমুরাগিনী হইয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় যে অভেদ জ্ঞান, যাহা যোগীর যোগের এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য, তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল।

ইহাও আমাদের স্বীকার করিতে হয়, যুবক যুবতী একত্র হইয়া নৃত্যগীত করা আমাদের আধুনিক সমাজে নিন্দনীয়। অস্ত্রাস্ত্র সমাজে—যথা ইউরোপে—নিন্দনীয় নহে। বোধ হয়, যখন বিষ্ণুপুরাণ প্রণীত হইয়াছিল, তখনও সমাজের এইরূপ অবস্থা ছিল, এবং পুরাণকারেরও মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, কার্য্যটা নিন্দনীয়। সেই জন্তই তিনি লিখিয়া থাকিবেন যে,—

“তা বার্ষ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিত্থা।”

এবং সেই জন্তই অধ্যায়শেষে কৃষ্ণের দোষক্ষালন জন্ত লিখিয়াছেন,—

“তত্ত্বজ্ঞানং তথা তাত্ত্ব সর্বভূতেষু চেবরঃ।

আত্মস্বরূপরূপোহসৌ ব্যাপ্য বায়ুরিব স্থিতঃ ॥

যথা সমস্তভূতেষু নভোহগ্নিঃ পৃথিবী জলম্।

বায়ুশাখা তথৈবাসৌ ব্যাপ্য সর্বমবস্থিতঃ ॥

তিনি তাহাদিগের ভর্তৃগুণে এবং তাহাদিগেতে ও সর্বভূতেতে, ঈশ্বরও আত্মস্বরূপ রূপে সকলই বায়ুর স্থায় ব্যাপিয়া আছেন। যেমন সমগ্র ভূতে, আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল এবং বায়ু, তেমনি তিনিও সর্বভূতে আছেন।

কৃষ্ণহনিঃকৃত্যং বাণীং পাত্ৰাং বাবোদয়েবিত্যং ।

তাসাং গ্রন্থিভীমভ্য হস্তিভ্যাম্ভীকৃত্যঃ ।

চাক্ষুঃশিরে কেশাঃ কূটগ্রে গোপবোবিত্যম্ ।

এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ ।

শারদীযু সচন্দ্রাচ্ নিশাচ্ যুগ্মে হৃদী ॥

হরিবংশে, ৭৭ অধ্যায়ঃ ।

“কৃষ্ণ রাত্রে চন্দ্রমার নববৌবন (বিকাশ) দেখিয়া এবং রম্যা শারদীয়া নিশা দেখিয়া ক্রীড়াভিলাষী হইলেন। কখনও ব্রজের শুকগোময়াকীর্ণ রাজপথে জাতদৰ্প যুগ্মগণকে বীৰ্য্যবান্ কৃষ্ণ যুদ্ধে সংযুক্ত করিতেন, কখনও বলদগু গোপালগণকে যুদ্ধ করাইতেন, এবং কুস্তীরের জ্বাং গোপগণকে বনমধ্যে গ্রহণ করিতেন। কালজ্ঞ কৃষ্ণ আপনার কিশোর বয়সের সম্মানার্থ যুবতী গোপকন্যাগণের জন্ত কাল নির্ণীত করিয়া রাত্রে তাহাদিগের সহিত আনন্দানুভব করিলেন। সেই গোপসুন্দরীগণ নয়নান্বেষণ দ্বারা ধরাগত চন্দ্রের মত তাঁহার সূন্দর মুখমণ্ডল পান করিল। সুবসন কৃষ্ণ, হরিভালার্জ পীত কৌণ্ডেয় বসন পরিহিত হইয়া কান্তরত হইলেন। অঙ্গদসমূহ ধারণ পূর্বক বিচিত্র বনমালা দ্বারা শোভিত হইয়া গোবিন্দ সেই ব্রজ শোভিত করিতে লাগিলেন। সেই বাক্যালাপী কৃষ্ণের বিচিত্র চরিত্র দেখিয়া ঘোষমধ্যে গোপকন্যাগণ তখন তাঁহাকে দামোদর বলিত; পয়োধরস্থিতিহেতু উৰ্দ্ধমুখ হৃদয়ের দ্বারা নিপীড়িত করিয়া সেই বরাজনাগণ ভ্রামিতচক্ষু বদনের দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পিতা, ভ্রাতা ও মাতা কর্তৃক নিবারিত হইয়াও রাত্রে কৃষ্ণের নিকট গমন করিল। তাহারা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সাজিয়া, মনোহর ক্রীড়া করিল; এবং যুগ্মে যুগ্মে কৃষ্ণচরিত গান করিল। বরাজনা তরুণীগণ কৃষ্ণলীলাসুকারিণী, কৃষ্ণে প্রণিহিতলোচনা, এবং কৃষ্ণের গমনানুগামিনী হইল। কোন কোন ব্রজবালা হস্তাগ্রে তালকুণ্ডিনপূর্বক কৃষ্ণচরিত আচরিত করিতে লাগিল। ব্রজযোষিদগণ, কৃষ্ণের নৃত্য, গীত, বিলাসশ্রিতবীক্ষণ অনুকরণপূর্বক, সানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কৃষ্ণপরায়ণা বরাজনাগণ ভাবনিস্তান্দমধুর গান করত ব্রজে গিয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। সম্প্রমত্ত হস্তকে করেগুণ যেরূপ ক্রীড়া করায়, শুক গোময় দ্বারা দিম্বাঙ্গ সেই গোপীগণ সেইরূপ কৃষ্ণের অনুবর্তন করিল। সহাস্তবদনা কৃষ্ণমৃগলোচনা অম্মা বনিতাগণ ভাবোৎফুল্ল লোচনের দ্বারা কৃষ্ণকে অতৃপ্ত হইয়া পান করিতে লাগিল। ক্রীড়াললসাহৃষিতা গোপকন্যাগণ রাত্রিতে অনন্তক্রীড়াসক্ত হইয়া অঙ্গসঙ্কাশ কৃষ্ণমুখমণ্ডল পান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ হা হা ইতি শব্দ করিয়া গান করিলে কৃষ্ণমুখনিঃসৃত সেই বাক্য, বরাজনাগণ আত্মাদিত হইয়া

প্রথম বক্তৃতা : রসবিজ্ঞান : রসগোপী

এরূপ করিল। সেই গোপনযোগিনীদের ক্রীড়াপ্রতিপ্রবৃত্ত আত্মলীকৃত সীমন্তপ্রাথিত কেশধাম কুচাঞ্জে বিস্তৃত হইতে লাগিল। চক্ৰবালালঙ্কৃত ক্রীকক এইরূপ সচরাচর শাসনী নিশাতে স্তম্বে গোপীদিগের সহিত আনন্দ করিতে লাগিলেন।”

বিষ্ণুপুরাণ হইতে রাসলীলাতত্ত্ব অনুবাদ কালে ‘রম্’ বাত্ব হইতে নিম্পন্ন শব্দ সকলের বেরূপ ক্রীড়ার্থে অনুবাদ করিয়াছি, এই অনুবাদেও সেই সকল কারণে ঐ সকল শব্দের ক্রীড়ার্থে প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, অল্প কোন রূপ প্রতিশব্দ ব্যবহার হইতেই পারে না। যথা—

“তাত্ত পংক্রীকতাঃ সৰ্বা রময়ন্তি মনোরমম্।”

এখানে ক্রীড়ার্থে ভিন্ন রত্যাথে ‘রময়ন্তি’ শব্দ কোন রকমেই বুঝা যায় না। ইহারা অল্পরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্বপ্রচলিত কুসংস্কার বশতঃই করিয়াছেন।

এই হল্লীষক্রীড়াবর্ণনা বিষ্ণুপুরাণকৃত রাসবর্ণনার অঙ্গগামী। এমন কি এক একটি শ্লোক উভয় গ্রন্থে প্রায় একই। যথা, বিষ্ণুপুরাণে আছে—

“তা বার্থমাগাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিত্তথা।

কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাজৌ যুগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ ॥”

হরিবংশে আছে—

“তা বার্থমাগাঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিঃ ভ্রাতৃভিত্তথা।

কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাজৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥”

তবে বিষ্ণুপুরাণের অপেক্ষা হরিবংশের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। অস্ত্রান্ত্র বিষয়ে সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। সচরাচর দেখা যায়, বিষ্ণুপুরাণে যাহা সংক্ষিপ্ত, হরিবংশে তাহা বিস্তৃত এবং নানা প্রকার নূতন উপস্থাপন ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। হরিবংশে রাসলীলায় এইরূপ সংক্ষেপবর্ণনার একটু কারণও আছে। উভয় গ্রন্থে সবিস্তারে তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, কবিশ্বে, গান্ধীর্ঘ্যে, পাণ্ডিত্যে এবং ঔদার্য্যে হরিবংশকার বিষ্ণুপুরাণকারের অপেক্ষা অনেক লঘু। তিনি বিষ্ণুপুরাণের রাসবর্ণনার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এবং গোপীগণকৃত ভক্তিব্যোগ দ্বারা কৃষ্ণে একান্ততাপ্রাপ্তি বৃদ্ধিতে পারেন নাই। তাহা না বৃদ্ধিতে পারিয়াই যেখানে বিষ্ণুপুরাণকার লিখিয়াছেন,—

“কাচিং প্রবিলসদ্বাহঃ পরিরভ্য চুচুৎ তম্।”

সেখানে হরিবংশকার লিখিয়া বসিয়াছেন,

“তাত্তং পমোদবোভানৈকরোভিঃ সমলীড়য়ন্।”

ইত্যাদি।

প্রভেদটুকু এই যে, বিষ্ণুপুরাণের চপলা বালিকা আনন্দে চকলা, আর হরিবংশের এই গোপীপণ বিলাসিনীর ভাব প্রকাশ করিতেছে। হরিবংশকারের অনেক স্থলে বিলাস-প্রিয়তার মাত্রাধিক্য দেখা যায়।

আর আর কথা বিষ্ণুপুরাণের রাসলীলা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, হরিবংশের এই হল্লীকটীড়া সম্বন্ধেও বর্তে।

উপরিলিখিত শ্লোকগুলি ভিন্ন হরিবংশে ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে আর কিছুই নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্রজগোপী—ভাগবত

বসন্তরস

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কেবল রাসরূপে পর্যাপ্ত হয় নাই। ভাগবতকার গোপীদের সহিত কৃষ্ণলীলার বিশেষ বিস্তার করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তাহা আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ। কিন্তু সেই সকল বর্ণনার বাহ্যদৃশ্য এখনকার রুচিবিগর্হিত হইলেও, অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে। হরিবংশকারের জ্ঞান ভাগবতকার বিলাসপ্রিয়তা-দোষে দূষিত নহেন। তাহার অভিপ্রায় অতিশয় নিগূঢ় এবং অতিশয় বিপুল।

দশম স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে প্রথমতঃ গোপীদের পূর্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বেগুরব গ্রহণ করিয়া মোহিতা হইয়া পরম্পরের নিকট কৃষ্ণানুরাগ ব্যক্ত করিতেছে। সেই পূর্বরূপবর্ণনায় কবি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তার পর, তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য একটি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সেই উপন্যাস “বসন্তরস” বলিয়া প্রসিদ্ধ। বসন্তরসের কোন কথা মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে বা হরিবংশে নাই, সুতরাং উহা ভাগবতকারের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। বৃন্দাশ্রমটা আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ হইলেও আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কেন না ভাগবত-ব্যখ্যাত রাসলীলাকথনে আমরা প্রবৃত্ত, এবং সেই রাসলীলার সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ।

কৃষ্ণানুরাগবিবশা ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে পতিভাবে পাইবার জন্য কাত্যায়নীভ্রত করিল। ভ্রতের নিয়ম এক মাস। এই এক মাস তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া প্রত্যা

যমুনাশিলে অবগাহন করিত। জীলোকদিগের জলাবগাহন বিষয়ে একটা কুৎসিত প্রথা এ কালেও ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রচলিত আছে। জীলোকেরা অবগাহনকালে নদীতীরে বজ্রগুলি ত্যাগ করিয়া, বিবজ্রা হইয়া জলমগ্না হয়। সেই প্রথানুসারে এই ব্রজাঙ্গনাগণ কূলে বসন রক্ষা করিয়া বিবজ্রা হইয়া অবগাহন করিত। মাসান্তে যে দিন ব্রত সম্পূর্ণ হইবে, সে দিনও তাহারা ঐরূপ করিল। তাহাদের কর্মফল (উভয়ার্থে) দিবার জন্ত সেই দিন ত্রীকৃষ্ণ সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পরিত্যক্ত বজ্রগুলি সংগ্রহ করিয়া তীরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন।

গোপীগণ বড় বিপদা হইল। তাহারা বিনাবজ্রে উঠিতে পারে না; এদিকে প্রান্তঃসরীরূপে জলমধ্যে গীতে শ্রোণ যায়। তাহারা কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিমগ্না হইয়া, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, কৃষ্ণের নিকট বজ্রভিক্ষা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ সহজে বজ্র দেন না—গোপীদিগের “কর্মফল” দিবার ইচ্ছা আছে। তার পর যাহা ঘটিল, তাহা আমরা জীলোক বালক প্রভৃতির বোধগম্য বাঙ্গালা ভাষায় কোন মতেই প্রকাশ করিতে পারি না। অতএব মূল সংস্কৃতই বিনামূল্যে উদ্ধৃত করিলাম।

ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে বলিতে লাগিল ;—

মাহনয়ঃ ভোঃ কৃথাস্বাক্ষ নন্দগোপহৃতং প্রিয়ম্ ।

জানীমোহন ব্রজস্নাত্যং দেহি বাসাংসি বেশিতাঃ ।

শ্রামহৃদ্বর তে দাস্তঃ করবাম তবোদিতম্ ।

দেহি বাসাংসি ধর্মজ্ঞ নোচেত্সাজ্ঞে ক্রবাম হে ।

শ্রীভগবান্নবাচ ।

ভবত্যো যদি মে দাস্তো ময়োক্তক করিষ্যথ ।

অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ ।

নোচেদ্রাহং প্রদাস্তে কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি ।

ততো জলাশয়াং সর্বা দারিকাঃ শীতবেশিতাঃ ।

পাণিভাং * * আচ্ছাদ্য প্রোত্তরঃ শীতকবিতাঃ ।

ভগবানাহ তা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতাঃ ।

কৃষ্ণে নিধায় বাসাংসি শ্রীতঃ প্রোবাচ সন্মিতম্ ॥

মুখং বিবজ্রা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তত্ হ দেবহেলনম্ ।

বজ্রাঙ্গলিং মূর্দ্ধাপশ্চতয়েহংহসঃ কৃষ্ণা নমো * বসনং প্রগৃহতাম্ ॥

ইত্যচ্যাতেনাভিহিতং ব্রজাবলা মম্বা বিবজ্রাপ্রবনং ব্রতচ্যুতিম্ ।

তৎপুস্তিকামানন্দশেষকর্মণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমুংবতমুগ্ধং যতঃ ।

তাস্তথাবনতা দৃষ্টা ভগবান্ দেবকীহৃতঃ ।

বাসাসি ভাভাঃ প্রাযচ্ছৎ কল্পণন্তেন ভোবিতঃ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০ম স্কন্ধঃ, ২২ অধ্যায়ঃ ।

অস্তুনিহিত ভক্তিতত্ত্বটা এই। ঈশ্বরকে ভক্তি দ্বারা পাইবার প্রধান সাধনা, ঈশ্বরে সর্বস্বর্পণ।

ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

“যং করোষি যদগ্ৰাসি যচ্ছূহোষি যদাসি যৎ ।

যতপশ্চসি কৌন্তেয় তৎ কৃষ্ণ মদর্পণম্ ॥”

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্বর্পণ করিল। শ্রীলোক, যখন সকল পরিত্যাগ করিতে পারে, তখনও লজ্জা ত্যাগ করিতে পারে না। ধন ধর্ম কর্ম ভাগ্য—সব যায়, তথাপি শ্রীলোকের লজ্জা যায় না। লজ্জা শ্রীলোকের শেষ রত্ন। যে শ্রীলোক, অপরের জন্ত লজ্জা পরিত্যাগ করিল, সে তাহাকে সব দিল। এই শ্রীগণ শ্রীকৃষ্ণে লজ্জাও অপিত করিল। এ কামাতুরার লজ্জার্পণ নহে—লজ্জাবিবশার লজ্জার্পণ। অতএব তাহারা ঈশ্বরে সর্বস্বর্পণ করিল। কৃষ্ণও তাহা ভক্ত্যুপহার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, “আমাতে যাহাদের বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে, তাহাদের কামনা কামার্ধে কল্পিত হয় না। যব ভজিত এবং কাথিত হইলে, বীজকে সমর্থ হয় না।” অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণকামিনী তাহাদিগের কামাবশেষ হয়। আরও বলিলেন, “তোমরা যে জন্ত ব্রত করিয়াছ, আমি তাহা রাত্রে সিদ্ধ করিব।”

এখন গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিস্বরূপ পাইবার জন্তই ব্রত করিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণ, তাহাদের কামনাপূরণ করিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন। কাজেই বড় নৈতিক গোলযোগ উপস্থিত। এই গোপাসনাগণ পরপত্নী, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করায়, পরদারভিমর্ষণ স্বীকার করা হইল। কৃষ্ণে এ পাপারোপণ কেন?

ইহার উত্তর আমার পক্ষে অতি সহজ। আমি ভূরি ভূরি প্রমাণের দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, এ সকল পুরাণকারকল্পিত উপন্যাসমাত্র, ইহার কিছু মাত্র সত্যতা নাই। কিন্তু পুরাণকারের পক্ষে উত্তর তত সহজ নহে। তিনিও পরিকল্পিতের প্রশ্নাত্মসারে শুকমুখে একটা উত্তর দিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার কথা বলিব। কিন্তু আমাকেও এখানে বলিতে হইবে যে, হিন্দুধর্মের ভক্তিবাদাত্মসারে, কৃষ্ণকে এই গোপীগণপতিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ভগবদগীতায় কৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন,—

“যে বধা যাহা প্রণয়কে তাৎপৰ্য্যে উল্লিখিত।”

“যে যেভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি।” অর্থাৎ যে আমার নিকট বিষয়ভোগ কামনা করে, তাহাকে আমি তাহাই দিই। যে মোক্ষ কামনা করে, তাহাকে মোক্ষ দিই। বিষ্ণুপুরাণে আছে, দেবমাতা দিতি কৃষ্ণ(বিষ্ণু)কে বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে পুত্রভাবে কামনা করিয়াছিলাম, এজন্য তোমাকে পুত্রভাবেই পাইয়াছি। এই ভাগবতেই আছে যে, বসুদেব দেবকী জগদীশ্বরকে পুত্রভাবে কামনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে পুত্রভাবে পাইয়াছেন। অতএব গোপীগণ তাঁহাকে পতিভাবে পাইবার জন্য যথোপযুক্ত সাধনা করিয়াছিল বলিয়া, কৃষ্ণকে তাহারা পতিভাবে পাইল।

যদি তাই হইল, তবে তাহাদের অধর্ম কি? ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে অধর্ম আবার কি? পাপের দ্বারা, পুণ্যময়, পুণ্যের আদিভূত স্বরূপ জগদীশ্বরকে কি পাওয়া যায়? পাপ-পুণ্য কি? যাহার দ্বারা জগদীশ্বরের সমিধি উপস্থিত হইতে পারি, তাহাই পুণ্য—তাহাই ধর্ম; তাহার বিপরীত যাহা, তাহাই পাপ—তাহাই অধর্ম।

পুরাণকার এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য পাপসংস্পর্শের পথমাত্র রাখেন নাই। তিনি ২৯ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, যাহারা পতিভাবে কৃষ্ণকে কামনা না করিয়া উপপতিভাবে তাঁহাকে কামনা করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে সশরীরে পাইল না; তাহাদের পতিগণ তাহাদিগকে আসিতে দিল না; কৃষ্ণচিন্তা করিয়া তাহারা প্রাণত্যাগ করিল।

“তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সজতাঃ।

জহন্তুর্গময়ং দেহং সন্তঃ প্রকীণবন্ধনাঃ॥”

১০।২২।১০

কৃষ্ণপতি ভিন্ন অন্য পতি যাহাদের স্মরণ মাত্রে ছিল, কাজেই তাহারা কৃষ্ণকে উপপতি ভাবিল। কিন্তু অন্য পতি স্মৃতিমাত্রে থাকায়, তাহারা কৃষ্ণ সহস্রক্কে অনন্তচিন্তা হইতে পারিল না। তাহারা সিদ্ধ, বা ঈশ্বরপ্রাপ্তির অধিকারিণী হইল না। যতক্ষণ জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ পাপবুদ্ধি থাকিবে, কেন না জারানুগমন পাপ। যতক্ষণ জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ কৃষ্ণে ঈশ্বরজ্ঞান হইতে পারে না—কেন না, ঈশ্বরে জারজ্ঞান হয় না—ততক্ষণ কৃষ্ণকামনা, কামকামনা মাত্র। ঈদৃশী গোপী কৃষ্ণপরায়ণা হইলেও সশরীরে কৃষ্ণকে পাইতে অযোগ্যা।

অতএব এই পতিভাবে জগদীশ্বরকে পাইবার কামনায় গোপীদিগের পাপমাত্র রহিল না। গোপীদিগের রহিল না, কিন্তু কৃষ্ণের? এই কথার উত্তরে বিষ্ণুপুরাণকার যাহা বলিয়াছেন, ভাগবতকারও তাহাই বলিয়াছেন। ঈশ্বরের আবার পাপপুণ্য কি? তিনি আমাদের মত শরীরী নহেন, শরীরী ভিন্ন ইন্দ্রিয়পরতা বা তজ্জনিত দোষ ঘটে না। তিনি সর্বভূতে আছেন, গোপীগণেও আছেন, গোপীগণের স্বামীতেও আছেন। তাঁহার কর্তৃক পরদারাভিমর্ষণ সম্ভবে না।

এ কথায় আমাদের একটা আপত্তি আছে। ঈশ্বর এখানে শরীরী, এবং ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট। যখন ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে মানবশরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন মানবধর্মাবলম্বী হইয়া কার্য্য করিবার জন্যই শরীর গ্রহণ করিয়াছেন। মানবধর্মীর পক্ষে গোপবধুগণ পরজ্ঞী, এবং তদভিগমন পরদারপাপ। কৃষ্ণই গীতায় বলিয়াছেন, লোকশিক্ষার্থ তিনি কর্ম্ম করিয়া থাকেন। লোকশিক্ষক পারদারিক হইলে, পাপাচারী ও পাপের শিক্ষক হইলেন। অতএব পুরাণকারকৃত দোষকালন খাটে না। এইরূপ দোষকালনের কোন প্রয়োজনও নাই। ভাগবতকার নিজেই কৃষ্ণকে এই রাসমণ্ডলমধ্যে জিতেশ্রিয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। যথা—

এবং শশাঙ্কঃপুত্রবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোহুহরতাবলাগণঃ ।

সিযেব আশ্রয়বরুদ্ধসৌরভঃ সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০ স্ক, ৩৩ অং, ২৬ ।

তবে, বিষ্ণুপুরাণকারের অপেক্ষাও ভাগবতকার প্রগাঢ়তায় এবং ভক্তিতত্ত্বের পারদর্শিতায় অনেক শ্রেষ্ঠ। জীজ্ঞাতি, জগতের মধ্যে পতিকেই প্রিয়বস্তু বলিয়া জানে; যে জ্ঞী, জগদীশ্বরে পরমভক্তিমতী, সে সেই পতিভাবেই তাঁহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিল—ইংরেজি পড়িয়া আমরা যাই বলি—কথাটা অতি রমণীয়।—ইহাতে কত মহত্ব-হৃদয়ভিজ্ঞতার এবং ভগবদ্ভক্তির সৌন্দর্য্যপ্রাণিতার পরিচয় দেয়। তার পর যে পতিভাবে তাঁহাকে দেখিল, সেই পাইল,—যাহার জারবুদ্ধি রহিল, সে পাইল না, এ কথাও ভক্তির ঐকান্তিকতা বুঝাইবার কি সুন্দর উদাহরণ। কিন্তু আর একটা কথায় পুরাণকার বড় গোলযোগের সূত্রপাত করিয়াছেন। পতিছে একটা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ আছে। কাজে কাজেই সেই ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ভাগবতোক্ত রাসবর্ণনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। ভাগবতোক্ত রাস, বিষ্ণুপুরাণের ও হরিবংশের রাসের ছায় কেবল নৃত্যগীত নয়। যে কৈলাসশিখরে তপস্বী কপর্দীক রোযানলে ভস্মীভূত, সে বৃন্দাবনে কিশোর রাসবিহারীর পদাশ্রয়ে পুনর্জীবনার্থ

ধ্মিত। অনল এখানে প্রবেশ করিয়াছেন। পুরাণকারের অভিপ্রায় কৰ্ণ্য নয়; ঈশ্বর-প্রাপ্তিজনিত মুক্ত জীবের যে আনন্দ, যে যথা মাং প্রপন্ডন্তে তাত্ত্বৈব ভজাম্যহম্ ইতি বাক্য শ্রবণ রাখিয়া, তাহাই পরিস্ফুট করিতে গিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহা বুঝিল না। তাঁহার রোপিত ভগবন্তক্তিপঙ্কজের মূল, অতল জলে ডুবিয়া রহিল—উপরে কেবল বিকশিত কামকুসুমদাম ভাসিতে লাগিল। যাহারা উপরে ভাসে—তলায় না, তাহারা কেবল সেই কুসুমদামের মালা গাঁথিয়া, ইন্দ্রিয়পরতাময় বৈষ্ণবধর্ম প্রাপ্ত করিল। যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্মোৎসব। এত কাল, আমাদের জন্মভূমি সেই মদনধর্মোৎসবভারাক্রান্ত। তাই কৃষ্ণচরিত্রের অভিনব ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে। কৃষ্ণচরিত্র, বিমুক্তিতায়, সর্বগুণময়কে জগতে অতুল্য। আমার স্থায় অক্ষম, অধম ব্যক্তি সেই পবিত্র চরিত্র গীত করিলেও লোকে তাহা শুনিবে, তাই এই অভিনব কৃষ্ণগীতি রচনায় সাহস করিয়াছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্রজগোপী—ভাগবত

ব্রাহ্মণকথা

বজ্রহরণের নিগূঢ় তাৎপর্য আমি যে রূপ বুঝাইয়াছি, তৎসম্বন্ধে একটা কথা বাকি আছে।

“যৎ কৰোষি যদশ্বাসি বহুহোষি দদাসি হং।

যত্তপশ্চি কৌন্তেয় তৎ কৃষ্ণ মদর্পণম্ ॥”

ইতি বাক্যের অমুবর্তী হইয়া যে জগদীশ্বরে সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারে, সেই ঈশ্বরকে পাইবার অধিকারী হয়। বজ্রহরণকালে ব্রজগোপীগণ ক্রীকৃষ্ণে সর্বস্বাৰ্পণ ক্ষমতা দেখাইল, এতদ্ব্যতীত তাহারা কৃষ্ণকে পাইবার অধিকারিণী হইল। আর একটি উপস্থাস রচনা করিয়া ভাগবতকার এই তত্ত্ব আরও পরিষ্কৃত করিয়াছেন। সে উপস্থাস এই,—

একদা গোচারণকালে বনমধ্যস্থ গোপালগণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট আহ্বাৰ্য্য প্রার্থনা করিল। অদূরবর্তী কোন স্থানে কতকগুলি ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিতেছিলেন। কৃষ্ণ গোপালগণকে উপদেশ করিলেন যে, সেইখানে গিয়া আমার নাম করিয়া অন্নভিক্ষা

চাও। গোপালেরা বজ্রহুলে গিয়া কৃষ্ণের নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাহিল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে কিছু না দিয়া তাড়াইয়া দিল। গোপালগণ কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সেই সকল কথা জানাইল। কৃষ্ণ তখন বলিলেন যে, তোমরা পুনর্ব্বার বজ্রহুলে গিয়া অন্তঃপুরবাসিনী ব্রাহ্মণকন্যাদিগের নিকট আমার নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাও। গোপালেরা তাহাই করিল। ব্রাহ্মণকন্যাগণ কৃষ্ণের নাম শুনিয়া গোপালদিগকে প্রভূত অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিল, এবং কৃষ্ণ অনুরে আছেন শুনিয়া তাঁহার দর্শনে আসিল। তাহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণকে দর্শন করিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে গৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন। ব্রাহ্মণকন্যাগণ বলিলেন, “আমরা আপনার ভক্ত, আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি—তাঁহারা আর আমাদেরকে গ্রহণ করিবেন না। আমরা আপনার পাদাশ্রয়ে পতিত হইতেছি, আমাদের অশ্রু গতি আপনি বিধান করুন।” কৃষ্ণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন, “দেখ অন্নসত্ত্বই কেবল অমুরাগের কারণ নহে। তোমরা আমাতে চিন্তা নিবর্ত্ত কর, আমাকে অচিরে প্রাপ্ত হইবে। আমার শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান, অমুকীর্ণনে আমাকে পাইবে—সম্মুখি সেরূপ পাইবে না। অতএব তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।” তাহারা ফিরিয়া গেল।

এখন এই ব্রাহ্মণকন্যাগণ কৃষ্ণকে পাইবার যোগ্য কি করিয়াছিলেন? কেবলমাত্র পিত্রাদি স্বজন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। কুলটাগণ সামান্য জারান্নগমনার্থেও তাহা করিয়া থাকে। ভগবানে সর্ব্বস্বার্থ ত্যাগ তাহাদিগের হয় নাই, সিদ্ধ হইবার তাঁহারা অধিকারিণী হন নাই। অতএব সিদ্ধ হইবার প্রথম সোপান শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির জন্ত তাহাদিগকে উপদেষ্ট করিয়া কৃষ্ণ তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। পবিত্রব্রাহ্মণকুলোদ্ভূতা সাধনাভাবে যাহাতে অধিকারিণী হইল না, সাধনাপ্রভাবে গোপকন্যাগণ তাহাতে অধিকারিণী হইল। পূর্ব্বরাগবর্ণনস্থলে, ভাগবতকার গোপকন্যাদিগের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সবিস্তারে বুঝাইয়াছেন।

একণে আমরা ভাগবতে বিখ্যাত রাসপঞ্চাধ্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু এই রাসলীলাতঃ বজ্রহরণোপলক্ষে আমি এত সবিস্তারে বুঝাইয়াছি যে, এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের কথা অতি সংক্ষেপে বলিলেই চলিবে।

নবম পরিচ্ছেদ

ব্রজগোপী—ভাগবত

হাসলীলা

ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২১।৩০।৩১।৩২।৩৩ এই পাঁচ অধ্যায় রামপঞ্চাধ্যায়। প্রথম অর্থাৎ উনত্রিংশ অধ্যায়ে শারদ পূর্ণিমা রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বেণুবাদন করিলেন। পাঠকের স্মরণ হইবে যে, বিষ্ণুপুরাণে আছে তিনি কলপদ অর্থাৎ অক্ষুটপদ গীত করিলেন। ভাগবতকার সেই ‘কল’ শব্দ রাখিয়াছেন, যথা “জগৌ কলম্”। টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই “কল” শব্দ হইতে কৃষ্ণমস্তকের বীজ ‘ক্লীং’ শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তিনি উহাকে কামগীত বলিয়াছেন। টীকাকারদিগের মহিমা অনন্ত। পুরাণকার স্বয়ং ঐ গীতকে ‘অনঙ্গবর্জনম্’ বলিয়াছেন।

বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণদর্শনে ধাবিতা হইল। পুরাণকার তাহাদিগের স্বরা এবং বিভ্রম যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কালিদাসকৃত পুরঞ্জীগণের স্বরা এবং বিভ্রমবর্ণনা মনে পড়ে। কে কাহার অনুকরণ করিয়াছে তাহা বলা যায় না।

গোপীগণ সমাগতা হইলে, কৃষ্ণ যেন কিছুই জ্ঞানেন না, এই ভাবে তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমাদিগের মঙ্গল ত? তোমাদিগের প্রিয় কার্য্য কি করিব? ব্রজের কুশল ত? তোমরা কেন আসিয়াছ?” এই বলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন যে, “এই রজনী ঘোররূপা, ভীষণ পশু সকল এখানে আছে, এ স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার যোগ্য স্থান নয়। অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও। তোমাদের মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা পতি তোমাদিগকে না দেখিয়া তোমাদিগের অন্বেষণ করিতেছে। বহুগণের ভয়োৎপত্তির কারণ হইও না। রাকাস্ত্রবিরঞ্জিত যমুনাসমীরণলীলাকম্পিত তরুণলবশোভিত কুসুমিত বন দেখিলে ত? এখন হে সতীগণ, অচিরে প্রতিগমন করিয়া পতিসেবা কর। বালক ও বৎস সকল কাঁদিতেছে, তাহাদিগকে হৃদ্যপান করাও। অথবা আমার প্রতি স্নেহ করিয়া, স্নেহের বশীভূতবুদ্ধি হইয়া আসিয়া থাকিবে। সকল প্রাণীই আমার প্রতি এইরূপ শ্রীতি করিয়া থাকে। কিন্তু হে কল্যাণীগণ! পতির অকপট শুদ্ধা এবং বহুগণের ও সন্তানগণের অনুপোষণ ইহাই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ধর্ম্ম। পতি দুঃখীলই হউক, দুর্ভাগই হউক, জড় হউক, রোগী বা অধনী হউক, যে স্ত্রীগণ অপাতকী হইয়া উভয় লোকের মঙ্গল কামনা করে, তাহাদিগের দ্বারা সে পতি পরিত্যাজ্য নয়। কুলস্ত্রীদিগের ঔপপত্য অস্বর্গ্যা,

অযশস্কর, অতি তুচ্ছ, ভয়াবহ এবং সর্বত্র নিন্দিত। অবশ্যে, দর্শনে, ধ্যানে, অমুক্তকর্তনে মন্তাবোধ্য হইতে পারে, কিন্তু সন্নিকর্ষে নহে। অতএব তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও।”

কৃষ্ণের মুখে এই উক্তি সন্নিবিষ্ট করিয়া পুরাণকার দেখাইতেছেন যে, পাতিব্রত্যাধর্মের মাহাত্ম্যের অনভিজ্ঞতা অথবা তৎপ্রতি অবজ্ঞাবশতঃ তিনি কৃষ্ণগোপীর ইন্দ্রিয় সৎস্বকীয় বর্ণনে প্রবৃত্ত নহেন। তাঁহার অভিপ্রায় পূর্বে বুঝাইয়াছি। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণকন্যাদিগকেও একরূপ কথা বলিয়াছিলেন। শুনিয়া তাহারা ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু গোপীগণ ফিরিল না। তাহারা কাঁদিতে লাগিল। তাহারা বলিল, “এমন কথা বলিও না, তোমার পাদমূলে সর্ববিষয় পরিত্যাগ করিয়াছি। আদিপুরুষদেব যেমন মুমুকুকে পরিত্যাগ করেন না, তেমনি আমরা ছরবগ্রহ হইলেও, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। তুমি ধর্মজ্ঞ, পতি অপত্য সূহৃৎ প্রভৃতির অমুখর্ত্তী স্ত্রীলোকদিগের স্বধর্ম বলিয়া যে উপদেশ দিতেছ, তাহা তোমাতেই বর্ত্তিত হউক। কেন না, তুমি ঈশ্বর। তুমি দেহধারীদিগের প্রিয় বন্ধু এবং আত্মা। হে আত্মন। বাহারা কুশলী, তাহারা নিত্যপ্রিয় যে তুমি সেই তোমাতেই রতি (আত্মরতি) করিয়া থাকে। হৃৎসদায়ক পতিসুতাদির দ্বারা কি হইবে?” ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে পুরাণকার বুঝাইয়াছেন যে, গোপীগণ কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করিয়াছিল, এবং ঈশ্বরার্থেই স্বামিত্যাগ করিয়াছিল। তার পর আরও কতকগুলি কথা আছে, যাহা দ্বারা কবি বুঝাইতেছেন যে, কৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই, গোপীগণ কৃষ্ণামুসারিণী। তাহার পরে পুরাণকার বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম অর্থাৎ আপনাতে ভিন্ন তাঁহার রতি বিরতি আর কিছুতেই নাই, তথাপি এই গোপীগণের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন; এবং তাহাদিগের সহিত গান করতঃ যমুনাগুলিনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভাগবতোক্ত রাসলীলায় ইন্দ্রিয়সংযুক্ত কিছু নাই। যদি এ কথা প্রকৃত হইত, তাহা হইলে আমি এ রাসলীলার অর্থ যেরূপ করিয়াছি, তাহা কোন রকমেই খাটিত না। কিন্তু এই কথা যে প্রকৃত নহে, ইহার প্রমাণার্থ এই স্থান হইতে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি :—

“বাহুপ্রসারপরিসংকট-করালকোরুনীবীজনাশননন্দনখাগ্রপাটৈঃ।

ক্লেব্রাবলোকহসিতৈত্র্যজম্বদরীণামুস্তম্বয়ন বতিপতিং বময়াককার ॥” ৪১ ॥

অস্ত্রাস্ত্র স্থান হইতেও আরও দুই চারিটি এরূপ প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। এ সকলের বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া অবিধেয় হইবে।

তার পর কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া ব্রজগোপীগণ অত্যন্ত মানিনী হইলেন। তাঁহাদিগের সৌভাগ্যমদ দেখিয়া ভদ্ৰপশমনার্থে ঐকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। এই গেল উনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণকৃত কৃষ্ণাধ্বষণবৃত্তান্ত আছে। তাহা স্থূলতঃ বিষ্ণুপুরাণের অনুসরণ। তবে ভাগবতকার কাব্য আরও ঘোরাল করিয়াছেন। অতএব এই অধ্যায় সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। একত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণ কৃষ্ণ-বিষয়ক গান করিতে করিতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন। ইহাতে ভক্তিরস এবং আদিরস দুইই আছে। বুঝাইবার কথা বেশি কিছু নাই। ষাট্রিংশ অধ্যায়ে ঐকৃষ্ণ পুনরাবিহৃত হইলেন। এইখানে গোপীদিগের ইন্দ্রিয়প্রণোদিত ব্যবহারের প্রমাণার্থ একটি কবিতা উদ্ধৃত করিব।

“কাচিস্কলিনাগুণাং তবী তামূলচর্চিতম্।

একা তদজিৎ কলং সন্তপ্তা তনয়োর্নিধাং।”

এই অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণ ও গোপীগণের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক কথোপকথন আছে। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি না। তাহার পর ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়ে রাসক্রীড়া ও বিহারবর্ণন। রাসক্রীড়া বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাসক্রীড়ার স্থায় নৃত্যগীত মাত্র। তবে গোপীগণ এখানে ঐকৃষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য কিকিমান্না ইন্দ্রিয়সম্বন্ধও আছে। যথা,—

কস্তাশ্চিরাট্যবিকিপ্তকুণ্ডলধ্বিমগ্নিতম্।

গণ্ডং গণ্ডে সংসংখ্যাত্যঃ প্রাভাস্তামূলচর্চিতম্ ॥ ১৩ ॥

নৃত্যন্তী গায়ন্তী কাচিং কৃষ্ণপূরমেখলা।

পার্শ্বহ্যচ্যুতহস্তাজং প্রাভাস্তাং তনয়োঃ শিবম্ ॥ ১৪ ॥

* * * *

তদনঙ্গপ্রমদাঙ্কুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দৃকুলং পঙ্গপটিকাং বা।

নাভঃ প্রত্বেষাচ্চুমলং ব্রজদ্রিয়ো বিশম্ভমাগভরণাঃ কুরুবৎ ॥ ১৮ ॥

এইরূপ কথা ভিন্ন বেশি আর কিছু নাই। স্বয়ং ঐকৃষ্ণকে পুরাণকার ভিত্তেঙ্গিয়-স্বরূপ বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা পূর্বের বলিয়াছি এবং তাহার প্রমাণও দিয়াছি।

কবিতা পরিচয়

রাধা

ভাগবতের এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে 'রাধা' নাম কোথাও পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবচাৰ্য্যদিগের অহিমজ্ঞার ভিতর রাধা নাম প্রবিষ্ট। তাহারা টীকাটিপ্তনীর ভিতর পুনঃপুনঃ রাধাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথাও রাধার নাম নাই। গোপীদিগের অমুরাগাধিক্যজনিত ঈর্ষ্যার প্রমাণ স্বরূপ কবি লিখিয়াছেন যে, তাহারা পদচিহ্ন দেখিয়া অমুমান করিয়াছিল যে, কোন এক জন গোপীকে লইয়া কৃষ্ণ বিজনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও গোপীদিগের ঈর্ষ্যাজনিত ভ্রমমাত্র। ত্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন এই কথাই আছে, কাহাকেও লইয়া অন্তর্হিত হইলেন এমন কথা নাই এবং রাধার নামগন্ধও নাই।

রাসপঞ্চাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখনকার কৃষ্ণ-উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণনাম নাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের মন্দির নাই বা মূর্তি নাই। বৈষ্ণবদিগের অনেক রচনার কৃষ্ণের অপেক্ষাও রাধা প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন। যদি মহাভারতে, হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে বা ভাগবতে 'রাধা' নাই, তবে এ 'রাধা' আসিলেন কোথা হইতে ?

রাধাকে প্রথম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখিতে পাই। উইল্‌সন্ সাহেব বলেন যে, ইহা পুরাণগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। ইহার রচনাপ্রণালী আজিকালিকার ভট্টাচার্য্যদিগের রচনার মত। ইহাতে ষষ্ঠী মনসারও কথা আছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছি। যাহা এখন আছে, তাহাতে এক নূতন দেবতত্ত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাই পূর্বাবধি প্রসিদ্ধ যে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। ইনি বলেন, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হওয়া দূরে থাকুক, কৃষ্ণই বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিষ্ণু থাকেন বৈকুণ্ঠে, কৃষ্ণ থাকেন গোলোকে রাস-মণ্ডলে,—বৈকুণ্ঠ তাহার অনেক নীচে। ইনি কেবল বিষ্ণুকে নহে, ব্রহ্মা, ঋত, লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবী এবং জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার বাসস্থান গোলোকধামে, বলিয়াছি। তথায় গো, গোপ ও গোপীগণ বাস করে। তাহারা দেবদেবীর উপর। সেই গোলোকধামের অধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণবিলাসিনী দেবীই রাধা। রাধার আগে রাসমণ্ডল,

না। শেষে স্বয়ম্ভূতপার্শ্বে মুক্ত হইবে। আধাকেও আধালিভ করিয়া বলিলেন, 'তুমি যাক; আমিও যাইতেছি।' শেষ পৃথিবীর ভারাবতরণ জন্ত, তিনি পৃথিবীতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন।

এ সকল কথা নূতন হইলেও, এবং সর্বশেষে প্রচারিত হইলেও এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্মের উপর অতিশয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। জয়দেবাদি বাঙ্গালী বৈষ্ণবকবিগণ, বাঙ্গালার জাতীয় সঙ্গীত, বাঙ্গালার যাত্রা মহোৎসবদিগের মূল ব্রহ্মবৈবর্তে। তবে ব্রহ্মবৈবর্তকারকথিত একটা বড় মূল কথা বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেন নাই, অস্বস্ত: সেটা বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্মে তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই—রাধিকা। রায়গোপালী বলিয়া পরিচিতা, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তের মতে তিনি বিধিবিধানানুসারে কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। সেই বিবাহবৃদ্ধান্তটা সন্নিহারে বলিতেছি, বলিবার আগে গীতগোবিন্দের প্রথম কবিতাটা পাঠকের স্মরণ করিয়া দিই।

“মৈথৈর্ষেদ্রমম্বরং বনভুব: শ্যামাত্মমালজ্যৈম-

নক্ন্তং ভীকরং স্বমেব তপিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।

ইথাং নন্দনিদেশতচ্চলিতযো: প্রত্যক্ষরুঞ্জমং

রাধামাধবয়োজ্যয়ন্তি যমুনাকূলে রহ:কেলয়:।”

অর্থ। হে রাধে! আকাশ মেঘে স্নিগ্ধ হইয়াছে, তমাল ফ্রম সকলে বনভূমি অন্ধকার হইয়াছে, অতএব তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়া যাও, নন্দ এইরূপ আদেশ করায়, পথিহু কুঞ্জফ্রমাভিমুখে চলিত রাধামাধবের যমুনাকূলে বিজনকেলি সকলের জয় হউক।

এ কথার অর্থ কি? টীকাকার কি অনুবাদকার কেহই বিশদ করিয়া বুঝাইতে পারেন না। এক জন অনুবাদকার বলিয়াছেন, “গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি কিছু অস্পষ্ট; কবি নায়ক-নায়িকার কোন্ অবস্থা মনে করিয়া লিখিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না। টীকাকারের মত ইহা রাধিকাসখীর উক্তি। তাহাতে ভাব এক প্রকার মধুর হয় বটে, কিন্তু শব্দার্থের কিছু অসঙ্গতি ঘটে।” বস্তুত: ইহা রাধিকাসখীর উক্তি নহে; জয়দেব গোস্বামী ব্রহ্মবৈবর্ত-লিখিত এই বিবাহের সূচনা স্মরণ করিয়াই এ শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ঠিক এই কথাই ব্রহ্মবৈবর্ত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; তবে বক্তব্য এই যে, রাধা শ্রীদামশাপানুসারে শ্রীকৃষ্ণের কয় বৎসর আগে পৃথিবীতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া, রাধিকা কৃষ্ণের অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। তিনি যখন যুবতী, শ্রীকৃষ্ণ তখন শিশু।

“একদা কৃষ্ণসহিত নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ ।
 তদ্রোপনভাতীয়ে চারয়ামাস গৌতুলম্ ॥ ১ ॥
 সরঃস্থবাহুতোয়ঞ্চ পারয়ামাস তং পশৌ ।
 উবাস বটমূলে চ বালং কৃষ্ণা অবক্ষসি ॥ ২ ॥
 এতদ্মিরন্তরে কৃষ্ণো মায়াবালকবিগ্রহঃ ।
 চকার মায়দ্বাক্ষ্যমেঘাচ্ছন্নং নভো মুনে ॥ ৩ ॥
 মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ট্বা শ্রামলং কাননাস্তরম্ ।
 ঝঙ্কাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দঞ্চ দারুণম্ ॥ ৪ ॥
 বৃষ্টিধারামতিস্থলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্ ।
 দৃষ্ট্বা বং পতিতস্কন্ধান্ নন্দো ভয়ম্বাপ হ ॥ ৫ ॥
 কথং যাত্তামি গোবৎসং বিহার্য আশ্রমং প্রতি ।
 গৃহং যদি ন যাত্তামি ভবিতা বালকস্ত কিম্ ॥ ৬ ॥
 এবং নন্দে প্রবদতি রুরোদ ত্রীহরিতয়া ।
 মায়ামিয়া ভয়েভ্যশ্চ পিতৃঃ কঠং ধারয় সঃ ॥ ৭ ॥
 এতদ্মিরন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্ ॥”

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্, শ্রীকৃষ্ণজয়খণ্ডে ১৫ অধ্যায়ঃ ।

অর্থ । “একদা কৃষ্ণসহিত নন্দ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তথাকার ভাণ্ডীরবনে গোগণকে চরাইতেছিলেন। সরোবরে স্বাহুজল তাহাদিগকে পান করাইলেন, এবং পান করিলেন। এবং বালককে বক্ষে লইয়া বটমূলে বসিলেন। হে মুনে! তার পর মায়াতে শিশুশরীরধারণকারী কৃষ্ণ অকস্মাৎ মায়ার দ্বারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং কাননাস্তর শ্রামল; ঝঙ্কাবাত, মেঘশব্দ, দারুণ বজ্রশব্দ, অতিস্থূল বৃষ্টিধারা, এবং বৃক্ষসকল কম্পমান হইয়া পতিতস্কন্ধ হইতেছে, দেখিয়া নন্দ ভয় পাইলেন। ‘গোবৎস ছাড়িয়া কিরূপেই বা আপনার আশ্রমে যাই, যদি গৃহে না যাই তবে এই বালকেরই বা কি হইবে,’ নন্দ এইরূপ বলিতেছেন, ত্রীহরি তখন কাঁদিতে লাগিলেন; মায়াজে ভীতিযুক্ত হইয়া বাপের কঠ ধারণ করিলেন। এই সময়ে রাধা কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।”

রাধার অপূর্ব লাভণ্য দেখিয়া নন্দ বিস্মিত হইলেন, তিনি রাধাকে বলিলেন, “আমি গর্গমুখে জানিয়াছি, তুমি পদ্মারও অধিক হরির প্রিয়া; আর ইনি পরম নিগুণ অচ্যুত মহাবিশু; তথাপি আমি মানব, বিষ্ণুমায়ায় মোহিত আছি। হে ভজ্ঞে! তোমার

প্রাণনাথকে গ্রহণ কর; যথায় সুখী হও, থাক। লক্ষ্য মনোরথ পূর্ণ করিয়া আমার পুত্র আমাকে দিও।”

এই বলিয়া নন্দ রাধাকে কৃষ্ণসমর্পণ করিলেন। রাধাও কৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইয়া গেলেন। দূরে গেলে রাধা রাসমণ্ডল স্মরণ করিলেন, তখন মনোহর বিহারভূমি সৃষ্ট হইল। কৃষ্ণ সেইখানে নীত হইলে কিশোরমুষ্টি ধারণ করিলেন। তিনি রাধাকে বলিলেন, “যদি গোলোকের কথা স্মরণ হয়, তবে যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিব।” তাঁহার ঐকল্য প্রেমালোকে নিবৃত্ত ছিলেন, এমন সময়ে ত্রাণা সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাধাকে অনেক স্তবস্ততি করিলেন। পরিশেষে নিজে কঙ্কাকর্ডা হইয়া, যথাবিহিত বেদবিধি অনুসারে রাধিকাকে কৃষ্ণে সম্ভ্রদান করিলেন। ঔহাদিগকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। রায়ানের সঙ্গে রাধিকার যথাসাধ্য বিবাহ হইয়াছিল কিনা, যদি হইয়া থাকে তবে পূর্বে কি পরে হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পাইলাম না। রাধাকৃষ্ণের বিবাহের পর বিহারবর্ণন। বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্মবৈবর্তের রাসলীলাও ঐরূপ।

যাহা হউক, পাঠক দেখিবেন যে, ব্রহ্মবৈবর্তকার সম্পূর্ণ নূতন বৈষ্ণবধর্ম সৃষ্ট করিয়াছেন। সে বৈষ্ণবধর্মের নামগন্ধমাত্র বিষ্ণু বা ভাগবত বা অম্ব পুরাণে নাই। রাধাই এই নূতন বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ। জয়দেব কবি, গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নূতন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বন করিয়াই, গোবিন্দগীতি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তানুসরণে বিজ্ঞাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই ধর্ম অবলম্বন করিয়াই ঐশ্বেতন্তদেব কান্তরসাপ্রিত অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। বলিতে গেলে, সকল কবি, সকল ঋষি, সকল পুণ্য, সকল শাস্ত্রের অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্তকারই বাঙ্গালীর জীবনের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, এই নূতন ধর্মের তাৎপর্য কি এবং কোথা হইতে ইহা উৎপন্ন হইল।

ভারতবর্ষে যে সকল দর্শনশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছয়টি দর্শনের প্রাধান্য সচরাচর স্বীকৃত হয়। কিন্তু ছয়টির মধ্যে দুইটিরই প্রাধান্য বেশী—বেদান্তের ও সাংখ্যের। সচরাচর ব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রে বেদান্তদর্শনের সৃষ্টি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। বস্তুতঃ বেদান্তদর্শনের আদি ব্রহ্মসূত্রে নহে, উপনিষদে। উপনিষদকেও বেদান্ত বলে। উপনিষদসূক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব, সংক্ষেপতঃ ঈশ্বর ভিন্ন কিছু নাই। এই জগৎ ও জীবগণ ঈশ্বরেরই অংশ। তিনি এক ছিলেন, সিস্কাপ্রযুক্ত রহ হইয়াছেন। তিনি পরমাত্মা। জীবাত্মা সেই পরমাত্মার

আশা; ঈশ্বরের মায়া হইতেই জীবাশ্রয়তা প্রাপ্ত; এবং সেই মায়া হইতে মুক্ত হইলেই আবার ঈশ্বরে বিলীন হইবে। ইহা অদ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ।

প্রাথমিক বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি এই বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের উপর নির্মিত। বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ, বৈদান্তিক ঈশ্বর। বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবতে এবং তাদৃশ অস্ত্রাজ্ঞ গ্রন্থে যে সকল বিষ্ণুভোক্তা বা কৃষ্ণভোক্তা আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অসম্পূর্ণরূপে অদ্বৈতবাদাত্মক। কিন্তু এ বিষয়ের প্রধান উদাহরণ শান্তিপর্ব্বের ভীষ্মকৃত কৃষ্ণভোক্তা।

কিন্তু অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদও অনেক রকম হইতে পারে। আধুনিক সময়ে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য এবং বল্লভাচার্য্য এই চারি জনে অদ্বৈতবাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং বিভক্তাদ্বৈতবাদ—এই চারি প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনকালে এত ছিল না। প্রাচীনকালে ঈশ্বর, এবং ঈশ্বরস্থিত জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে দুই রকম ব্যাখ্যা দেখা যায়। প্রথম এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঈশ্বরই জগৎ, তত্ত্বের জাগতিক কোন পদার্থ নাই। আর এক মত এই যে, জগৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বর জগৎ নহেন, কিন্তু ঈশ্বরে জগৎ আছে—“সূত্রে মণিগণা ইব।” ঈশ্বরও জাগতিক সর্ব্বপদার্থে আছেন, কিন্তু ঈশ্বর তদতিরিক্ত। প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম এই দ্বিতীয় মতেরই উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয় প্রধান দর্শনশাস্ত্র সাংখ্য। কপিলের সাংখ্য ঈশ্বরই স্বীকার করে না। কিন্তু পরবর্ত্তী সাংখ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যের স্থূলকথা এই, জড়জগৎ বা জড়জগন্ময়ী শক্তি পরমাশ্রয়ী হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। পরমাশ্রয়ী বা পুরুষ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গশূন্য; তিনি কিছুই করেন না, এবং জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নাই। জড়জগৎ এবং জড়জগন্ময়ী শক্তিকে ইহারা ‘প্রকৃতি’ নাম দিয়াছেন। এই প্রকৃতিই সর্ব্বসৃষ্টিকারিণী, সর্ব্বসংস্কারিণী, সর্ব্বসংকালিণী, এবং সর্ব্বসংহারিণী। এই প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব হইতে প্রকৃতি-প্রধান তাত্ত্বিকধর্মের উৎপত্তি। এই তাত্ত্বিকধর্ম, প্রকৃতিপুরুষের একত্ব অথবা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পাদিত হওয়াতে প্রকৃতিপ্রধান বলিয়া এই ধর্ম লোকরঞ্জন হইয়াছিল। যাহারা বৈষ্ণবদিগের অদ্বৈতবাদে অসন্তুষ্ট, তাহারা তাত্ত্বিকধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই তাত্ত্বিকধর্মের সারাংশ এই বৈষ্ণবধর্মের সংলগ্ন করিয়া বৈষ্ণবধর্মকে পুনরুজ্জ্বল করিবার জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার এই অভিনব বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়াছেন অথবা বৈষ্ণবধর্মের পুনঃসংস্কার করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টা রাধা সেই সাংখ্যদিগের মূলপ্রকৃতিস্থানীয়া। যদিও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে আছে যে, কৃষ্ণ মূলপ্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া, তাহার পর রাধাকে

সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণরথগুণে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ স্বয়ংই রাধাকে পুনঃপুনঃ
মূলপ্রকৃতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। যথা—

“বমার্দ্ধাংশধরপাং যং মূলপ্রকৃতিবীষরী।”

শ্রীকৃষ্ণরথগুণে, ১৫ অধ্যায়, ৬৭ শ্লোকঃ।

পরমাঙ্গার সঙ্গে প্রকৃতির বা কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার কি সম্বন্ধ, তাহা পুরাণকার এইরূপে
বুঝাইতেছেন। ইহা কৃষ্ণোক্তি।

“যথা স্বক তথাহক ভেদো হি নাবয়োদ্ধবম্ ॥ ৫৭ ॥

যথা কীরে চ ধাবল্যং যথারৌ দাহিকা সতি।

যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং অয়ি সত্ততম্ ॥ ৫৮ ॥

বিনা মৃদা ঘটং কর্তুং বিনা সর্পেন কুণ্ডলম্।

কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ ন হি শস্তঃ কদাচন ॥ ৫৯ ॥

তথা স্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্তুং মহং ক্রমঃ।

সৃষ্টেরাধারভূতা স্বং বীজরূপোহহমচ্যুতঃ ॥ ৬০ ॥

* * * *

কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাত্ত্বয়ৈব রহিতং যদা।

শ্রীকৃষ্ণ তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরম্ ॥ ৬১ ॥

স্বক শ্রীস্বক সম্পত্তিসমাধারস্বরূপিণী।

সর্বশক্তিস্বরূপাসি সর্বেষাঞ্চ ময়াপি চ ॥ ৬২ ॥

স্বং স্ত্রী পুমানহং বাধে নেতি বেদেষু নির্ণয়ঃ।

স্বক সর্বস্বরূপাসি সর্বরূপোহহমকরে ॥ ৬৩ ॥

যদা ভেদঃস্বরূপোহহং তেজোরূপাসি স্বং তদা।

ন শরীরী যদাহক তদা অমশরীক্ষিণী ॥ ৬৪ ॥

সর্ববীজস্বরূপোহহং যদা যোগেন হৃদয়ি।

স্বক শক্তিস্বরূপাসি সর্বস্বরূপধারিণী ॥ ৬৫ ॥”

শ্রীকৃষ্ণরথগুণে ১৫ অধ্যায়ঃ।

“তুমি যেখানে, আমিও সেখানে, আমাদিগের মধ্যে নিশ্চিত কোন ভেদ নাই।
ছক্কে যেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি তোমাতে
সর্বদাই আছি। কুন্ডকার বিনা মৃত্তিকায় ঘট করিতে পারে না, স্বর্ণকার স্বর্ণ বিনা কুণ্ডল
গড়িতে পারে না, তেমনই আমিও তোমা ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারি না। তুমি সৃষ্টির
আধারভূতা, আমি অচ্যুতবীজরূপী। আমি যখন তোমা ব্যতীত থাকি, তখন লোকে

আমাকে 'কৃষ্ণ' বলে, তোমার সহিত থাকিলে জীকৃষ্ণ বলে। তুমি জী, তুমি সম্পত্তি, তুমি আধারস্বরূপিণী, সকলের এবং আমার সর্বশক্তিস্বরূপ। হে দ্বাদশে। তুমি জী, আমি পুরুষ, বেদও ইহা নির্ণয় করিতে পারে না। হে অক্ষরে। তুমি সর্বস্বরূপা, আমি সর্বরূপ। আমি যখন তেজঃস্বরূপ, তুমি তখন তেজোরূপা। আমি যখন শরীরী নই, তখন তুমিও অশরীরী। হে সুন্দরি। আমি যখন যোগের দ্বারা সর্ববীজস্বরূপ হই, তখন তুমি শক্তিস্বরূপা সর্ববীজরূপধারিণী হও।”

পুনশ্চ,

যথাহং তথা ত্বং যথা ধাবল্যদৃষ্টয়োঃ ।

ভেদঃ কদাপি ন ভবেদ্বিচ্ছিতকং তথাবয়োঃ ॥ ৫৬ ॥

* * * *

স্বংকলাংশাংকলয়া বিবেষু সর্বযোষিতঃ ।

বা যোষিং সা চ ভবতী যঃ পুমান্ সোহহমেব চ ॥ ৬৮ ॥

অহং কলয়া বহিঃস্থং স্বাহা দাহিকা ত্রিযা ।

তয়া সহ সমর্থোহহং নালাং দম্বুং স্বাং বিনা ॥ ৬৯ ॥

অহং দীপ্তিমতাং স্ব্যাং কলয়া স্বং প্রভাস্মিকা ।

সকতশ্চ ত্বয়া ভাসে স্বাং বিনাহং ন দীপ্তিমান্ ॥ ৭০ ॥

অহং কলয়া চন্দ্রস্বং শোভা চ যোহিণী ।

মনোহরত্বয়া সার্কং স্বাং বিনা চ ন হৃন্দরি ॥ ৭১ ॥

অহমিচ্ছচ্চ কলয়া স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ স্বং সতি ।

ত্বয়া সার্কং দেবরাজো হতশ্রীশ্চ ত্বয়া বিনা ॥ ৭২ ॥

অহং ধর্মশ্চ কলয়া ত্বং মূর্তিশ্চ ধর্মিণী ।

নাহং শক্তো ধর্মকৃত্যে ত্বাং ধর্মক্রিয়াং বিনা ॥ ৭৩ ॥

অহং বজ্রশ্চ কলয়া ত্বং স্বাংশেন দক্ষিণা ।

ত্বয়া সার্কং ফলদোদ্যাপ্যদমর্থত্বয়া বিনা ॥ ৭৪ ॥

কলয়া পিতৃলোকোহহং স্বাংশেন স্বং স্বধা সতি ।

ত্বয়ালাং কব্যাদানে চ সদা নালাং ত্বয়া বিনা ॥ ৭৫ ॥

ত্বং সম্পৎস্বরূপাহমীশ্বরশ্চ ত্বয়া সহ ।

লক্ষ্মীযুক্তত্বয়া লক্ষ্ম্যা নিতীকশ্চাপি স্বাং বিনা ॥ ৭৬ ॥

অহং পুমাংস্বং প্রকৃতির্ম প্রটোহং ত্বয়া বিনা ।

যথা নালাং কুলালশ্চ ঘটং কণ্ঠং ত্বয়া বিনা ॥ ৭৭ ॥

অহং শৈবশ্চ কবয়া স্বাংশেন স্বং ধ্বজরা ।
 স্বাং শতব্রহ্মাধারাক বিভম্বি মূর্তি, হৃদয়ি ॥ ৭৮ ॥
 স্বক শাস্ত্রিচ কাস্ত্রিচ মূর্তিমূর্তিমতী সতি ।
 তুষ্টি: পুষ্টি: কমা লজ্জা স্তুত্বকা চ পরা দয়া ॥ ৭৯ ॥
 নিত্ৰা তচ্ছা চ তত্ৰা চ মূৰ্দ্ধা চ সন্ততি: ক্রিয়া ।
 মূর্তিরূপা ভক্তিরূপা দেহিনাং দুঃখরূপিণী ॥ ৮০ ॥
 রম্যাদারা সদা স্বক তবাত্মাহং পরম্পরম্ ।
 যথা স্বক তথাহক সমৌ প্রকৃতিপুরুষৌ ।
 ন হি সৃষ্টিৰ্বেদেবি ষয়োবৈকতবঃ বিনা ॥ ৮১ ॥

শ্রীকৃষ্ণজয়ধ্বং, ৬৭ অধ্যায়: । *

“যেমন দুগ্ধ ও ধবলতা, তেমনই যেখানে আমি সেইখানে তুমি। তোমাতে
 আমারে কখনও ভেদ হইবে না ইহা নিশ্চিত। এই বিশ্বের সমস্ত জ্ঞী তোমার কলাংশের
 অংশকলা; যাহাই জ্ঞী তাহাই তুমি; যাহাই পুরুষ তাহাই আমি। কলা দ্বারা আমি
 বহি, তুমি প্রিয়া দাহিকা স্বাহা; তুমি সঙ্গে থাকিলে, আমি দক্ষ করিতে সমর্থ হই, তুমি
 না থাকিলে হই না। আমি দীপ্তিমানদিগের মধ্যে সূর্য্য, তুমি কলাংশে প্রভা; তুমি সঙ্গে
 থাকিলে আমি দীপ্তিমান হই, তুমি না থাকিলে হই না। কলা দ্বারা আমি চন্দ্র, তুমি
 শোভা ও রোহিণী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি মনোহর; হে সুন্দরি। তুমি না থাকিলে
 নই। হে সতি! আমি কলা দ্বারা ইন্দ্র, তুমি স্বর্গলক্ষ্মী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি
 দেবরাজ, না থাকিলে আমি হতজ্ঞী। আমি কলা দ্বারা ধর্ম, তুমি ধর্মিণী মূর্তি; ধর্ম-
 ক্রিয়ার স্বরূপা তুমি ব্যতীত আমি ধর্মকার্য্যে ক্ষমবান্ হই না। কলা দ্বারা আমি যজ্ঞ,
 তুমি আপনার অংশে দক্ষিণা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি ফলদ হই, তুমি না থাকিলে
 তাহাতে অসমর্থ। কলা দ্বারা আমি পিতৃলোক, হে সতি! তুমি আপনার অংশে স্বধা;
 তোমা ব্যতীত পিণ্ডদান বৃথা। তুমি সম্পৎস্বরূপা, তুমি সঙ্গে থাকিলেই আমি প্রভু;
 তুমি লক্ষী, তোমার সহিত আমি লক্ষ্মীযুক্ত, তুমি ব্যতীত নিঃশ্রীক। আমি পুরুষ, তুমি
 প্রকৃতি; তোমা ব্যতীত আমি স্রষ্টা নহি; মৃত্তিকা ব্যতীত কুন্তকার যেমন ঘট করিতে
 পারে না, তোমা ব্যতীত আমি তেমনই সৃষ্টি করিতে পারি না। আমি কলা দ্বারা শেষ,
 তুমি আপনার অংশে বসুন্ধরা; হে সুন্দরি! শব্দরসস্বাদাধার স্বরূপ তোমাকে আমি মস্তকে
 বহন করি। হে সতি! তুমি শাস্তি, কাস্তি, মূর্তি, মূর্তিমতী, তুষ্টি, পুষ্টি, কমা, লজ্জা, স্তুত্বকা

* বঙ্গবাণী কার্যালয় হইতে একাংশত সংস্করণ হইতে ইহা উদ্ধৃত করা গেল। মূল কিছু গোলযোগ আছে যোধ হয়।

এবং তুমি পরা দয়া, শুদ্ধা নিষ্ঠা, তপ্তা, মৃদুতা, সন্ততি, ক্রিয়া, যুক্তিরূপা, তত্ত্বিরূপা, এবং জীবের হৃৎকরুণিণী। তুমি সবাই আমার আধার, আমি তোমার আশ্রা; যেখানে তুমি সেইখানে আমি, তুলা প্রকৃতি পুরুষ; হে দেবি। ছুইএর একের অভাবে সৃষ্টি হয় না।”

এইরূপ আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহাতে যাহা পাই, তাহা ঠিক সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ নহে। সাংখ্যের প্রকৃতি তত্ত্বে শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রকৃতিবাদ এবং শক্তিবাদে প্রভেদ এই যে, প্রকৃতি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ সাক্ষ্যপ্রবচনকার ফাটিকপাত্রে জবাপুষ্পের ছায়ার উপমা দ্বারা বুঝাইয়াছেন। ফাটিকপাত্র এবং জবাপুষ্প পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্; তবে পুষ্পের ছায়া ফাটিকে পড়ে, এই পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু শক্তির সঙ্গে আশ্রার সম্বন্ধ এই যে, আশ্রাই শক্তির আধার। যেমন আধার হইতে আশ্রয় ভিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, তেমনই আশ্রা ও শক্তিতে পার্থক্য নাই। এই শক্তিবাদ যে কেবল তত্ত্বেই আছে, এমনত নহে। বৈষ্ণব পৌরাণিকেরাও সাংখ্যের প্রকৃতিকে বৈষ্ণবী শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। বুঝাইবার জন্য বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

“নিঠৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপারিনী।

যথা সৰ্গগতো বিকৃত্তথৈবেয়ং বিজ্ঞোত্তম। ১৫ ॥

অর্থো বিষ্ণুরিয়ং বাগী নীতিরেষা নয়ো হরিঃ।

বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধিধর্ষোহসৌ সংক্রিয়া ষিয়ন্ ॥ ১৬ ॥

শ্রুতা বিষ্ণুরিয়ং সৃষ্টিঃ শ্রীকৃমিভূধরো হরিঃ।

সন্তোষো ভগবান্ লক্ষ্মীস্তুষ্টীর্মজ্জয়ে! শাস্ততী ॥ ১৭ ॥

ইচ্ছা শ্রীর্ভগবান্ কামো যজ্ঞোহসৌ দক্ষিণা তু সা।

আত্মাহতিরসৌ দেবী পুরোভাশো জনাৰ্দ্দিনঃ ॥ ১৮ ॥

পত্নীশালা যুনে! লক্ষ্মীঃ প্রাথংশো মধুসূদনঃ।

চিতিলক্ষ্মীর্হরিবৃণ ইদা শ্রীর্ভগবান্ কুশঃ ॥ ১৯ ॥

সামস্বরূপো ভগবান্ উদগীতিঃ কমলালয়া।

আহা লক্ষ্মীর্জগন্মাতা বাহুদেবো হতাশনঃ ॥ ২০ ॥

শরবো ভগবান্ শৌরিত্ত্বতিগৌরী বিজ্ঞোত্তম।

মৈজ্জয়ে! কেশবঃ সূর্য্যস্তুপ্রভা কমলালয়া ॥ ২১ ॥

বিকুঃ পিতৃগণঃ পদ্মা স্বধা শাস্ততত্ত্বিহা।

ভৌঃ শ্রীঃ সৰ্ব্বাশ্বকো বিষ্ণুরবকাশোহতিবিস্তরঃ ॥ ২২ ॥

লক্ষ্যঃ শ্রীধরঃ কাকিঃ শ্রীভক্তৈবানপায়িনী ।
 প্রতিপাদ্যীর্জগৎকৌ বাহুঃ সর্বত্রগো হরিঃ ॥ ২৩ ॥
 জগদ্বির্জ ! গোবিন্দস্তবেলা শ্রীহামতে ! ।
 লক্ষ্মীস্বরূপমিচ্ছাণী দেবেন্দ্রো মধুসূদনঃ ॥ ২৪ ॥
 বম্ভচক্রধরঃ সাক্ষাদ্ ধূমোর্গা কমলালয়া ।
 কাকিঃ শ্রীঃ শ্রীধরো দেবঃ স্বয়মেব ধনেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥
 দৌরী লক্ষ্মীর্জাহাভাগা কেশবো বরুণঃ স্বয়ম্ ।
 শ্রীদেবসেনা বিদ্রোহ ! দেবসেনাপতিহরিঃ ॥ ২৬ ॥
 ক্ষরভো গদাপাণিঃ শক্তির্লক্ষ্মীর্জিজ্ঞোস্তম ।
 কাষ্ঠা লক্ষ্মীনিমেবোহনৌ মুহুর্তোহনৌ কলা তু সা ।
 জ্যোৎস্না লক্ষ্মীঃ প্রদীপোহনৌ সর্বঃ সর্বেশ্বরো হরিঃ ॥ ২৭ ॥
 লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুর্জমসংস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥
 বিভাবরী শ্রীদিবসো দেবচক্রগদাধরঃ ।
 বরপ্রদো বরো বিষ্ণুর্বধুঃ পদ্মবনালয়া ॥ ২৯ ॥
 নদশরুপো ভগবান্ শ্রীর্নদীকূপসংস্থিতঃ ।
 ধ্বজশ্চ পুণ্ডরীকাকঃ পতাকা কমলালয়া ॥ ৩০ ॥
 তৃক্ষা লক্ষ্মীর্জগৎস্বামী লোভো নারায়ণঃ পরঃ ।
 রতিরাগো চ ধর্মজ ! লক্ষ্মীর্গোবিন্দ এব চ ॥ ৩১ ॥
 কিক্কাতিবহনোক্তেন সংক্ষেপেণেদমুচ্যতে ।
 দেবতিথ্যবহুত্বাদৌ পুংনামি ভগবান্ হরিঃ ।
 স্ত্রীনামি লক্ষ্মীর্মৈত্রেয় ! নানামোর্বিষ্মতে পরম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেন্দ্বেষে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

“বিষ্ণুর্জ শ্রী সেই জগন্মাতা অক্ষয় এবং নিত্য । হে দ্বিজোত্তম ! বিষ্ণু সর্বগত,
 ইনিও সেইরূপ । ইনি বাক্য, বিষ্ণু অর্থ ; ইনি নীতি, হরি নয় ; ইনি বুদ্ধি, বিষ্ণু বোধ ;
 ইনি ধর্ম, ইনি সংক্রিয়া ; বিষ্ণু স্রষ্টা, ইনি সৃষ্টি ; শ্রী ভূমি, হরি ভূধর ; ভগবান্ সন্তোষ,
 হে মৈত্রেয় । লক্ষ্মী শাস্ত্রী তুষ্টি ; শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্ কাম ; তিনি যজ্ঞ, ইনি দক্ষিণা ;
 জনার্দন পুরোভাশ্, দেবী আভ্যাহতি ; হে মূনে ! লক্ষ্মী পত্নীশালা, মধুসূদন প্রাথম্য ;
 হরি যুগ, লক্ষ্মী চিতি ; ভগবান্ কুণ্, শ্রী ইধ্যা ; ভগবান্ সাম, কমলালয়া উদগীতি ; লক্ষ্মী
 স্বাহা, জগন্নাথ বাসুদেব অগ্নি ; ভগবান্ শৌরি শঙ্কর, হে দ্বিজোত্তম । লক্ষ্মী গৌরী ; হে
 মৈত্রেয় । কেশব সূর্য্য, কমলালয়া তাঁহার প্রভা ; বিষ্ণু পিতৃগণ, পদ্মা নিত্যতুষ্টিদা স্বধা ;

শ্রী স্বর্গ, সর্বাঙ্গক বিষ্ণু অতিবিস্তৃত আকাশস্বরূপ ; শ্রীধর চন্দ্র, শ্রী তাঁহার অক্ষয় কান্তি ; লক্ষ্মী জগতেষ্ঠা বৃত্তি, বিষ্ণু সর্বত্রয় বাহু ; হে বিজ্ঞ ! গোবিন্দ জলধি, হে মহামতে ! শ্রী তাঁহার বেলা ; লক্ষ্মী ইন্দ্রাগ্নীশ্বরূপা, মধুসূদন দেবেন্দ্র ; চক্রেধর সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া ধূমোর্ণা ; শ্রী অন্ধি, শ্রীধর স্বয়ং দেব বনেধর ; কেশব স্বয়ং বরুণ, মহাভাগা লক্ষ্মী গৌরী ; হে বিপ্রেন্দ্র ! শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনাপতি ; গদাধর পুরুষকার, হে দ্বিজোত্তম ! লক্ষ্মী শক্তি ; লক্ষ্মী কাষ্ঠা, ইনি নিমেষ ; ইনি মুহূর্ত্ত, তিনি কলা ; লক্ষ্মী আলোক, সর্বেশ্বর হরি সর্বপ্রদীপ ; জগন্নাথ শ্রী লতাভূতা, বিষ্ণু ক্রমরূপে সংস্থিত ; শ্রী বিভাবরী, দেবচক্রগদাধর দিবস ; বিষ্ণু বরপ্রদ বর, পদ্মবনালয়া বধু ; ভগবান্ নদ স্বরূপী, শ্রী নদীরূপা ; পুণ্ডরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া পতাকা ; লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগৎস্বামী নারায়ণ পরম লোভ ; হে ধর্ম্মজ্ঞ ! লক্ষ্মী রতি, গোবিন্দ রাগ ; অধিক উক্তির প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি, দেব তিথ্যাক্ মহুশাদিতে পুংনামবিশিষ্ট হরি, এবং স্ত্রীনামবিশিষ্টা লক্ষ্মী । হে মৈত্রেয় ! এই দুই ভিন্ন আর কিছুই নাই ।”

বেদান্তের যাহা মায়াবাদ, সাক্ষ্যে তাহা প্রকৃতিবাদ । প্রকৃতি হইতে শক্তিবাদ । এই কয়টি শ্রোকে শক্তিবাদ এবং অদ্বৈতবাদ মিলিত হইল । বোধ হয়, ইহাই স্বরণ রাখিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন যে, তুমি না থাকিলে, আমি কৃষ্ণ, এবং তুমি থাকিলে আমি শ্রীকৃষ্ণ । বিষ্ণুপুরাণকথিত এই শ্রী লইয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ । পাঠক দেখিবেন, বিষ্ণুপুরাণে যাহা শ্রী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে রাধা সম্বন্ধে ঠিক তাহাই কথিত হইয়াছে । রাধা সেই শ্রী । পরিচ্ছেদের উপর আমি শিরোনাম দিয়াছি, “ত্রীরাধা ।” রাধা ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধিসম্পাদিত পরিণয়, শক্তিমানের শক্তির ক্ষুধা, এবং শক্তিরই বিকাশ উভয়ের বিহার ।

যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ এক্ষণে বিদ্যমান আছে, তৎকথিত ‘রাধাভক্ত’ কি, তাহা বোধ করি এতক্ষণে পাঠককে বুঝাইতে পারিলাম । কিন্তু আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ‘রাধাভক্ত’ ছিল কি ? বোধ হয় ছিল ; কিন্তু এ প্রকার নহে । বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তে রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তি অনেক প্রকার দেওয়া হইয়াছে । তাহার দুইটি পূর্বের ফুটনোটে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

“রেক্ষা হি কোটিজন্মাং কৰ্ম্মভোগং শুভাত্তম্ ।

আকারো গৰ্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎস্রজেন ॥ ১০৬ ॥

ধকার আয়ুসো হানিমাকারো ভবংছনম্ ।

প্রবণস্বয়োগতিক্রিয়াঃ প্রণশ্চতি ন সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥

রাকারো নিষ্ঠলাং ভক্তিঃ দাত্তং কৃষ্ণদাম্বুজে ।

সর্বেশ্বিতং সনানন্দং সর্বসিদ্ধৌষমীশ্বরম্ ॥ ১০৮ ॥

ধকারঃ মহাবাসক তত্‌ল্যাকালমেব চ ।

হৃদাতি সাত্ত্বিকং সাক্ষ্যং তদ্বজ্ঞানং হরেঃ সমম্ ॥ ১০৯ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরণম্, ত্রিকক্ষরখণ্ডে ১৩ অঃ ।

ইহার একটিও রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নয়। রাধা শব্দ আরাধনার্থে, পূজার্থে। যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা, তিনিই রাধা বা রাধিকা। বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্তে এ ব্যুৎপত্তি কোথাও নাই। যিনি এই রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি গোপন করিয়া কতকগুলো অবৈয়াকরনিক কল কৌশলের দ্বারা ভ্রান্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং ভ্রান্তির প্রতি-পোষণার্থ মিথ্যা করিয়া সামবেদের দোহাই দিয়াছেন, * তিনি কখনও ‘রাধা’ শব্দের সৃষ্টিকারক নহেন। যিনি রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তির অনুযায়িক হইয়া রাধাকল্পক রচনা করেন নাই, তিনি কখনও রাধার সৃষ্টিকর্তা নহেন। সেই জন্য বিবেচনা করি যে, আদিম ব্রহ্মবৈবর্তেই রাধার প্রথম সৃষ্টি। এবং সেখানে রাধা কৃষ্ণারাধিকা আদর্শরূপিণী গোপী ছিলেন, সন্দেহ নাই।

রাধা শব্দের আর একটি অর্থ আছে—বিশাখানক্ষত্রের ৭ একটি নাম রাধা। কৃত্তিকা হইতে বিশাখা চতুর্দশ নক্ষত্র। পূর্বের কৃত্তিকা হইতে বৎসর গণনা হইত। কৃত্তিকা হইতে রাশি গণনা করিলে বিশাখা ঠিক মাঝে পড়ে। অতএব রাসমণ্ডলের মধ্যবর্তিনী হউন বা না হউন, রাধা রাশিমণ্ডলের বা রাশমণ্ডলের মধ্যবর্তী বটেন। এই ‘রাশমণ্ডলমধ্যবর্তিনী’ রাধার সঙ্গে ‘রাসমণ্ডলের’ রাধার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আসল ব্রহ্মবৈবর্তের অভাবে স্থির করা অসাধ্য।

* রাধাশব্দ ব্যুৎপত্তি সামবেদে নিরূপিত।—১৩ অঃ ১০০।

+ রাধা বিশাখা পুত্রভূ সিদ্ধান্তিচৌ অধিষ্টা।—অমরকোষ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি

ভাগবতে বৃন্দাবনলীলা সম্বন্ধীয় আর কয়েকটা কথা আছে।

১ম, নন্দ এক দিন স্নান করিতে যমুনায়া নামিলে, বরুণের অমুচর আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বরুণালয়ে যায়। কৃষ্ণ সেখানে গিয়া নন্দকে লইয়া আসেন। শাদা কথায় নন্দ এক দিন জলে ডুবিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

২য়, একটা সাপ আসিয়া এক দিন নন্দকে ধরিয়াছিল। কৃষ্ণ সে সর্পের মুখ হইতে নন্দকে মুক্ত করিয়া সর্পকে নিহত করিয়াছিলেন। সর্পটা বিজ্ঞাধর। কৃষ্ণস্পর্শে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানে গমন করে। শাদা কথায় কৃষ্ণ একদিন নন্দকে সর্পমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৩য়, শঙ্খচূড় নামে একটা অসুর আসিয়া ব্রজাঙ্গনাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। কৃষ্ণ বলরাম তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ব্রজাঙ্গনাদিগকে মুক্ত করেন এবং শঙ্খচূড়কে বধ করেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শঙ্খচূড়ের কথা ভিন্নপ্রকার আছে, তাহার কিয়দংশ পূর্বে বলিয়াছি।

৪র্থ, এই তিনটা কথা বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে নাই। কিন্তু কৃষ্ণকৃত অরিষ্টাসুর ও কেশী অসুরের বধবৃত্তান্ত হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে এবং মহাভারতে শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় তাহার প্রসঙ্গও আছে। অরিষ্ট বৃষকণী এবং কেশী অশ্বকণী। শিশুপাল ইহাদিগকে বধ ও অশ্ব বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন।

অতএব প্রথমোক্ত তিনটি বৃত্তান্ত ভাগবতকারপ্রণীত উপাখ্যান বলিয়া উড়াইয়া দিলে অরিষ্টবধ ও কেশিবধকে সেরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষ এই কেশিবধ-বৃত্তান্ত অথর্বসংহিতায় আছে বলিয়াছি। সেখানে কেশীকে কৃষ্ণকেশী বলা হইয়াছে। কৃষ্ণকেশী অর্থে যার কাল চুল। ঋগ্বেদসংহিতাতেও একটি কেশিসূক্ত আছে, (দশম মণ্ডল, ১৩৬ সূক্ত)। এই কেশী দেব কে, তাহা অনিশ্চিত। ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম ঋক্ হইতে এমন বুঝা যায় যে, হয়ত মুনিই কেশী-দেবতা। মুনিগণ লম্বা লম্বা চুল রাখিতেন। ঐ দুই ঋকে মুনিগণেরই প্রশংসা করা হইতেছে। Muir সাহেবও সেইরূপ বুঝিয়াছেন। কিন্তু প্রথম ঋকে, অশ্বপ্রকার বুঝান হইয়াছে। প্রথম ঋক্ রমেশ বাবু এইরূপ বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন :—

“কেশী নামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই অলকে, তিনি ভূলোক ও ত্যালোককে ধারণ করেন। সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন। এই যে জ্যোতি, ইহার নাম কেশী।”

তাহা হইলে, জগদ্ব্যপ্তক যে জ্যোতি, তাহাই কেশী। এবং জগদাবরক যে জ্যোতি, তাহাই কৃষ্ণকেশী। কৃষ্ণ তাহারই নিধনকর্তা, অর্থাৎ কৃষ্ণ জগদাবরক তমঃ প্রতিহত করিয়াছিলেন।

এইখানে বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি। এক্ষণে আলোচ্য যে আমরা ইহার ভিত্তর পাইলাম কি? ঐতিহাসিক কথা কিছুই পাইলাম না বলিলেই হয়। এই সকল পৌরাণিক কথা অতিপ্রকৃত উপস্থানে পরিপূর্ণ। তাহার ভিত্তর ঐতিহাসিক তত্ত্ব অতি চূর্ণভ। আমরা প্রধানতঃ ইহাই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ আছে—চৌরবাদ এবং পরদারবাদ—সে সকলই অমূলক ও অলীক। ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্ত আমরা এত সবিস্তারে ব্রজলীলার সমালোচনা করিয়াছি। ঐতিহাসিক তত্ত্ব যদি কিছু পাইয়া থাকি, তবে সেটুকু এই,—অত্যাচারকারী কংসের ভয়ে বসুদেব আপন পত্নী রোহিণী এবং পুত্রদ্বয় রাম ও কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ শৈশবে ও কৈশোর সেইখানে অতিবাহিত করেন। তিনি শৈশবে রূপলাবণ্যে এবং শিশুশুলভ গুণসকলে সর্বজনের প্রিয় হইয়াছিলেন। কৈশোরে তিনি অতিশয় বলশালী হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের অনিষ্টকারী পশু প্রভৃতি হনন করিয়া গোপালগণকে সর্বদা রক্ষা করিতেন। তিনি শৈশবাবধিই সর্বজন এবং সর্বজীবে কারুণ্যপরিপূর্ণ—সকলের উপকার করিতেন। গোপালগণ প্রতি এবং গোপবালিকাগণ প্রতি তিনি স্নেহশালী ছিলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করিতেন এবং সকলকে সম্ভষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন, এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধর্মতত্ত্বও তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এতটুকু ঐতিহাসিক তত্ত্বও যে পাইয়াছি, ইহাও সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে ইহাও বলিতে পারি যে, ইহার বেশি আর কিছু নয়।

তৃতীয় খণ্ড

মমুরা-দারকা

যন্তনোতি সতাং সেতুম্ভেনামৃতধোনি।

ধর্মার্থব্যবহারাক্ষেপ্তৈ সত্যাত্মনে নমঃ ॥

শাস্তিপর্বণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ ।

একম পরিচ্ছেদ

কংসক

এদিকে কংসের নিকট সংবাদ পৌঁছাইল যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম অতিশয় বলশালী হইয়াছেন। খুতনা হইতে অরিষ্ট পর্য্যন্ত কংসাত্মক লোককে নিহত করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ গিরা কংসকে বলিলেন, কৃষ্ণ-রাম বশুদেবের পুত্র। দেবকীর অষ্টমগর্ভজা বলিয়া যে কষ্টকে কংস নিহত করিয়াছিলেন, সে নন্দ-বল্লভের কষ্ট। বশুদেব সন্তান পরিবর্তিত করিয়া কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া কংস ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বশুদেবকে তিরস্কৃত করিলেন, এবং তাঁহার বধে উদ্যত হইলেন; এবং রাম-কৃষ্ণকে আনিবার জন্ত অক্রুরনামা এক জন যাদবপ্রধানকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। এ দিকে কংস আপনাদের বিখ্যাত বলবান্ মল্লদিগের দ্বারা রাম-কৃষ্ণের বধসাধনের অভিপ্রায়ে ধনুর্মুখ নামে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। রাম-কৃষ্ণ অক্রুর কর্তৃক তথায় আনীত হইয়া * রঙ্গভূমিতে প্রবেশপূর্বক কংসের শিক্ষিত হস্তী কুবলয়াপীড়কে ও লক্ষপ্রতিষ্ঠ মল্ল চাগুর ও মুষ্টিককে নিহত করিলেন। ইহা দেখিয়া কংস নন্দকে লৌহময় নিগড়ে অবরুদ্ধ করিবার এবং বশুদেবকে বিনাশ করিবার জন্ত আদেশ করিয়া কৃষ্ণ-বলরামকে তাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা করিলেন। তখন যে মঞ্চে মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্ত অসংখ্য যাদবের সহিত কংস উপবিষ্ট ছিলেন, কৃষ্ণ লক্ষপ্রদান-পূর্বক ততুপরি আরোহণ করিয়া কংসকে ধরিলেন এবং তাঁহাকে কেশের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া রঙ্গভূমে নিপাতিত ও তাঁহাকে নিহত করিলেন। পরে বশুদেব দেবকী প্রভৃতি গুরুজনকে যথাবিহিত বন্দনা করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। নিজে রাজা হইলেন না।

* পশ্চিমধ্যে কুজা-খট্ট ব্যাপারটা আছে। বিষ্ণুপুরাণে নিম্নলিখিত কথা কিছু নাই। কুজা আপনাকে মন্দরী হইতে দেখিয়া কৃষ্ণকে নিজ মন্দিরে বাইতে অনুরোধ করিলেন, কৃষ্ণ হাসিয়াই অস্বির। বিষ্ণুপুরাণে এই পর্য্যন্ত। কৃষ্ণের এ ব্যবহার মানবোচিত ও সম্মানোচিত। কিন্তু ভাগবতকার ও ব্রহ্মবৈবর্তকার তাহাতে সঙ্কট নহেন, কুজার হঠাৎ ভক্তির হঠাৎ পুরস্কার দিয়াছেন, পথ ব্যতীত কুজা পাটরাণী।

আমরা এইখান হইতে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাহার কারণ, ভাগবতে ঐতিহাসিক কথা কিছুই পাওয়া যায় না, বাহা পাওয়া যায়, তাহা বিষ্ণুপুরাণেও আছে। তদতিরিক্ত বাহা পাওয়া যায়, তাহা অতিপ্রকৃত উপভাস মাত্র। তবে ভাগবতকথিত বালালীলা অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া, আমরা ভাগবতের সে অপেক্ষে পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে পারি।

হরিবংশ ও পুরাণ সকলে এইরূপ কংসবধবৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। কংসবধ ঐতিহাসিক ঘটনা বটে, কিন্তু ভবিষ্যক এই বিবরণ ঐতিহাসিকতা শূন্য। ইহাতে বিশ্বাস করিতে গেলে, অতিপ্রকৃত ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে হয়। প্রথমতঃ দেবর্ষি নারদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয়। তার পর সেই দৈববাণীতে বিশ্বাস করিতে হয়, কেন না, কংসের ভয় সেই দৈববাণীশ্রুতি হইতে উৎপন্ন। তাহা ছাড়া, দুইটি গোপবালক আসিয়া বিনা যুদ্ধে সভামধ্যে মথুরাধিপত্যকে বিনষ্ট করিবে, ইহা ত সহজে বিশ্বাস করা যায় না। অতএব দেখা যাউক যে, সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ মহাভারতে এই বিষয় কি আছে। মহাভারতের সভাপর্বে জরাসন্ধবধ-পর্বাদ্বায়ে কৃষ্ণ নিজ নিজের পূর্ববৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিতেছেন :—

“কিয়ংকাল অতীত হইল, কংস * যাদবগণকে পরাভূত করিয়া মহাদেবা ও অমরজা নামে বর্হিঃস্থের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ দুয়াজ্ঞা যৌব বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মৃদুমতি কংসের দৌরাগ্রে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্ষুব্ধে অহং-কন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম।”

ইহাতে কৃষ্ণ বলরাম বৃন্দাবন হইতে আনীত হওয়ার কথা কিছুমাত্র নাই। বরং এমন বুঝাইতেছে যে, কংসবধের পূর্ব হইতেই কৃষ্ণ বলরাম মথুরাতে বাস করিতেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, বৃদ্ধ যাদবেরা জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পলাইয়া আশ্রয়লাভ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাহা না করিয়া জ্ঞাতিদিগের মঙ্গলার্থ কংসকেই বধ করিলেন। ইহাতে বলরাম ভিন্ন আর কেহ তাঁহার সহায় ছিল কি না, ইহা প্রকাশ নাই। কিন্তু ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারিতেছে যে, অগ্রাশ্রয় যাদবগণ প্রকাশ্যে তাঁহাদের সাহায্য করুন বা না করুন, কংসকে কেহ রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন নাই। কংস তাঁহাদের সকলের উপর অভ্যাচার করিত, এজন্য বরং বোধ হয় তাঁহারা ই-রাম-কৃষ্ণের বলাধিক্য দেখিয়া তাঁহাদিগকে নেতৃত্বে সংস্থাপন করিয়া কংসের বধসাধন করিয়াছিলেন। এইটুকু ভিন্ন আর কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না।

* কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু বলিতে বাধ্য এই অনুবাদে আছে “দানবরাজ কংস।” বুলে তাহা নাই, বধা—

কঙ্কচিৎস্ব কালস্ত কংসো নির্মথ্য যাদবান্দ।

অতঃ “দানবরাজ” শব্দ তুলিয়া দিয়াছি।

আর ঐতিহাসিক ভাষে ইহা পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ কংসকে নিহত করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকেই যাদবদিগের আধিপত্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। কেন না, মহাভারতেও উগ্রসেনকে যাদবদিগের অধিপতি স্বরূপ বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের চিরপ্রচলিত রীতি ও নীতি এই যে, যে রাজাকে বধ করিতে পারে, সেই তাহার রাজ্যভাগী হয়। কংসের বিজ্ঞতা কৃষ্ণ অনায়াসেই মথুরার সিংহাসন অধিকৃত করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না, কেন না, ধর্ম্মতঃ সে রাজ্য উগ্রসেনের। উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়াই কংস রাজা হইয়াছিল। ধর্ম্মই কৃষ্ণের নিকট প্রধান, তিনি শৈশবাবধিই ধর্ম্মাত্মা। অতএব যাহার রাজ্য, তাহাকেই তিনি রাজ্য প্রদান করিলেন। তিনি ধর্ম্মাহুরূপ হইয়াই কংসকে নিহত করিয়াছিলেন। আমরা পরে দেখিব যে, তিনি প্রকাশে বলিতেছেন যে, যাহাতে পরহিত, তাহাই ধর্ম্ম। এখানে ঘোরতর অত্যাচারী কংসের বধে সমস্ত যাদবগণের হিতসাধন হয়, এই জন্ত তিনি কংসকে বধ করিয়াছিলেন—ধর্ম্মার্থ মাত্র। বধ করিয়া করুণহৃদয় আদর্শপুরুষ কংসের জন্ত বিলাপ করিয়াছিলেন এমন কথাও এখানে লিখিত আছে। এষ্ট কংসবধে আমরা প্রথমে প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষ্য পাই এবং এই কংসবধেই দেখি যে, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্যদক্ষ, পরম শ্রায়ণর, পরম ধর্ম্মাত্মা, পরহিতে রত, এবং পরের জন্ত কাতর। এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি আদর্শ মহাত্মা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা

পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কংসবধের পর কৃষ্ণ বলরাম কানীতে সান্দীপনি ঋষির নিকট শিক্ষার্থে গমন করিলেন, এবং চতুষ্টয়দিবসমধ্যে শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানান্তে মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন।

কৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছু পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায় না। নন্দালায়ে তাঁহার কোনও প্রকার শিক্ষা হওয়ার কোন প্রসঙ্গ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অথচ নন্দ জাতিতে বৈশ্য ছিলেন, বৈশ্যদিগের বেদে অধিকার ছিল। বৈশ্যালয়ে তাঁহাদিগের কোনও প্রকার বিদ্যালিক্ষা না হওয়া বিচিত্র বটে। বোধ হয়, শিক্ষার সময়

উপস্থিত হইবার পূর্বেই তিনি নন্দালয় হইতে মথুরায় পুনরানীত হইয়াছিলেন। পূর্ব-পরিচ্ছেদে মহাভারত হইতে যে কৃষ্ণবাক্য উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা হইতে এক্ষণে অনুমানই সম্ভব যে, কংসবধের অনেক পূর্ব হইতেই তিনি মথুরায় বাস করিতেছিলেন, এবং মহাভারতের সভাপর্বে শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় দেখা যায় যে, শিশুপাল তাঁহাকে কংসের অন্নভোজী বলিতেছে—

“যত চানেন ধর্মজ ভুক্তময়ং বলীয়সঃ।

স চানেন হতঃ কংস ইত্যোত্তর মহাত্মতঃ ॥”

মহাভারতম্, সভাপর্ব, ৪০ অধ্যায়ঃ।

অতএব বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইতে না হইতেই কৃষ্ণ মথুরায় আনীত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোপীদিগের সঙ্গে প্রথিত কৈশোরলীলা যে উপস্থাস মাত্র, ইহা তাহার অশ্রুতর প্রমাণ।

মথুরাবাসকালেও তাঁহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছিল, তাহারও কোন বিশিষ্ট বিবরণ নাই। কেবল সান্দীপনি মূনির নিকট চতুঃষষ্টি দিবস অস্ত্রশিক্ষার কথাই আছে। বাঁহারা কৃষ্ণকে দৈশ্বর বলিয়া জানেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন, সর্বজ্ঞ দৈশ্বরের আবার শিক্ষার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তবে চতুঃষষ্টি দিবস সান্দীপনিগৃহে শিক্ষারই বা প্রয়োজন কি? ফলতঃ কৃষ্ণ দৈশ্বরের অবতার হইলেও মানবধর্মাবলম্বী এবং মানুষী শক্তি দ্বারাই সকল কার্য সম্পন্ন করেন, এ কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি এবং এক্ষণেও তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখাইব। মানুষী শক্তি দ্বারা কর্ম করিতে গেলে, শিক্ষার দ্বারা সেই মানুষী শক্তিকে অশুশীলিত এবং ক্ষুরিত করিতে হয়। যদি মানুষী শক্তি স্বতঃক্ষুরিত হইয়া সর্বকার্যসাধনক্ষম হয়, তাহা হইলে সে ঐশী শক্তি—মানুষী শক্তি নহে। কৃষ্ণের যে মানুষী শিক্ষা হইয়াছিল, তাহা এই সান্দীপনিবৃত্তান্ত ভিন্ন আরও প্রমাণ আছে। তিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহাভারতের সভাপর্বে অর্ঘ্যভিহরণ-পর্বোধ্যায়ে কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে ভীষ্ম একটি হেতু এই নির্দেশ করিতেছেন যে, কৃষ্ণ নিখিল বেদবেদান্তপারদর্শী। তাদৃশ বেদবেদান্তজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি দুর্লভ।

“বেদবেদান্তবিজ্ঞানং বলং চাপ্যধিকং তথা।

নৃণাং লোকে হি কোহস্তোহস্তি বিশিষ্টঃ কেশবদূতে ॥”

মহাভারতম্, সভাপর্ব, ৩৮ অধ্যায়ঃ।

মহাভারতে কৃষ্ণের বেদজ্ঞতা সবচেয়ে এইরূপ আরও ভূমি ভূমি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বেদজ্ঞতা তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত নহে। হানোয়া উপনিষদে প্রমাণ পাইয়াছি যে, তিনি আদিত্যসংস্পর্শের ঘোর ঋষির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সে সময়ে ঐশ্বর্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের উচ্চশিক্ষার উচ্চাংশকে তপস্যা বলিত। ঐশ্বর্য রাজর্ষিগণ কোন সময়ে না কোন সময়ে তপস্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ কথা প্রায় পাওয়া যায়। আমরা এক্ষেপে তপস্যা অর্থে যাহা বুঝি, বেদের অনেক স্থানেই দেখা যায় যে, তপস্যার প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। আমরা বুঝি তপস্যা অর্থে বনে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া পানাহার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করা। কিন্তু দেবতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এবং মহাদেবও তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাও কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ শতপথব্রাহ্মণে আছে যে, অয়ং পরব্রহ্ম সিস্থকু হইলে তপস্যার দ্বারাই সৃষ্টি করিলেন, যথা—

সোহকাময়ত। বহঃ শ্রাং প্রজায়েয়েতি। স তপোহতপ্যত। স তপতপ্ত্য ইদং সর্বমসৃজত।*

অর্থ,—“তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি প্রজাসৃষ্টির জন্ত বহু হইব। তিনি তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া এই সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।”

এ সকল স্থানে তপস্যা অর্থে এই রকমই বুঝিতে হয় যে, চিত্ত সমাহিত করিয়া আপনার শক্তি সকলের অহুশীলন ও ক্ষুরণ করা। মহাভারতে কথিত আছে যে, কৃষ্ণ দশ বৎসর হিমালয় পর্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাভারতের ঐশিক পর্বে লিখিত আছে যে, অশ্বথামা প্রযুক্ত ব্রহ্মশিরা অস্ত্রের দ্বারা উত্তরার গর্ভপাতের সম্ভাবনা হইলে, কৃষ্ণ সেই যুতশিশুকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, এবং তখন অশ্বথামাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমার তপোবল দেখিবে।

আদর্শ মনুষ্যের শিক্ষা আদর্শ শিক্ষাই হইবে। ফলও সেইরূপ দেখি। কিন্তু সেই প্রাচীন কালের আদর্শ শিক্ষা কিরূপ ছিল, তাহা কিছু জানিতে পারা গেল না, ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জরাসন্ধ

সকল সময়েই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে, অন্ততঃ ভারতবর্ষের উত্তরার্ধে এক এক জন সম্রাট ছিলেন, তাঁহার প্রাধান্ত অশ্ব রাজগণ স্বীকার করিত। কেহ বা করদ, কেহ বা আজ্ঞাসুবর্তী, এবং যুদ্ধকালে সকলেই সহায় হইত। ঐতিহাসিক সময়ে চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, অশোক, মহাপ্রতাপশালী গুপ্তবংশীয়েরা, হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য, এবং আধুনিক সময় পাঠান ও মোগল—ইহারা এইরূপ সম্রাট ছিলেন। হিন্দুরাজ্যকালে অধিকাংশ সময়ই এই আধিপত্য মগধাধিপতিরই ছিল। আমরা যে সময়ের বর্ণনায় উপস্থিত, সে সময়ও মগধাধিপতি উক্ত ভারতে সম্রাট। এই সম্রাট বিখ্যাত জরাসন্ধ। তাঁহার বল ও প্রতাপ মহাভারতে, হরিবংশে ও পুরাণ সকলে অতিশয় বিস্তারের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমস্ত কত্রিয়গণ একত্র হইয়াছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও উভয় পক্ষের মোটে অষ্টাদশ অকৌহিণী সেনা উপস্থিত ছিল, লেখা আছে। একা জরাসন্ধের বিশতি অকৌহিণী সেনা ছিল লিখিত হইয়াছে।

কংস এই জরাসন্ধের জামাতা। কংস তাঁহার দুই কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কংসবধের পর তাঁহার বিধবা কন্যাদ্বয় জরাসন্ধের নিকটে গিয়া পতিহস্তার দমনার্থ রোদন করেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণের বধার্থ মহাসৈন্য লইয়া আসিয়া মথুরা অবরোধ করেন। জরাসন্ধের অসংখ্য সৈন্যের তুলনায় যাদবদিগের সৈন্য অতি অল্প। তথাপি কৃষ্ণের সেনাপতিবৃণ্ডে যাদবেরা জরাসন্ধকে বিমূখ করিয়াছিলেন। কিন্তু জরাসন্ধের বলক্ষয় করা তাঁহাদের অসাধ্য। কেন না, জরাসন্ধের সৈন্য অগণ্য। অতএব জরাসন্ধ পুনঃপুনঃ আসিয়া মথুরা অবরোধ করিতে লাগিল। যদিও সে পুনঃপুনঃ বিমূখীকৃত হইল, তথাপি এই পুনঃপুনঃ আক্রমণে যাদবদিগের গুরুতর অন্তঃ উৎপাদনের সম্ভাবনা হইল। যাদবদিগের ক্ষুদ্রসৈন্য পুনঃপুনঃ যুদ্ধে ক্ষয় হইতে লাগিলে তাঁহারা সৈন্যশূন্য হইবার উপক্রম হইলেন। কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার ভাটার স্থায় জরাসন্ধের অগাধ সৈন্যের ক্ষয়বৃদ্ধি কিছু জানিতে পারা গেল না। এইরূপ সপ্তদশবার আক্রান্ত হওয়ার পর, যাদবেরা কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে মথুরা ত্যাগ করিয়া দুরাক্রম্য প্রদেশে দুর্গনির্মাণপূর্বক বাস করিবার অভিপ্রায় করিলেন। অতএব সাগরদ্বীপ দ্বারকায় যাদবদিগের জন্ম পুরী নির্মাণ হইতে লাগিল এবং দুরারোহ

বৈবর্তক পর্বতে যারকা রক্ষণার্থে দুর্গপ্রাঙ্গণ সংস্থাপিত হইল। কিন্তু তাহারা যারকা বাইবরি পূর্বেরই জরাসন্ধ অটীকব বার মথুরা আক্রমণ করিতে আসিলেন।

এই সময়ে জরাসন্ধের উদ্ভেজনায় আর এক প্রবল শত্রু কৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার জন্ত উপস্থিত হইল। অনেক এবেই দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে যবনদিগের রাজত্ব ছিল। এক্ষণকার পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীকদিগকেই ভারতবর্ষীয়েরা যবন বলিতেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিতর্কিত কি না, তাহা বিবেচনা অনেক সন্দেহ আছে। বোধ হয়, শক, হুন, গ্রীক প্রভৃতি অহিন্দু সভ্য জাতিমাত্রকেই যবন বলিতেন। যাহাই হউক, ঐ সময়ে, কালযবন নামে এক জন যবন রাজা ভারতবর্ষে অতি প্রবলপ্রভাপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া সসৈন্তে মথুরা অবরোধ করিলেন। কিন্তু পরমসমর-রহস্তবিৎ কৃষ্ণ তাহার সহিত সসৈন্তে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কেন না, ক্ষুদ্র রাববসেনা তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিমুগ্ধ করিলেও, সংখ্যায় বড় অল্প হইয়া বাইবে। ইতাবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহারা জরাসন্ধকে বিমুগ্ধ করিতে সক্ষম হইতে না পারে। আর ইহাও পশ্চাৎ দেখিব যে, সর্বভূতে দয়াময় কৃষ্ণ প্রাণিহত্যা পক্ষে ধর্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত অমুরাগ প্রকাশ করেন না। যুদ্ধ অনেক সময়েই ধর্ম্মাহুমোদিত, সে সময়ে যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মের হানি হয়, গীতায় কৃষ্ণ এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এখানেও কালযবন এবং জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ ধর্ম্ম্য যুদ্ধ। আত্মরক্ষার্থ এবং স্বজনরক্ষার্থ প্রজাগণের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা ঘোরতর অধর্ম্ম। কিন্তু যদি যুদ্ধ করিতেই হইল, তবে যত অল্প মনুষ্যের প্রাণ হানি করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, ধার্ম্মিকের তাহাই কর্তব্য। আমরা মহাভারতের সভাপর্বে জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে দেখিব যে, যাহাতে অল্প কোন মনুষ্যের জীবন হানি না হইয়া জরাসন্ধবধ সম্পন্ন হয়, কৃষ্ণ তাহার সচুপায় উদ্ভূত করিয়াছিলেন। কালযবনের যুদ্ধেও তাহাই করিলেন। তিনি সসৈন্তে কালযবনের সম্মুখীন না হইয়া কালযবনের বধার্থ কোশল অবলম্বন করিলেন। একাকী কালযবনের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কালযবন তাহাকে চিনিতে পারিল। কৃষ্ণকে ধরিবার জন্ত হাত বাড়াইল, কৃষ্ণ ধরা না দিয়া পলায়ন করিলেন। কালযবন তাহার পশ্চাৎদাবিত হইল। কৃষ্ণ যেমন বেদে বা যুদ্ধবিজ্ঞায় সুপণ্ডিত, শারীরিক ব্যায়ামেও তজ্জপ সুপারগ। আদর্শ মনুষ্যের এইরূপ হওয়া উচিত, আমি “ধর্ম্মভদ্রে” দেখাইয়াছি। অতএব কালযবন কৃষ্ণকে ধরিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ কালযবন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এক গিরিগুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কথিত আছে, সেখানে যুধিষ্ঠির নামে এক ঋষি নিদ্রিত ছিলেন। কালযবন শুধাকারসমে

কৃষ্ণকে দেখিতে না। পাইরা, সেই ঋষিকেই কৃষ্ণদ্রমে পদাঘাত করিল। পদাঘাতে উদ্ভিন্ন হইয়া ঋষি কালযবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কালযবন ভস্মীভূত হইয়া গেল।

এই অভিজ্ঞকৃত ব্যাপারটাকে আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। স্থূল কথা এই বুঝি যে, কৃষ্ণ কৌশলাবলম্বনপূর্বক কালযবনকে তাহার সৈন্য হইতে দূরে লইয়া গিয়া, গোপন স্থানে তাহার সঙ্গে দ্বৈরথ্য যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। কালযবন নিহত হইলে, তাহার সৈন্য সকল ভঙ্গ দিয়া মথুরা পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহার পর জরাসন্ধের অষ্টাদশ আক্রমণ,—সে বারও জরাসন্ধ বিমুখ হইল।

উপরে যেরূপ বিবরণ লিখিত হইল, তাহা হরিবংশে ও বিষ্ণুদ্বিপুরণে আছে। মহাভারতে জরাসন্ধের যেরূপ পরিচয় কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের কাছে দিয়াছেন, তাহাতে এই অষ্টাদশ বার যুদ্ধের কোন কথাই নাই। জরাসন্ধের সঙ্গে যে যাদবদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল, এমন কথাও স্পষ্টতঃ নাই। যাহা আছে, তাহাতে কেবল এইটুকু বুঝা যায় যে, জরাসন্ধ মথুরা একবার আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু হংস নামক তাঁহার অহুগত কৌরবীর বলদেব কর্তৃক নিহত হওয়ায় জরাসন্ধ চুঃখিত মনে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সেই স্থান আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—

‘কিরংকাল অজীত হইল কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অহুজা নামে বার্ষ্রজের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ দুয়াক্তা স্বীয় বাহুবলে জাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্বাপেক্ষা প্রদান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ কজ্রিয়গণ মৃঢ়মতি কংসের দৌরাভ্যে সান্ত্বিয় ব্যথিত হইয়া জাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অহুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রুরকে আহ্বককন্ডা প্রদান করিয়া জাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভজ সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম। তাহাতে কংসভয় নিবারণিত হইল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জাতি বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে যদি আমরা শক্রনাশক মহাপ্রভাবা তিন শত বৎসর অবিলম্বে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবতুল্য তেজস্বী মহাবল-পরাক্রান্ত হংস ও ভিষক নামক দুই বীর তাহার অহুগত আছে; উহারা অস্ত্রাঘাতে কনাচ নিহত হইবে না। আনার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ঐ দুই বীর এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে জিতুবন বিজয় করিতে পারে। হে ঋষ্যবাক! এই পরামর্শ কেবল আমাদের অতিমত হইল এমত নহে, অস্ত্রাঘাত দুঃপতিগণও উহাতে অহুমোদন করিবেন।

হংস নামে হুবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। বলদেব তাঁহাকে সংগ্রামে সংহার করেন। ভিষক লোকমুখে হংস মরিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া নামসাদৃশ্যপ্রযুক্ত তাহার সহচর হংস নিদন প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিল। পরে হংস বিনা আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা করতঃ যমুনায়

নিম্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এ বিকে ভৎ-সহস্র হংসও পরম প্রাণহান্যে তিসিককে আপন মিথ্যা বৃত্তান্ত-সংবাদে জ্বলে প্রাণত্যাগ করিতে জ্বলণ করিয়া বৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া মৃনুনাঙ্গে আত্মসমর্পণ করিল। জরাসন্ধ এই দুই বীর পুরুষের নিধনবার্ত্তা জ্বলে বৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও শূভমনা হইয়া স্নগবে প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধ বিম্বনা হইয়া স্বপ্নে গমন করিলে পর আমরা পরমাঙ্কাদে মথুরা বাস করিতে লাগিলাম।

কিয়দিনান্তর পতিবিরোধ-দুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী বীর শিতার সমীপে আগমন পূর্বক 'আমার পতিহন্তাকে সংহার কর' বলিয়া বারংবার তাঁহাকে অহরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্বেই জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করতঃ সাতিশর উৎকণ্ঠিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করত সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব এই স্থির করিয়া স্বহান পরিত্যাগ পূর্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। ঐ পশ্চিম দেশে রৈবতোগণশোভিত পরম রমণীয় কুশবলীনাদী পুরীতে বাস করিতেছি—তথায় এক্ষণে দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃক্ষবাণীর মহারথদিগের কথা দূরে থাকুক, ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন্! এক্ষণে আমরা অকূতোভয়ে ঐ নগরী মধ্যে বাস করিতেছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশবাসী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ রৈবতক পর্বত দেখিয়া পরম আচ্ছাদিত হইলেন। হে কুক্কুলপ্রাণী! আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রব-ভয়ে পর্বত আশ্রয় করিয়াছি। ঐ পর্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন, প্রস্থে এক যোজনের অধিক এবং একবিশতি বৃদ্ধযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত শত দ্বার এবং অত্যুৎকৃষ্ট উন্নত ভোবণ সকল আছে। যুদ্ধযন্ত্র মহাবলপরাক্রান্ত কজ্রিয়গণ উহাতে সর্বদা বাস করিতেছেন। হে রাজন্! আমাদের হুলে অষ্টাদশ লক্ষ জাভা আছে। আছকের একশত পুত্র, তাহার সকলেই অমরতুলা। চাকদেব ও তাহার ভ্রাতা, চক্রবেদ, সাত্যকি, আমি, বলভদ্র, যুদ্ধবিশারদ শাশ্ব—আমরা এই সাত জন রথী। কৃতকর্ণী, অনাগুষ্ঠি, সমীক, সমিতিক্রয়, কক, শঙ্খ ও কুন্ডি এই সাত জন মহাবথ, এবং অন্ধকভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দুই কলেবর দশজন মহাবীর,—ইহারা সকলেই জরাসন্ধাধিকৃত মধ্যম দেশ স্মরণ করিয়া যদুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।"

এই জরাসন্ধবধ-পর্কাদ্বয় প্রাধানতঃ মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়া আমরা বিশ্বাস। হুএকটা কথা প্রসিদ্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই মৌলিক। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের বিরোধ-বিবরণে উপরি উক্ত বৃত্তান্তই প্রামাণিক বলিয়া আমাদের কাছে গ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, পূর্বে বৃথাইয়াছি যে, হরিবংশ এবং পুরাণ সকলের অপেক্ষা মহাভারতের মৌলিকত্বে অনেক প্রাচীন। যদি এ কথা বথার্থ হয়, তবে জরাসন্ধকৃত অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ এবং অষ্টাদশ বার তাহার পরাভব, এ সমস্তই মিথ্যা গল্প। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই হইতে পারে যে, একবারমাত্র সে মথুরা আক্রমণে আসিয়াছিল এবং নিষ্ফল হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। দ্বিতীয়বার

যাদবগণের রাজধানী ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ দেখিলেন যে, চতুর্দিকে সমতল ভূমির অঞ্চলটাই সমস্ত নগরীতে-বাল করিয়া জরাসন্ধের অসংখ্য সৈন্যকৃত পুনঃপুনঃ অবরোধ নিশ্চল করা অসম্ভব। অতএব যেখানে দুর্গনির্ম্মাণপূর্ব্বক দুর্গাঙ্গরে ক্ষুদ্র সেনা রক্ষা করিয়া জরাসন্ধকে বিরুদ্ধ করিতে পারিষেন, সেইখানে রাজধানী তুলিয়া লইয়া গেলেন। দেখিয়া জরাসন্ধ আর সে দিকে ঘেঁসিলেন না। জয়-পরাজয়ের কথা ইহাতে কিছুই নাই। ইহাতে কেবল ইহাই বুঝা যায় যে, যুদ্ধকৌশলে কৃষ্ণ পারদর্শী, তিনি পরম রাজনীতিজ্ঞ এবং অনর্থক মহত্বহত্যার নিতান্ত বিরোধী। আদর্শ মনুষ্যের সমস্ত গুণ তাঁহাতে ক্রমশঃ পরিস্কৃত হইতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণের বিবাহ

কৃষ্ণের প্রথমা ভার্যা রুক্মিণী। ইনি বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি ভীষ্মকের কন্যা। তিনি অতিশয় রূপবতী এবং গুণবতী শুনিয়া কৃষ্ণ ভীষ্মকের নিকট রুক্মিণীকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রুক্মিণীও কৃষ্ণের অমুরক্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্মক কৃষ্ণকে জরাসন্ধের পরামর্শে রুক্মিণীকে কৃষ্ণে সমর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি কৃষ্ণদেবক শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ স্থির করিয়া দিনাবধারণপূর্ব্বক সমস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। যাদবগণের নিমন্ত্রণ হইল না। কৃষ্ণ স্থির করিলেন, যাদবদিগকে সঙ্গে লইয়া ভীষ্মকের রাজধানীতে যাইবেন এবং রুক্মিণীকে তাঁহার বন্ধুবর্গের অসম্মতিতেও গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবেন।

কৃষ্ণ তাহাই করিলেন। বিবাহের দিনে রুক্মিণী দেবারাধনা করিয়া দেবমন্দির হইতে বাহির হইলে পর, কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া রথে তুলিলেন। ভীষ্মক ও তাঁহার পুত্রগণ এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি ভীষ্মকের মিত্ররাজগণ কৃষ্ণের আগমনসংবাদ শুনিয়াই এইরূপ একটা কাণ্ড উপস্থিত হইবে বুঝিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। সৈন্য লইয়া সকলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ও যাদবগণকে পরাকৃত করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে স্বাক্ষর লইয়া গিয়া বধাশাস্ত্র বিবাহ করিলেন।

ইহাকে 'হরণ' বলে। হরণ অর্থে কন্ধ্যার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বুঝায় না। কন্ধ্যার যদি পাত্রে অভিযত হয়, এবং সে বিবাহে সে সম্মত থাকে, তবে তাহার প্রতি কি

অত্যাচার। রুক্মিণীহরণেও সে কোন দোষ নাই, কেন না রুক্মিণী কুবের অধরক, এবং পরে কেবাইন যে, কুবেরদ্বারস্থিত সার্বজনিক হুজুরাহরণেও সে দোষ করে নাই। তবে এরূপ কল্পাহরণে কোন প্রকার দোষ আছে কি না, তাহার বিশেষ বিচার আবশ্যিক। এ কথা আমরা স্বীকার করি। আমরা সে বিচার শ্রুতপ্রাহরণের সময় করিব। কেন না, কুবের নিজেই সে বিচার সেই সময় করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে সে বিষয়ে কোন কথা বলিব না।

তবে ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। সে কালে কত্রিয়রাজগণের বিবাহের দুইটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল :—এক স্বয়ংবর বিবাহ, আর এক হরণ। কখনও কখনও এক বিবাহে দুই রকম ঘটয়া যাইত, যথা—কাশিরাজকন্যা অহিকাদির বিবাহে। ঐ বিবাহে স্বয়ংবর হয়। কিন্তু আদর্শ কত্রিয় দেবব্রত ভীষ্ম, স্বয়ংবর না মানিয়া, তিনটি কন্যাই কাড়িয়া লইয়া গেলেন। আর কস্তুর স্বয়ংবরই হউক, আর হরণই হউক, কন্যা এক জন লাভ করিলে, উদ্ধতস্বভাব রণপ্রিয় কত্রিয়গণ একটা যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত করিতেন। ইতিহাসে দ্রৌপদীস্বয়ংবরে এবং কাব্যে ইন্দুমতীস্বয়ংবরে দেখিতে পাই যে, কন্যা হস্তা হয় নাই, তথাপি যুদ্ধ উপস্থিত। মহাভারতের মৌলিক অংশে রুক্মিণী যে হস্তা হইয়াছিলেন, এমন কথাটা পাওয়া যায় না। শিশুপালবধ-পর্বাদ্বায়ে কুবের বলিতেছেন :—

রুক্মিণ্যামস্ত যুদ্ধ প্রার্থনানীমুর্ষতঃ।

ন চ তাং প্রাপ্তবান্ যুগঃ শূদ্রো বৈরজ্জতীমিব ॥

শিশুপালবধপর্বাদ্বায়ে, ৪৫ অধ্যায়ে, ১৫ শ্লোকঃ।

শিশুপাল উত্তর করিলেন :—

মৎপূর্বাং রুক্মিণীং কুব সৎসংস্থ পরিকীর্তয়ন্।

বিশেষতঃ পাণ্ডিবেষু ব্রীড়াং ন কুবধে কথম্ ॥

মম্মন্যো হি কঃ সংস্থ পুরুষঃ পরিকীর্তয়েৎ।

অন্তপূর্বাং ত্রিযং জাতু স্বরচ্যো মধুসূদন ॥

শিশুপালবধপর্বাদ্বায়ে, ৪৫ অধ্যায়ে, ১৮-১৯ শ্লোকঃ।

ইহাতে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে বুঝিতে পারিব যে, রুক্মিণী হস্তা হইয়াছিলেন, বা উদ্ধত কোন যুদ্ধ হইয়াছিল। তার পর উত্তোগপর্বের আর এক স্থানে আছে,—

যো রুক্মিণীমেকরথেন ভোজান্ উৎসান্ত রাজ্ঞঃ সমরে প্রপঞ্চঃ।

উবাহ ভার্গব্যঃ যশস্য বলন্তীং যন্ত্যং তজ্জৈ রৌদ্ধিণেশো মহাত্মা ॥

ইহাও বুঝার কথা আছে, কিন্তু হরণের কথা নাই।
আর এক স্থানে কল্পিতহরণবৃত্তান্ত আছে। উত্তোগপর্বের সৈন্তনির্বাণ লম্বের কল্পিত
জ্ঞানী কল্পী পাণ্ডবকিনের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদুপলক্ষে কবিত্ত
হইতেছে :—

“বাহুবলবান্ধিত কল্পী পূর্বে ধীমান্ বাহুদেবের কল্পিতহরণ সঙ্ঘ করিতে না পারিয়া, ‘আমি কৃষ্ণকে
বিনষ্ট না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না,’ এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্বক প্রবৃত্ত ভাগীরথীর জায় বেগবতী বিচিৎ
আবুধাধিগী চতুর্দিকী সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার সমিহিত
হইয়ামাত্র পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু যে স্থানে বাহুবেদকর্তৃক পরাজিত
হইয়াছিলেন, তথায় ভোজকট ন্যায়ক প্রবৃত্ত সৈন্ত ও গজবান্ধিসম্পন্ন সুবিখ্যাত এক নগর সংস্থাপন
করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নগর হইতে ভোজরাজ কল্পী এক অশ্বোহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সম্বরে
পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিলেন এবং পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণের প্রিয়াহৃদয় করিবার নিমিত্ত
কবচ, ধনু, তলবার, খড়্গ ও শরাসন ধারণ করিয়া আদিত্যসন্ধ্যা ক্ষণের সহিত পাণ্ডবসৈন্যগণী মধ্যে
প্রবিষ্ট হইলেন।”

এই কথা উত্তোগপর্বের ১৫৭শ অধ্যায়ে আছে। ঐ অধ্যায়ের নাম কল্পিপ্ৰত্যাখ্যান।
মহাভারতের যে পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে যে
উত্তোগপর্বের ১৮৬ অধ্যায়, এবং ৬৬৯শ শ্লোক আছে।

“উত্তোগপর্বনির্দিষ্টং সন্ধিবিগ্রহমিচ্ছিতম্।

অধ্যায়ানাং শতং শ্রোতব্ধতীতির্মহর্ষিণা।

শ্লোকানাং বটসংখ্যায়ৈব শতানি চ।

শ্লোকান্চ নবতিঃ শ্রোতান্তথৈবাতৌ মহাত্মনা।”

মহাভারতম্, আদিপর্ব।

এক্ষণে মহাভারতে ১২৭ অধ্যায় পাওয়া যায়। অতএব ১১ অধ্যায় পর্বসংগ্রহাধ্যায়
সঙ্কলিত হওয়ার পরে প্রস্কিপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে উত্তোগপর্বের ৭৬৫৭ শ্লোক পাওয়া যায়।
অতএব প্রায় এক হাজার শ্লোক প্রস্কিপ্ত হইয়াছে। প্রস্কিপ্ত এই একাদশ অধ্যায় ও সহস্র
শ্লোক কোন্গুলি? প্রথমেই দেখিতে হয় যে, উত্তোগপর্বান্তর্গত কোন্ বৃত্তান্তগুলি পর্ব-
সংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত হয় নাই। এই কল্পিসমাগম বা কল্পিপ্ৰত্যাখ্যান পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত
হয় নাই। অতএব ঐ ১৫৭ অধ্যায় প্রস্কিপ্ত একাদশ অধ্যায়ের মধ্যে একটি, ইহা বিচার-
সঙ্গত। এই কল্পিপ্ৰত্যাখ্যান-পর্বাধ্যায়ের সঙ্গে মহাভারতের কোন সম্বন্ধ নাই। কল্পী
সমীপে আসিলেন এবং অর্জুন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ দুর্যোধন কর্তৃকও পরিত্যক্ত

হইলেন। পঞ্চম বছরে হরিরা মেলেন। ইহা ভিন্ন মহাভারতের সঙ্গে তাহার আর কোন
সম্বন্ধ নাই। এই দুইটি লক্ষণ একত্রিত করিয়া নিচের করিয়া দেখিলে, অবশ্য বুঝিতে হইবে যে,
১৪১ লক্ষ্যের অন্তর্গত কালক্রমে কর্ম্মগীহরণ যুদ্ধে মহাভারতে প্রকৃত। ইহার অন্তর্ভুক্ত এমন
এই যে, বিষ্ণুপুরাণে আছে যে, মহাভারতের যুদ্ধের পূর্বেই কন্নী বলরাম কর্তৃক অক্ষৌড়-
জনিত বিবাহে নিহত হইয়াছিলেন। : কল্পিতকৈ শিশুপাল কামনা করিয়াছিলেন, ইহা সত্য
এবং তিনি কল্পিতকৈ বিবাহ করিতে পান নাই—কৃষ্ণ তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাও
সত্য। বিবাহের পর একটি যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ‘হরণ’ কথাটা মৌলিক মহাভারতে
কোথাও নাই। হরিবংশে ও পুরাণে আছে।

শিশুপাল ভীষ্মকে তিরস্কারের সময় কাশিরাজের কছাধারণ জন্তু তাঁহাকে গালি
দিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে তিরস্কারের সময় কল্পিতগীহরণের কোন কথাও তুলেন নাই।
অতএব বোধ হয় না যে কল্পিতগীহরণ হইয়াছিলেন। পূর্বেদ্যুত কথোপকথনে ইহাই সত্য
বোধ হয় যে, শিশুপাল কল্পিতকৈ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীষ্ম কল্পিতকৈ কৃষ্ণকেই
সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তার পর তাঁহার পুত্র কন্নী শিশুপালের পক্ষ হইয়া বিবাদ
উপস্থিত করিয়াছিলেন। কন্নী অতিশয় কলহপ্রিয় ছিলেন। অনিরুদ্ধের বিবাহকালে
দু্যতোপলক্ষে বলরামের সঙ্গে কলহ উপস্থিত করিয়া নিজেই নিহত হইয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নরকবধাদি

কথিত হইয়াছে, নরকাসুর নামে পৃথিবীর এক পুত্র ছিল। প্রাগজ্যোতিষে তাহার
রাজধানী। সে অত্যন্ত দুর্কিনীত ছিল। ইন্দ্র স্বয়ং ষারকায় আসিয়া তাহার নামে কৃষ্ণের
নিকট নালিশ করিলেন। অশ্রান্ত দুর্কর্ম্মের মধ্যে নরক ইন্দ্র বিষ্ণু প্রভৃতি আদিত্যদিগের
মাতা দিতির কুণ্ডল চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণ ইন্দ্রের নিকট নরকবধে প্রতিশ্রুত
হইয়া প্রাগজ্যোতিষপুরে গিয়া নরককে বধ করিলেন। নরকের বোল হাজার কড়া ছিল,
তাহাদিগের সকলকে লইয়া আসিয়া বিবাহ করিলেন। নরকমাতা পৃথিবী নরকপঙ্কত
দিতিকুণ্ডল লইয়া আসিয়া কৃষ্ণকে উপহার দিলেন; এবং বলিয়া গেলেন যে, কৃষ্ণ যখন

রাজার পদত্যাগ হইয়াছিলেন, তখন পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা বরাহের যে মূৰ্ত্তি সেই মূৰ্ত্তি পৃথিবী গর্ভাধীন হইয়া নরককে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

সমস্তই অতিপ্রকৃত এবং সমস্তই অতি মিথ্যা। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করেন নাই, প্রাণেশ্বর পৃথিবীর উদ্ধারের কৃত্ত বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই বেদে আছে। কৃষ্ণের সময়ে, নরক প্রাগজ্যোতিষের রাজা ছিলেন না—ভগদত্ত প্রাগজ্যোতিষের রাজা ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনহস্তে নিহত হন। কলতঃ ইন্দ্রের দ্বারকা গমন, পৃথিবীর গর্ভাধান এবং এক জনের বোড়শ সহস্র কল্প ইত্যাদি সকলই অতিপ্রকৃত উপন্যাস মাত্র। কৃষ্ণের বোড়শ সহস্র মহিষী থাকে এই উপন্যাসের অংশমাত্র এবং মিথ্যা গল্প, ইহা পাঠককে আর বলিতে হইবে না।

এই নরকাসুরবধ হইতে বিষ্ণুপুরাণের মতে পারিজাত হরণের সূত্রপাত। কৃষ্ণ দিতির কুণ্ডল লইয়া দিতিকে দিবার জন্ত সত্যভামা সমভিব্যাহারে ইন্দ্রালায়ে গমন করিলেন। সেখানে সত্যভামা পারিজাত কামনা করার পারিজাত বৃক্ষ লইয়া ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ বাধিল। ইন্দ্র পরাস্ত হইলেন। হরিবংশে ইহা ভিন্নপ্রকারে লিখিত আছে। কিন্তু যখন আমরা বিষ্ণুপুরাণকে হরিবংশের পূর্বগামী গ্রন্থ বিবেচনা করি, তখন এখানে বিষ্ণুপুরাণেরই অন্তর্ভুক্ত হইলাম। উভয় গ্রন্থকথিত বৃত্তান্তই অত্যন্ত ও অতিপ্রকৃত। যখন আমরা ইন্দ্র, ইন্দ্রালায় এবং পারিজাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অবিশ্বাসী, তখন এই সমস্ত পারিজাতহরণবৃত্তান্তই আমাদের পরিহার্য।

ইহার পর বাণাসুরবধবৃত্তান্ত। তাহাও ঐরূপ অতিপ্রকৃত অতুতব্যাপারপরিপূর্ণ, একান্ত তাহাও আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। তাহার পর পৌণ্ড্র বাসুদেববধ এবং বারণসীদাহ। ইহার কতকটা ঐতিহাসিকতা আছে বোধ হয়। পৌণ্ড্রদিগের রাজ্য ঐতিহাসিক, এবং পৌণ্ড্র জাতির কথা ঐতিহাসিক এবং অনৈতিহাসিক সময়েও বিবিধ দেশী বিদেশী গ্রন্থে পাওয়া যায়। রামায়ণে তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়, কিন্তু মহাভারতের সময়ে তাহারা আধুনিক বাঙ্গালার পশ্চিমভাগবাসী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পৌণ্ড্রেরা উপস্থিত ছিল, মহাভারতে তাহারা অনার্য জাতির মধ্যে গণিত হইয়াছে। লক্ষণুমারচরিতেও তাহাদিগের কথা আছে এবং এক জন চৈনিক পরিব্রাজক তাহাদিগকে বাঙ্গালা দেশে স্থাপিত দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাদিগের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধনেও গিয়াছিলেন, কৃষ্ণের সময়ে যিনি পৌণ্ড্রদিগের রাজা ছিলেন, তাহারও নাম বাসুদেব। বাসুদেব শব্দের অনেক অর্থ হয়। যিনি বাসুদেবের পুত্র, তিনি বাসুদেব। এবং যিনি

সর্বনিবাস অর্থাৎ সর্বভূতের বাসস্থান, তিনিও বাসুদেব।^{*} অতএব যিনি ঈশ্বরের অবতার, তিনিই প্রকৃত বাসুদেব নামের অধিকারী। এই পৌণ্ড্রিক বাসুদেব প্রচার করিলেন যে, দ্বারকানিবাসী বাসুদেব, জাল বাসুদেব; তিনি নিজেই প্রকৃত বাসুদেব—ঈশ্বরবতীর। তিনি কৃষ্ণকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি আমার নিকটে আসিয়া, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাদি যে সকল চিহ্নে আমারই প্রকৃত অধিকার, তাহা আমাকেই দিবে। কৃষ্ণ ‘তথাস্থ’ বলিয়া পৌণ্ড্ররাজ্যে গমন করিলেন এবং চক্রাদি অস্ত্র পৌণ্ড্রকের প্রতি ক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন। বারাণসীর অধিপতিগণ পৌণ্ড্রকের পক্ষ হইয়াছিল, এবং পৌণ্ড্রকের মৃত্যুর পরেও কৃষ্ণের সন্ধে শত্রুতা করিয়া, যুদ্ধ করিতেছিল। এক্ষণে তিনি বারাণসী আক্রমণ করিয়া শত্রুগণকে নিহত করিলেন এবং বারাণসী দগ্ধ করিলেন।

এ স্থলে শত্রুকে নিহত করা অধর্ম্য নহে, কিন্তু নগরদাহ ধর্ম্মানুমোদিত নহে। পরম ধর্ম্মানু কৃষ্ণের দ্বারা এরূপ কার্য কেন হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরাণে লেখা আছে যে, কাশিরাজ কৃষ্ণহস্তে নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র মহাদেবের তপস্বী করিয়া কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত “কৃত্য উৎপন্ন হউক,” এই বর প্রার্থনা করিলেন। কৃত্য অভিচারকে বলে। অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে শরীরবিশিষ্টা অমোঘ কোন শক্তি উৎপন্ন হইয়া শত্রুর বধসাধন করে। মহাদেব প্রার্থিত বর দিলেন। কৃত্য উৎপন্ন হইয়া ভীষণ মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণের বধার্থ ধাবমান হইল। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রকে আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি এই কৃত্যাকে সংহার কর। বৈষ্ণবচক্রের প্রভাবে মাহেশ্বরী কৃত্য বিধ্বস্ত-প্রভাবা হইয়া পলায়ন করিল। চক্রও পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কৃত্য বারাণসী নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। চক্রানলে সমস্ত পুরী দগ্ধ হইয়া গেল। ইহা অতিশয় অনৈসর্গিক ও অবিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। হরিবংশে পৌণ্ড্রকবধের কথা আছে, কিন্তু বারাণসীদাহের কথা নাই। কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে। অতএব বারাণসীদাহ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। তবে কি জ্ঞান বারাণসীদাহ করিতে কৃষ্ণ বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণ কিছু জানা যায় না।

যে সকল যুদ্ধের কথা বলা গেল, তন্নিমিত্ত উত্তোগপর্ব্বের ৪৭ অধ্যায়ে অর্জুনবাক্যে কৃষ্ণকৃত গান্ধারজয়, পাণ্ড্যজয়, কলিঙ্গজয়, শাৰঙ্গজয় এবং একলব্যের সংহারের প্রসঙ্গ আছে। ইহার মধ্যে শাৰঙ্গজয়বৃত্তান্ত মহাভারতের বনপর্ব্বের আছে। ইহা ভিন্ন আর কয়টির কোন

* “বহু সর্ব্বনিবাসন্ত বিধানি বস্ত্র লোমহ।

স চ দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতি শ্রুতঃ।”

বিস্তারিত বিবরণ আমি কোন গ্রন্থে পাইলাম না। বোধ হয়, হরিবংশ ও পুরাণ সকল সংগ্রহের পূর্বে এই সকল বৃদ্ধ-বিষয়ক কিছদস্তী বিলুপ্ত হইয়াছিল। হরিবংশে ও ভাগবতে অনেক নুতন কথা আছে, কিন্তু মহাভারতে বা বিষ্ণুপুরাণে তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই বলিয়া আমি সে সকল পরিত্যাগ করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বারকাবাস—সমস্তক

দ্বারকায় কৃষ্ণ রাজা ছিলেন না। যত দূর বৃষ্ণিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, ইউরোপীয় ইতিহাসে যাহাকে Oligarchy বলে, বাদবেরা দ্বারকায় তাহাই ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা সমাজের অধিনায়ক ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা পরস্পর সকলে সমানস্বর্গ্য। বয়োজ্যেষ্ঠকে আপনাদিগের মধ্যে প্রধান বিবেচনা করিতেন, সেই জন্ম উগ্রসেনের রাজা নাম। কিন্তু এক্ষণে প্রধান ব্যক্তির কার্য্যভঃ বড় কর্তৃত্ব থাকিত না। যে বুদ্ধিবিক্রমে প্রধান, নেতৃত্ব তাহারই ঘটিত। কৃষ্ণ যাদবদিগের মধ্যে বলবীৰ্য্য বুদ্ধিবিক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই জন্মই তিনি যাদবদিগের নেতৃত্বরূপ ছিলেন। তাঁহার অগ্রজ বলরাম এবং কৃতবর্মা প্রভৃতি অস্ত্রাশ্রয় বয়োজ্যেষ্ঠ যাদবগণও তাঁহার বশীভূত ছিলেন। কৃষ্ণও সর্ব্বদা তাঁহাদিগের মঙ্গল-কামনা করিতেন। কৃষ্ণ হইতেই তাঁহাদিগের রক্ষা সাধিত হইত এবং কৃষ্ণ বহুরাজ্যবিজ্ঞতা হইয়াও জ্ঞাতিবর্গকে না দিয়া আপনি কোন ঐশ্বর্য্যভোগ করিতেন না। তিনি সকলের প্রতি তুল্যপ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। সকলেরই হিতসাধন করিতেন। জ্ঞাতিদিগের প্রতি আদর্শ মনুষ্যের যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহা তিনি করিতেন। কিন্তু জ্ঞাতিভাব চিরকালই সমান। তাঁহার বলবিক্রমের ভয়ে জ্ঞাতিরা তাঁহার বশীভূত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি ঘৃণা ছিল না। এ বিষয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং যাহা নারদের কাছে বলিয়াছিলেন, ভাষ্য তাহা নারদের মুখে শুনিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন। কথাগুলি সত্য হউক, মিথ্যা হউক, লোকশিক্ষার্থে আমরা তাহা মহাভারতের শাস্তিপর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

“জ্ঞাতিদিগকে ঐশ্বৰ্য্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান ও তাহাদিগের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসেব জায় অবস্থান করিতেছি। বহিলাভার্থী ব্যক্তি যেমন অরণি কাষ্ঠকে” মথিত করিয়া থাকে, তজ্জপ জ্ঞাতিবর্গের দুর্ভিক্ষ নিরন্তর আমার জগৎ দগ্ধ করিতেছে। বলদেব বল, গদ স্ত্রুমাযতা এবং আমার আশ্রয় প্রদায় সৌদর্ঘ্য-প্রভাবে জনসমাজে অধিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আর অন্ধক ও

রুক্মিণীস্নেহেরাও অকালপরাক্রান্ত উৎসাহলসার ও অধ্যবসায়শালী; তাঁহার্য বাহার দ্বাদ্ব্যজ্ঞানা করেন, সে বিনষ্ট হয় এবং বাহার সহায়তা করেন, সে অন্যায়সে অন্যায়ত্ব ঐশ্বর্য লাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি অসহায় হইয়া কালবাণন করিতেছি। আহক ও অক্রুর আমার পক্ষ স্বকৃত, কিন্তু ঐ দুই জনের মধ্যে এক জনকে স্নেহ করিলে অস্ত্রের জ্বোখোদীপন হয়; হুতরায় আমি কাহারই প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহার্দ্য বশতঃ উহাদিগকে পরিত্যাগ করাও হুকটিন। অতঃপর আমি এই স্থির করিলাম যে, আহক ও অক্রুর বাহার পক্ষ, তাহার দুঃখের পরিসীমা নাই, আর তাঁহার্য বাহার পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। বাহা হউক, এক্ষণে আমি দ্যুতকারী সর্হোদরথয়ের মাতার ত্রায় উভয়েরই ভয় প্রার্থনা করিতেছি। যে নারদ! আমি ঐ দুই মিত্রকে আয়ত্ব করিবার নিমিত্ত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি।”

এই কথার উদাহরণস্বরূপ শ্রমন্তক মণির বৃত্তান্ত পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। শ্রমন্তক মণির বৃত্তান্ত অতিপ্রকৃত পরিপূর্ণ। অতিপ্রকৃত অংশ বাদ দিলে যেটুকু থাকিবে, তাহাও কত দূর সত্য, বলা যায় না। যাহা হউক, স্থূল বৃত্তান্ত পাঠককে শুনাইতেছি।

সত্রাজিত নামে এক জন যাদব দ্বারকায় বাস করিতেন। তিনি একটি অতি উজ্জ্বল সর্বজনলোভনীয় মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মণির নাম শ্রমন্তক। কৃষ্ণ সেই মণি দেখিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইহা যাদবামিপতি উগ্রসেনেরই যোগ্য। কিন্তু জ্ঞাতি-বিরোধ-ভয়ে সত্রাজিতের নিকট মণি প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু সত্রাজিত মনে ভয় করিলেন যে, কৃষ্ণ এই মণি চাহিবেন। চাহিলে তিনি রাখিতে পারিবেন না, এই ভয়ে মণি তিনি নিজে ধারণ না করিয়া আপনার ভ্রাতা প্রসেনকে দিয়াছিলেন। প্রসেন সেই মণি ধারণ করিয়া এক দিন যুগয়ায় গিয়াছিলেন। বনমধ্যে একটা সিংহ তাঁহাকে হত করিয়া সেই মণি মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া যায়। জাম্ববান্ সিংহকে হত করিয়া সেই মণি গ্রহণ করে। জাম্ববান্ একটা ভল্লুক। কথিত আছে যে, সে দ্বাপরযুগে রামের বানর-সেনার মধ্যে থাকিয়া রামের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল।

এ দিকে প্রসেন নিহত এবং মণি অন্তর্হিত জানিতে পারিয়া দ্বারকাবাসী লোকে এইরূপ সন্দেহ করিল যে, কৃষ্ণের যখন এই মণি লইবার ইচ্ছা ছিল, তখন তিনিই প্রসেনকে মারিয়া মণি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ লোকাপবাদ কৃষ্ণের অসহ্য হওয়ায় তিনি মণির সন্ধানে বহির্গত হইলেন। যেখানে প্রসেনের মৃতদেহ দেখিলেন, সেইখানে সিংহের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহা সকলকে দেখাইয়া আপনার কলঙ্ক অপনীত করিলেন। পরে সিংহের পদচিহ্নানুসরণ করিয়া ভল্লুকের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সেই পদচিহ্ন ধরিয়া গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় জাম্ববানের পুত্রপালিকা ধাত্রীর হস্তে সেই

শ্রমস্বত্বক মণি দেখিতে পাইলেন। পরে জাহ্নবানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্তব করিলেন। তখন জাহ্নবান্ তাঁহাকে শ্রমস্বত্বক মণি দিল, এবং আপনার কন্যা জাহ্নবতীকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিল। কৃষ্ণ মণি লইয়া দ্বারকায় আসিয়া মণি সত্রাজিতকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। তিনি পরম্ব কামনা করিতেন না। কিন্তু সত্রাজিত, কৃষ্ণের উপর অতুতপূর্ব্ব কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিলেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া, কৃষ্ণের তুষ্টিসাধনার্থ আপনার কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিলেন। সত্যভামা সর্ব্বজনপ্রার্থনীয় রূপবতী কন্যা ছিলেন। একস্রু তিন জন প্রধান যাদব, অর্থাৎ শতধ্বা, মহাবীর কৃতবর্মা এবং কৃষ্ণের পরমু ভক্ত ও সুহৃৎ অক্রুর ঐ কন্যাকে কামনা করিয়াছিলেন। একগ্নে সত্যভামা কৃষ্ণে সম্প্রদত্তা হওয়ায় তাঁহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিলেন এবং সত্রাজিতের বধের জন্ত যড়যন্ত্র করিলেন। অক্রুর ও কৃতবর্ম্মা শতধ্বাকে পরামর্শ দিলেন যে, তুমি সত্রাজিতকে বধ করিয়া তাহার মণি চুরি কর। কৃষ্ণ তোমাদের যদি বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে, আমরা তোমার সাহায্য করিব। শতধ্বা সম্মত হইয়া কদাচিৎ কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে, সত্রাজিতকে নিদ্রিত অবস্থায় বিনাশ করিয়া মণি চুরি করিলেন।

সত্যভামা পিতৃবধে শোকাতুরা হইয়া কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন। কৃষ্ণ তখন দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া, বলরামকে সঙ্গে লইয়া, শতধ্বার বধে উদ্যোগী হইলেন। শুনিয়া শতধ্বা কৃতবর্ম্মা ও অক্রুরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণ বলরামের সহিত শক্রতা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন শতধ্বা অগত্যা অক্রুরকে মণি দিয়া দ্রুতগামী ঘোটকে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ বলরাম রথে যাইতেছিলেন, রথ ঘোটককে ধরিতে পারিল না। শতধ্বার অশ্বিনীও পথক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। শতধ্বা তখন পাদচারে পলায়ন করিতে লাগিল। শ্রায়যুদ্ধপরায়ণ কৃষ্ণ তখন রথে বলরামকে রাখিয়া স্বয়ং পাদচারে শতধ্বার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ দুই ক্রোশ গিয়া শতধ্বার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কিন্তু মণি তাঁহার নিকট পাইলেন না। ফিরিয়া আসিয়া বলরামকে এই কথা বলিলে বলরাম তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। ভাবিলেন, মণির ভাগে বলরামকে বঞ্চিত করিবার জন্ত কৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলিতেছেন। বলরাম বলিলেন, “ধিক্ তোমায়া! তুমি এমন অর্থলোভী! এই পথ আছে, তুমি দ্বারকায় চলিয়া যাও; আমি আর দ্বারকায় যাইব না।” এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া বিদেহ নগরে গিয়া তিন বৎসর বাস করিলেন। এদিকে অক্রুরও দ্বারকা ত্যাগ

করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে বাদবগণ তাঁহাকে অস্তর দিয়া পুনর্ব্বার ধারণা আনাইলেন। কৃষ্ণ তখন এক দিন সমস্ত বাদবগণকে সমবেত করিয়া, অকুরকে বলিলেন যে, স্তম্ভক মণি তোমার নিকট আছে, আমরা তাহা জানি। সে মণি তোমারই থাকুক, কিন্তু সকলকে একবার দেখাও। অকুর ভাবিলেন, আমি যদি অস্বীকার করি, তাহা হইলে সন্ধান করিলে, আমার নিকট এখনই মণি বাহির হইবে। অতএব তিনি অস্বীকার না করিয়া মণি বাহির করিলেন। তাহা দেখিয়া বলরাম এবং সত্যভামা সেই মণি লইবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ কৃষ্ণ সেই মণি বলরাম বা সত্যভামা কাহাকেও দিলেন না, আপনিও লইলেন না, অকুরকেই প্রত্যর্পণ করিলেন।*

এই স্তম্ভকমণিবৃত্তান্তেও কৃষ্ণের জ্ঞায়পরতা, স্বার্থশূন্যতা, সত্যপ্রতিজ্ঞতা এবং কার্যদক্ষতা অতি পরিষ্কৃত। কিন্তু উপন্যাসটা সত্যমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণের বহুবিবাহ

এই স্তম্ভক মণির কথায় কৃষ্ণের বহুবিবাহের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িতেছে। তিনি ঋগ্বৈদিকে পূর্ব্ব বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এক স্তম্ভক মণির প্রভাবে আর ছুটি ভাৰ্য্যা, জাম্ববতী এবং সত্যভামা, লাভ করিলেন। ইহাই বিষ্ণুপুরাণ বলেন। হরিবংশ এক পৈঠা উপর গিয়া থাকেন,—তিনি বলেন, ছুইটি না, চারিটি। সত্রাজিতের তিনটি কন্যা ছিল,—সত্যভামা, প্রম্বাপিনী এবং ত্রিভিনী। তিনটিই তিনি ত্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলেন। কিন্তু ছুই চারিটায় কিছু আসিয়া যায় না—মোট সংখ্যা নাকি ষোল হাজারের উপর। এইরূপ লোকপ্রবাদ। বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে আছে, “ভগবতোহপ্যত্র মর্ত্যালোকেহবতীর্ণশ্চ ষোড়শসহস্রাণ্যেকোত্তরশতাধিকানি জীণামভবন্।”† কৃষ্ণের ষোল হাজার এক শত এক স্ত্রী। কিন্তু ঐ পুরাণের ৭ অংশের ২৮ অধ্যায়ে প্রধানাদিগের নাম করিয়া পুরাণকার বলিতেছেন, ঋগ্বৈদী ভিন্ন “অষ্টাশ্চ ভাৰ্য্যাঃ কৃষ্ণস্ত বহুবুঃ সপ্ত শোভনাঃ।” তার পর, “ষোড়শাস্নু সহস্রাণি জীণামস্তানি চক্রিণঃ।” তাহা হইলে, দাঁড়াইল ষোল হাজার

* এইরূপ বিষ্ণুপুরাণে আছে। হরিবংশ বলেন, কৃষ্ণ আপনিই মণি ধারণ করিলেন।

† বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অং, ১০ অ, ১১।

সাত জন। ইহার মধ্যে বোল হাজার লক্ষকর্তা। সেটা আবার নয় বহিরা আসি-
ইতিপূর্বেই তার বিবরণ।

গল্পটা কত বড় আবার, আর এক রকম করিয়া বুঝাই। বিষ্ণুপুরাণের কতখান
অংশের এই লক্ষণ লখ্যায় আছে যে, এই লক্ষণ আর মধ্যে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার
পুত্র আরো। বিষ্ণুপুরাণেই কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ এক শত পঁচিশ বৎসর স্ত্রীতে ছিলেন।
হিসাব করিলে, কৃষ্ণের বৎসরে ১৪৪০টি পুত্র, ও প্রতিদিন চারিটি পুত্র জন্মিত। এ
স্থলে এইরূপ কল্পনা করিতে হয় যে, কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণমহিবীর পুত্রবতী হইতেন।

এই নরকাসুরের বোল হাজার কল্পার আবারে গল্প ছাড়িয়া দিই। কিন্তু তন্ত্র
আরও আট জন “প্রধান” মহিবীর কথা পাওয়া যাইতেছে। এক জন কল্পিণী।
বিষ্ণুপুরাণকার বলিয়াছেন, আর সাত জন। কিন্তু ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে নাম দিতেছেন
আট জনের, যথা—

“কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্য্য নারাজিতী তথা।

দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী ॥

ময়রাজসূতা চান্দ্রা সুনীলা শীলমণ্ডনা।

সত্যজিতী সত্যভামা লক্ষণা চাক্রহাসিনী ॥”

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| ১। কালিন্দী | ৫। রোহিণী (ইনি কামরূপিণী) |
| ২। মিত্রবিন্দা | ৬। ময়রাজসূতা সুনীলা |
| ৩। নরজিতকল্পা সত্য্য | ৭। সত্যজিতকল্পা সত্যভামা |
| ৪। জাম্ববতী | ৮। লক্ষণা |

কল্পিণী লইয়া নয় জন হইল। আবার ৩২ অধ্যায়ে আর এক প্রকার। কৃষ্ণের
পুত্রগণের নামকীৰ্ত্তন হইতেছে :—

প্রহ্মমাতা হরে: পুত্রা কল্পিণ্যা: কথিতান্তব।

ভাষ্ণং ভৈরবিককৈব সত্যভামা ব্যজায়ত ॥ ১ ॥

দীপ্তিমান্ তাম্রপকাত্তা রোহিণ্যাং তনয়া হরে:।

বভূর্জাম্ববত্যাঞ্চ শাহাত্তা বাহশালিন: ॥ ২ ॥

তনয়া ভ্রুবিন্দাত্তা নারাজিত্যাং মহাবলা:।

সংগ্রামজিৎপ্রধানাস্ত শৈব্যাম্বতবন্ সূতা: ॥ ৩ ॥

বৃকাত্তাস্ত সূতা মাত্র্যাং গাজবৎপ্রমুখান্ সূতান্।

অবাশ লক্ষণা পুত্রা: কালিন্দ্যাঞ্চ সত্যময়: ॥ ৪ ॥

এই কবিতার পাণ্ডুরা গেল, কবিতা হারানো,

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ১। সত্যভামা (৭) | ৫। শৈব্যা (২) |
| ২। রোহিণী (৫) | ৬। মাজী (৬) |
| ৩। জাহবতী (৪) | ৭। লক্ষণা (৮) |
| ৪। নারজিতী (৩) | ৮। কালিন্দী (১) |

কিন্তু ৪র্থ অংশের ১৫ অধ্যায়ে আছে, “ভালাক কবিতা-সত্যভামাজাহবতী-জালহাসিনী-প্রমুখা অষ্টৌ পত্নাঃ প্রধানাঃ।” এখানে আবার সব নাম পাওয়া গেল না, নূতন নাম “জালহাসিনী” একটা পাওয়া গেল। এই গেল বিষ্ণুপুরাণে। হরিবংশে আরও গোলযোগ।

হরিবংশে আছে ;—

মহিষীঃ সপ্ত কল্যাণীকৃতোহস্তা মধুসূদনঃ ।
উপযমে মহাবাহুগুণোপেতাঃ কুলোদ্গতাঃ ॥
কালিন্দীঃ মিত্রবিন্দাঞ্চ সত্যং নারজিতীঃ তথা ।
হুতাং জাহবতঞ্চাপি রোহিণীং কামরূপিণীম্ ॥
মন্ত্ররাজহুতাকপি স্ত্রীলাং ভদ্রলোচনাম্ ।
সাত্ৰাজিতীং সত্যভামাং লক্ষণাং জালহাসিনীম্ ॥
শৈব্যন্ত চ হুতাং তবীং রূপেণাপন্নসং সমাং ।

১১৮ অধ্যায়ঃ, ৪০-৪৩ শ্লোকঃ ।

এখানে পাওয়া যাইতেছে যে, লক্ষণাই জালহাসিনী। তাহা ধরিয়াও পাই,—

- (১) কালিন্দী ।
- (২) মিত্রবিন্দা ।
- (৩) সত্য ।
- (৪) জাহবৎ-সুতা ।
- (৫) রোহিণী ।
- (৬) মাজী স্ত্রীলা ।
- (৭) সাত্ৰাজিতকন্যা সত্যভামা ।
- (৮) জালহাসিনী লক্ষণা ।
- (৯) শৈব্যা ।

ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি—কুরুগী ছাড়া নয় জন হইল। এ গেল ১১৮ অধ্যায়ের তালিকা।
 হরিবংশে আবার ১৬২ অধ্যায়ে আর একটি তালিকা আছে, যথা—

অষ্টৌ মহিষঃ পুত্রিণ্য ইতি প্রাধান্ততঃ সূতাঃ ।
 সর্গা বীরপ্রসন্নৈশ্চ তাবপত্যানি যে শৃণু ॥
 কুরুগী সত্যভামা চ দেবী নাগজিতী তথা ।
 সুদত্তা চ তথা শৈব্যা লক্ষণা জালহাসিনী ॥
 মিত্রবিন্দা চ কালিন্দী জাহ্নবত্যা পৌরবী ।
 সুভীমা চ তথা মাত্রী * * *

ইহাতে পাওয়া গেল, কুরুগী ছাড়া,

- (১) সত্যভামা ।
- (২) নাগজিতী ।
- (৩) সুদত্তা ।
- (৪) শৈব্যা ।
- (৫) লক্ষণা জালহাসিনী ।
- (৬) মিত্রবিন্দা ।
- (৭) কালিন্দী ।
- (৮) জাহ্নবতী ।
- (৯) পৌরবী ।
- (১০) সুভীমা ।
- (১১) মাত্রী ।

হরিবংশকার ঋষি ঠাকুর, আট জন বলিয়া কুরুগী সমেত বার জনের নাম দিলেন।
 তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। ইহাদের একে একে সম্ভানগণের নামকীৰ্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন।
 তখন আবার বাহির হইল—

- (১২) সুদেবা ।
- (১৩) উপাসঙ্গ ।
- (১৪) কৌশিকী ।

(১৫) কৃতশোমা ।

(১৬) বোধিষ্ঠী ।*

এ ছাড়া পূর্বে সত্রাজিতির আর দুই কছা ত্রিভিনী এবং প্রম্বাপিনীর কথা বলিয়াছেন ।

এ ছাড়া মহাভারতের নূতন দুইটি নাম পাওয়া যায়,—গান্ধারী ও হৈমবতী † । সকল নামগুলি একত্র করিলে, প্রধানা মহিষী কতগুলি হয় দেখা যাউক । মহাভারতে আছে,—

(১) রুহ্মিণী ।

(২) সত্যভামা ।

(৩) গান্ধারী ।

(৪) শৈব্যা ।

(৫) হৈমবতী ।

(৬) জাম্ববতী ।

মহাভারতে আর নাম নাই, কিন্তু “অম্বা” শব্দটা আছে । তার পর বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে ১, ২, ৩, ছাড়া এই কয়টা নাম পাওয়া যায় ।

(৭) কালিন্দী ।

(৮) মিত্রবিন্দা ।

(৯) সত্যা নাগজিভী ।

(১০) রোহিণী ।

(১১) মাজী ।

(১২) লক্ষ্মণা জালহাসিনী ।

* ইহারও প্রধানা অষ্টের ভিতর গণিত হইয়াছেন । ‘ভাসামপত্যাক্তটানাং ভগবন্ প্রব্রবীত মে ।’ ইহার উত্তরে এ সকল মহিষীর অপত্য কথিত হইতেছে ।

† রুহ্মিণী ও গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতীভ্যামি ।

মেবী জাম্ববতী চৈব বিধিগুর্জাতবেদসম্ ।

মৌসলপর্ক, ৭ অধ্যায় ।

বিষ্ণুপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে তদতিরিক্ত পাওয়া যায়, শৈব্যা। তাঁহার নাম উপরে লেখা আছে। তার পর হরিবংশের প্রথম তালিকা ১১৮ অধ্যায়ে, ইহা ছাড়া নৃতন নাম নাই, কিন্তু ১৬২ অধ্যায়ে নৃতন পাওয়া যায়।

(১৩) স্নদভা।

(১৪) পৌরবী।

(১৫) স্নভামা।

এবং ঐ অধ্যায়ে সন্তানগণনায় পাই,

(১৬) স্নদেবা।

(১৭) উপাসঙ্গ।

(১৮) কৌশিকী।

(১৯) স্নতসোমা।

(২০) যৌধিষ্ঠিরী।

এবং সত্যস্রমার বিবাহকালে কৃষ্ণে সম্প্রদত্তা,

(২১) ব্রতিনী।

(২২) প্রস্থাপিনী।

আট জনের জায়গায় ২২ জন পাওয়া গেল। উপজ্ঞাসকারদিগের খুব হাত চলিয়াছিল, একথা স্পষ্ট। ইহার মধ্যে ১৩ হইতে ২২ কেবল হরিবংশে আছে। এই জন্ত ঐ ১০ জনকে ত্যাগ করা যাইতে পারে। তবু থাকে ১২ জন। গাঙ্গারী ও হৈমবতীর নাম মহাভারতের মৌসলপর্ব ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। মৌসলপর্ব যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পরে দেখাইব। এজন্ত এই দুই নামও পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। বাকি থাকে ১০ জন।

জাম্ববতীর নাম বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে এইরূপ লেখা আছে,—

“দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিনী।”

হরিবংশে এইরূপ,—

“হতা জাম্ববতশ্চাপি রোহিণী কামরূপিনী।”

ইহার অর্থে যদি বুঝা যায়, জাম্ববৎসুতাই রোহিণী, তাহা হইলে অর্থ অসঙ্গত হয় না, বরং সেই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। অতএব জাম্ববতী ও রোহিণী একই। বাকি থাকিল ৮ জন।

সত্যভামা ও সত্যাপ্ত এক। তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

সত্যজিতবধের কথার উত্তরে

“কৃষ্ণ সত্যভামাম্বরভান্নলোচনঃ প্রোহ, সত্যো, মমৈবাবহাসনা।”

অর্থাৎ কৃষ্ণ ক্রোধারক্ত লোচনে সত্যভামাকে বলিলেন, “সত্যো। ইহা আমারই অবহাসনা।” পুনশ্চ পঞ্চমাংশের ৩০ অধ্যায়ে, পারিজাতহরণে কৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিতেছেন,—

“সত্যো! যথা ঋষিত্যক্তং তথা কৃষ্ণাসকৃৎপ্রিয়ম্।”

আবশ্যক হইলে, আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা যথেষ্ট।

অতএব এই দশ জনের মধ্যে, সত্যা সত্যভামারই নাম বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইল। এখন আট জন পাই। যথা—

- ১। কুল্লিণী
- ২। সত্যভামা
- ৩। জাম্ববতী
- ৪। শৈব্যা
- ৫। কালিন্দী
- ৬। মিত্রবিন্দা
- ৭। মাজী
- ৮। জালহাসিনী লক্ষ্মণা

ইহার মধ্যে পাঁচ জন—শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, লক্ষ্মণা ও মাজী সুশীলা—ইহারা তালিকার মধ্যে আছেন মাত্র। ইহাদের কখনও কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই না। ইহাদের কবে বিবাহ হইল, কেন বিবাহ হইল, কেহ কিছু বলে না। কৃষ্ণজীবনে ইহাদের কোন সংস্পর্শ নাই। ইহাদের পুত্রের তালিকা কৃষ্ণপুত্রের তালিকার মধ্যে বিষ্ণুপুরাণকার লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনও কর্মক্ষেত্রে দেখি না। ইহারা কাহার কথা, কোন্ দেশসম্ভূতা, তাহার কোন কথা কোথাও নাই। কেবল, সুশীলা মন্ত্ররাজকন্যা, ইহাই আছে। কৃষ্ণের সমসাময়িক মন্ত্ররাজ, নকুল সহদেবের মাতুল, কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত রথী শল্য। তিনি ও কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে সপ্তদশ দিন, পরস্পরের শত্রুসেনা মধ্যে অবস্থিত। অনেক বার তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। কৃষ্ণ সশস্ত্রীয় অনেক কথা শল্যকে বলিতে হইয়াছে, শল্য সশস্ত্রীয় কথা কৃষ্ণকে বলিতে হইয়াছে। কৃষ্ণ সশস্ত্রীয় অনেক কথা শল্যকে শুনিতে

হইয়াছে, শল্য সখদ্বীর অনেক কথা কুরুক্ষেত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এক লক্ষক জন্ত কিছুতেই প্রকাশ নাই যে, কৃষ্ণ শল্যের জামাতা, বা ভগিনীপতি, বা তাদৃশ কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট। সম্বন্ধের মধ্যে এইটুকু পাই যে, শল্য কর্তৃক বলিয়াছেন, ‘অর্জুন ও বাসুদেবকে এখনই বিনাশ কর’। কুরু ও যুধিষ্ঠিরকে শল্যরথে নিহত করিয়া তাহার যমস্বরূপ হইলেন। কৃষ্ণ যে মাজীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই বোধ হয়। শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা এবং লক্ষণার কুলশীল, দেশ, এবং বিবাহবৃত্তান্ত কিছুই কেহ জানে না। তাঁহারাও কাব্যের অলঙ্কার, সে বিষয়ে আমার সংশয় হয় না।

কেন না, কেবল মাজী নয়, জাম্ববতী রোহিণী ও সত্যভামাকেও ঐরূপ দেখি। জাম্ববতীর সঙ্গে কালিন্দী প্রভৃতির প্রভেদ এই যে, তাঁহার পুত্র শাশ্বের নাম, আর পাঁচ জন যাদবের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শাশ্ব কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কেবল এক লক্ষণাহরণে। লক্ষণা হৃষ্যোধনের কন্যা। মহাভারত যেমন পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত, তেমনি কৌরবদিগেরও জীবনবৃত্ত। লক্ষণাহরণে যদি কিছু সত্য থাকিত, তবে মহাভারতে লক্ষণাহরণ থাকিত। তাহা নাই। জাম্ববতী নিজে ভল্লুককন্যা, ভল্লুকী। ভল্লুকী কৃষ্ণভার্যা বা কোন মানুষের ভার্যা হইতে পারে না। এই জন্ত রোহিণীকে কামরূপিণী বলা হইয়াছে। কামরূপিণী কেন, না ভল্লুকী হইয়াও মানবরূপিণী হইতে পারিতেন। কামরূপিণী ভল্লুকীতে আমি বিশ্বাসবান্ নহি, এবং কৃষ্ণ ভল্লুককন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি না।

সত্যভামার পুত্র ছিল শুনি, কিন্তু তাঁহারা কখনও কোন কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন। তাঁহার প্রতি সন্দেহের এই প্রথম কারণ। তবে সত্যভামা নিজে রুক্মিণীর স্থায় মধ্যে মধ্যে কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত বটে। তাঁহার বিবাহবৃত্তান্তও সবিস্তারে আলোচনা করা গিয়াছে।

মহাভারতের বনপর্বে মার্কণ্ডেয়সমস্তা-পর্বাধ্যায় সত্যভামাকে পাওয়া যায়। ঐ পর্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত; মহাভারতের বনপর্বের সমালোচনাকালে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। এখানে দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদ বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্বাধ্যায় আছে, তাহাও প্রক্ষিপ্ত। মহাভারতীয় কথার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। উহা স্বামীর প্রতি জীবী কল্পণ আচরণ কর্তব্য, তৎসম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধমাত্র। প্রবন্ধটার লক্ষণ আধুনিক।

তার পর উত্তোগপর্বের সত্যভামাকে দেখিতে পাই—যানসন্ধি-পর্বাধ্যায়। সে স্থানও প্রক্ষিপ্ত, যানসন্ধি-পর্বাধ্যায়ের সমালোচনা কালে দেখাইব। কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বরণ হইয়া উপপ্লব্য নগরে আসিয়াছিলেন—যুদ্ধযাত্রায় সত্যভামাকে সঙ্গে আনিবার

সত্যভামা ছিল না, এবং কৃষ্ণকেও যে সত্যভামা সঙ্গে ছিলেন না, তাহা মহাভারত পড়িলেই জানা যায়। যুদ্ধপর্ব সকলে এবং তৎপরবর্তী পর্ব সকলে কোথাও আর সত্যভামার কথা নাই।

কেবল কৃষ্ণের মানবলীলাসম্বরণের পর, মৌসলপর্বে সত্যভামার নাম আছে। কিন্তু মৌসলপর্বও প্রাক্কিপ্ত, তাহাও পরে দেখাইব।

কলভঃ মহাভারতের যে সকল অংশ নিঃসন্দেহ মৌলিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহার কোথাও সত্যভামার নাম নাই। প্রাক্কিপ্ত অংশ সকলেই আছে। সত্যভামা সম্বন্ধীয় সন্দেহের এই দ্বিতীয় কারণ।

তার পর বিষ্ণুপুরাণ। বিষ্ণুপুরাণে ইহার বিবাহবৃত্তান্ত স্তম্ভস্তক মণির উপাখ্যান-মধ্যে আছে। যে আষাঢ়ে গল্পে কৃষ্ণের সঙ্গে ভল্লুকসুতার পরিণয়, ইহার সঙ্গে পরিণয় সেই আষাঢ়ে গল্পে। তার পর কথিত হইয়াছে যে, এই বিবাহের জন্ত দ্বৈববিশিষ্ট হইয়া শতধৰ্ম্ম সত্যভামার পিতা সত্রাজিতকে মারিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখন বারণাবতে, জতুগৃহ-দাহপ্রবাদ জন্ত পাণ্ডবদিগের অশেষণে গিয়াছিলেন। সেইখানে সত্যভামা তাঁহার নিকট নালিশ করিয়া পাঠাইলেন। কথাটা মিথ্যা। কৃষ্ণ কখন বারণাবতে যান নাই—গেলে মহাভারতে থাকিত। তাহা নাই। এই সকল কথা সন্দেহের তৃতীয় কারণ।

তার পর, বিষ্ণুপুরাণে সত্যভামাকে কেবল পারিজাতহরণবৃত্তান্তে পাই। সেটা অনৈসর্গিক অলীক ব্যাপার; প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনায় তাঁহাকে বিষ্ণুপুরাণে কোথাও পাই না। সন্দেহের এই চতুর্থ কারণ।

মহাভারতে আদিপর্বে সম্ভব-পর্বোধ্যায়ের সপ্তষষ্টি অধ্যায়ের নাম ‘অংশাবতরণ’। মহাভারতের নায়কনায়িকাগণ কে কোন্ দেব দেবী অস্তুর রাক্ষসের অংশে জন্মিয়াছিল, তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে। শেষভাগে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ, বলরাম শেষ নাগের অংশ, প্রহ্লাদ সনৎকুমারের অংশ, দ্রৌপদী শচীর অংশ, কুন্তী ও মাত্রী সিদ্ধি ও ধৃতির অংশ। কৃষ্ণমহিষীগণ সম্বন্ধে লেখা আছে যে, কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী অপ্সরোগণের অংশ এবং রুক্মিণী লক্ষ্মী দেবীর অংশ। আর কোনও কৃষ্ণমহিষীর নাম নাই। সন্দেহের এই পঞ্চম কারণ। সন্দেহের এ কারণ কেবল সত্যভামা সম্বন্ধে নহে। রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের সকল প্রধানা মহিষীদিগের প্রতি বর্ডে। নরকের ষোড়শ সহস্র কন্যার অনৈসর্গিক কথাটা ছাড়িয়া দিলে, রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের আর কোনও মহিষী ছিল না ইহাই মহাভারতের এই অংশের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

করুকদোহিত্য পাব লম্বকে বাহা করিয়াছি, তাহা বাদ দিলে, কর্ম্মী ভিন্ন আর কোনও কর্ম্মহিবীর পুত্র গৌড় কাহাকেও কোন কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা যায় না। কর্ম্মীরাই রাজা হইল—আর কাহারও বংশের কেহ কোথাও রহিল না।

এই সকল কারণে আমার খুব সন্দেহ যে, কৃষ্ণের একাধিক মহিষী ছিল না। এমন হইতেও পারে, ছিল। তখনকার এই রীতিই ছিল। পঞ্চপাণ্ডবের সকলেরই একাধিক মহিষী ছিল। আদর্শ ধার্মিক ভীষ্ম, কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য কাশিরাজের তিনটি কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। একাধিক বিবাহ যে কৃষ্ণের অনভিমত এ কথাটাও কোথাও নাই; আমিও বিচারে কোথাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধিক বিবাহ সকল অবস্থাতেই অধর্ম্ম। ইহা নিশ্চিত বটে যে, সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম্ম। কিন্তু সকল অবস্থাতে নহে। যাহার পত্নী কুষ্ঠগ্রস্ত বা এরূপ রোগ্য যে, সে কোন মতেই সংসারধর্ম্মের সহায়তা করিতে পারে না, তাহার যে দারাস্ত্ররপরিগ্রহ পাপ, এমন কথা আমি বুঝিতে পারি না। যাহার স্ত্রী ধর্ম্মভ্রষ্টা কুলকলঙ্কিনী, সে যে কেন আদালতে না গিয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিবে না, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। আদালতে যে গৌরববৃদ্ধি হয়, তাহার উদাহরণ আমরা সভ্যতার সমাজে দেখিতে পাইতেছি। যাহার উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন, কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা, সে যে কেন দারাস্ত্রর গ্রহণ করিবে না, তা বুঝিতে পারি না। ইউরোপ যিহুদার নিকট শিখিয়াছিল যে, কোন অবস্থাতেই দারাস্ত্রর গ্রহণ করিতে নাই। যদি ইউরোপের এ কুশিক্ষা না হইত, তাহা হইলে, বোনাপার্টিকে জর্মেফাইনের বর্জন রূপ অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত হইতে হইত না; অষ্টম হেনরীকে কথায় কথায় পত্নীহত্যা করিতে হইত না। ইউরোপে আজি কালি সভ্যতার উজ্জ্বললোকে এই কারণে অনেক পত্নীহত্যা, পুত্রহত্যা হইতেছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, বাহাই বিলাতী, তাহাই চমৎকার, পবিত্র, দোষশূন্য, উদ্ধাধ: চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ। আমার বিশ্বাস, আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আমাদের কাছে অনেক শিখিতে পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহতত্ত্ব একটা কথা।

কৃষ্ণ একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোন গণনীয় প্রমাণ নাই, ইহা দেখিয়াছি। যদি করিয়া থাকেন, তবে কেন করিয়াছিলেন, তাহারও কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত নাই। যে যে তাঁহাকে স্ত্রীমন্তক মণি উপহার দিল, সে সঙ্গে সঙ্গে অমনি একটি কন্যা উপহার দিল, ইহা পিতামহীর উপকথা। আর নরকরাজার বোল হাজার মেয়ে, ইহা প্রপিতামহীর উপকথা। আমরা শুনিয়া খুসী—বিশ্বাস করিতে পারি না।

চতুর্থ খণ্ড

ইঙ্গপ্রহ

অকুণ্ঠং সৰ্বকাৰ্য্যেণ ধৰ্মকাৰ্য্যার্থমুত্তমং ।

বৈকুণ্ঠত্ৰ চ বক্রপং তস্মৈ কাৰ্য্যায়ান্নে নমঃ ॥

শান্তিপৰ্ব্বণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্রৌপদীস্বয়ংবর

মহাভারতে কৃষ্ণকথা যাহা আছে, তাহার কোন অংশ মৌলিক এবং বিশ্বাসযোগ্য, তাহার নির্বাচন ভ্রাতৃ প্রথম খণ্ডে যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, এক্ষণে আমি পাঠকে সেই সকল স্বরণ করিতে অনুরোধ করি।

মহাভারতে কৃষ্ণকে প্রথম দ্রৌপদীস্বয়ংবরে দেখিতে পাই। আমার বিবেচনায় এই অংশের মৌলিকতায় সন্দেহান হইবার কারণ নাই। লাসেন্ সাহেব, দ্রৌপদীকে পাঞ্চালের পঞ্চ জাতির একীকরণস্বরূপ পাঞ্চালী বলিয়া, দ্রৌপদীর মানবী উড়াইয়া দিয়াছেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। আমিও বিশ্বাস করি না যে, যজ্ঞের অগ্নি হইতে দ্রুপদ কন্যা পাইয়াছিলেন, অথবা সেই কন্যার পাঁচটি স্বামী ছিল। তবে দ্রুপদের ঔরসকন্যা থাকা অসম্ভব নহে, এবং তাহার স্বয়ংবর বিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই স্বয়ংবরে অর্জুন লক্ষ্যবেধ করিয়াছিলেন, ইহা অবিদ্বাস করিবারও কারণ নাই। তার পর, তাঁহার পাঁচ স্বামী হইয়াছিল, কি এক স্বামী হইয়াছিল, সে কথার মীমাংসায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।*

কৃষ্ণকে মহাভারতে প্রথম দ্রৌপদীস্বয়ংবরে দেখি। সেখানে তাঁহার দেবকি কিছুই সূচিত হয় নাই। অশ্বাত্ত ক্ষত্রিয়দিগের স্থায় তিনি ও অশ্বাত্ত যাদবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া পাঞ্চালে আসিয়াছিলেন। তবে অশ্বাত্ত ক্ষত্রিয়েরা দ্রৌপদীর আকাজক্ষায় লক্ষ্যবেধে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু যাদবেরা কেহই সে চেষ্টা করে নাই।

পাণ্ডবেরা এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রিত হইয়া নহে। দ্রুপদ্যধন তাঁহাদিগের প্রাণহানি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মরক্ষার্থে ছদ্মবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক্ষণে দ্রৌপদীস্বয়ংবরের কথা শুনিয়া ছদ্মবেশে এখানে উপস্থিত।

* পূর্বে বলিয়াছি যে, মহাভারতের পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, অশ্বক্রমণিকাধ্যায়ে দ্ব্যাদশ ১৫০ সোকে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রচিত করিয়াছেন। ঐ অশ্বক্রমণিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণে দ্রৌপদীস্বয়ংবরের কথা আছে, কিন্তু পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, এমন কথা নাই। অর্জুনই তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, এই কথাই আছে।

সংস্কৃত ভাষায় কথ্যঃ ভক্তঃ স্বয়ংবরাদ্।

আপ্তবানর্জুনঃ কৃষ্ণাং কৃষ্ণাং স্বয়ংবরাদ্। ১২৫।*

এই সমবেত ব্রাহ্মণ-কৃত্তির-মণ্ডল মধ্যে কেবল কৃষ্ণই ছদ্মবেশবৃত্ত পাণ্ডবদিগকে চিনিয়াছিলেন। ইহা যে তিনি দৈবশক্তির প্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন, এমন ইঙ্গিত মাত্র নাই। মনুষ্যবুদ্ধিতেই তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার উক্তিভেদে ইহা প্রকাশ। তিনি বলদেবকে বলিতেছেন, “মহাশয়। যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জুন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃদ্ধ উৎপাটনপূর্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইহার নাম বৃকোদর।” ইত্যাদি। ইহার পরে সাক্ষাৎ হইলে যখন তাঁহাকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কি প্রকারে তুমি আমাদের গণকে চিনিলে?” তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “ভ্রাম্মাচ্ছাদিত বহিঃ কি লুকান থাকে?” পাণ্ডবদিগকে সেই ছদ্মবেশে চিনিতে পারা অতি কঠিন; আর কেহ যে চিনিতে পারে নাই, তাহা বিশ্বাস্যকর নহে; কৃষ্ণ যে চিনিতে পারিয়াছিলেন—স্বাভাবিক মানুষ্যবুদ্ধিতেই চিনিয়াছিলেন—ইহাতে কেবল ইহাই বুঝায় যে, অস্বাভাবিক মনুষ্যপেক্ষা তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন। মহাভারতকার এ কথাটা কোথাও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই; কিন্তু কৃষ্ণের কার্যে সর্বত্র দেখিতে পাই যে, তিনি মনুষ্যবুদ্ধিতে কার্য করেন বটে, কিন্তু তিনি সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনুষ্য। এই বুদ্ধিতে কোথাও ছিদ্র দেখা যায় না। অস্বাভাবিক বৃত্তির জ্ঞায় তিনি বুদ্ধিতেও আদর্শ মনুষ্য।

অনন্তর অর্জুন লক্ষ্য বিধিলে সমাগত রাজাদিগের সঙ্গে তাঁহার বড় বিবাদ বাধিল। অর্জুন ভিক্ষুকব্রাহ্মণবেশধারী। এক জন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বড় বড় রাজাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইবে, ইহা তাঁহাদিগের সহ্য হইল না। তাঁহার অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। যত দূর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে অর্জুনই জয়ী হইয়াছিলেন। এই বিবাদ কৃষ্ণের কথায় নিবারণ হইয়াছিল। মহাভারতে এইটুকু কৃষ্ণের প্রথম কাজ। তিনি কি প্রকারে বিবাদ মিটাইয়াছিলেন, সেই কথাটা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিবাদ মিটাইবার অনেক উপায় ছিল। তিনি নিজে বিখ্যাত বীরপুরুষ, এবং বলদেব, সাত্যাকি প্রভৃতি অধিষ্ঠায় বীরেরা তাঁহার সহায় ছিল। অর্জুন তাঁহার আশ্রয়—পিতৃদ্বসার পুত্র। তিনি যাদবদিগকে লইয়া সমরক্ষেত্রে অর্জুনের সাহায্যে নামিলে, তখনই বিবাদ মিটিয়া যাইতে পারিত। ভীম তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ আদর্শ ধার্মিক, যাহা বিনা যুদ্ধে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্ত তিনি কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন নাই। মহাভারতের কোন স্থানেই ইহা নাই যে, কৃষ্ণ ধর্মার্থ ভিন্ন অন্য কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম

অর্থ্য : আমরা বালালি জাতি, আজি সাত শত বৎসর সেই অর্থ্যের কলভোগ করিতেছি। কৃষ্ণ কখনও অস্ত্র কারণে যুদ্ধ করেন নাই। আর ধর্মস্থাপনজন্য তাঁহার যুদ্ধে আপত্তি ছিল না। যেখানে যুদ্ধ ভিন্ন ধর্মের উন্নতি নাই, সেখানেও যুদ্ধ না করাই অর্থ্য। কেবল কাশীরাম দাস বা কথকঠাকুরদের কথিত মহাভারতে বাঁহাদের অধিকার, তাঁহাদের বিশ্বাস, কৃষ্ণই সকল যুদ্ধের মূল; কিন্তু মূল মহাভারত বুদ্ধিপূর্বক পড়িলে একরূপ বিশ্বাস থাকে না। তখন বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্মার্থ ভিন্ন কৃষ্ণ কখনও কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেন নাই। নিজেও ধর্মার্থ ভিন্ন যুদ্ধ করেন নাই।

এখানেও কৃষ্ণ যুদ্ধের কথা মনেও আনিলেন না। তিনি বিবদমান ভূপালবন্দকে বলিলেন, “ভূপালবন্দ। ইহারাই রাজকুমারীকে ধর্মতঃ লাভ করিয়াছিলেন, তোমরা কাস্ত্র হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।” “ধর্মতঃ”। ধর্মের কথাটা ত এতক্ষণ কাহারও মনে পড়ে নাই। সেকালের অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ধর্মভীত ছিলেন, রুচিপূর্বক কখন অর্থ্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু এ সময়ে রাগাঙ্ক হইয়া ধর্মের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত ধর্মাত্মা, ধর্মবুদ্ধিই বাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, তিনি এ বিষয়ের ধর্ম কোন্ পক্ষে তাহা ভুলেন নাই। ধর্মবিশ্বাসদিগের ধর্মস্বরণ করিয়া দেওয়া, ধর্মানভিহীনদিগকে ধর্ম বুঝাইয়া দেওয়াই, তাঁহার কাজ।

ভূপালবন্দকে কৃষ্ণ বলিলেন, “ইহারাই রাজকুমারীকে ধর্মতঃ লাভ করিয়াছেন, অতএব আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।” শুনিয়া রাজারা নিরস্ত হইলেন। যুদ্ধ ফুরাইল। পাণ্ডবেরা আশ্রমে গেলেন।

একণে ইহা বুঝা যায় যে, যদি এক জন বাজে লোক দৃষ্ট রাজগণকে ধর্মের কথাটা স্মরণ করিয়া দিত, তাহা হইলে দৃষ্ট রাজগণ কখনও যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেন না। যিনি ধর্মের কথাটা স্মরণ করিয়া দিলেন, তিনি মহাবলশালী এবং গৌরবান্বিত। তিনি জ্ঞান, ধর্ম, ও বাহুবলে সকলের প্রধান হইয়াছিলেন। সকল বৃত্তিগুলিই সম্পূর্ণরূপে অমূল্যীকৃত করিয়াছিলেন, তাহারই ফল এই প্রাধাত্য। সকল বৃত্তিগুলি অমূল্যীকৃত না হইলে, কেহই তাদৃশ ফলদায়িনী হয় না। এইরূপ কৃষ্ণচরিত্রের দ্বারা ধর্মতত্ত্ব পরিষ্কৃত হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ

অর্জুন লক্ষ্য বিধিয়া, রাজগণের সহিত যুদ্ধ সমাপন করিয়া আত্মগণ সমভিত্তিকারি
আশ্রমে গমন করিলেন। রাজগণও স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের
কি করা কর্তব্য ছিল? দ্রোণদীর স্বয়ংের ফুরাইল, উৎসব বাহা ছিল তাহা ফুরাইল,
কৃষ্ণের পাঞ্চালে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষণে স্বস্থানে ফিরিয়া
গেলেই হইত। অস্ত্রাশ্রয় রাজগণ তাহাই করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাহা না করিয়া, বলদেবকে
সঙ্গে লইয়া, যেখানে ভার্গবকর্মশালায় ভিক্ষুকবেশধারী পাণ্ডবগণ বাস করিতেছিলেন,
সেইখানে গিয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

সেখানে তাঁহার কিছু কাজ ছিল না—যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁহার পূর্বে কখন সাক্ষাৎ
বা আলাপ ছিল না, কেন না মহাত্মারতকার লিখিয়াছেন যে, “বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট
অভিগমন ও চরণবন্দন পূর্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।” বলদেবও ঐরূপ
করিলেন। যখন আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইল, তখন অবশ্য ইহা ব্রূজিতে হইবে
যে, পূর্বে পরস্পরের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কৃষ্ণ-পাণ্ডবে এই
প্রথম সাক্ষাৎ। কেবল পিতৃহসার পুত্র বলিয়াই কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া লইয়া তাঁহাদিগের
সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কাজটা সাধারণ-লৌকিক-ব্যবহার-অমুমোদিত হয় নাই।
লোকের প্রথা আছে বটে যে, পিসিত বা মাসিত ভাই যদি একটা রাজা বা বড়লোক
হয়, তবে উপযাচক হইয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আইসে। কিন্তু পাণ্ডবেরা তখন
সামান্ত ভিক্ষুক মাত্র; তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃষ্ণের কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হওয়ার
সম্ভাবনা ছিল না। আলাপ করিয়া কৃষ্ণও যে কোন লৌকিক অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, এমন
দেখা যায় না। তিনি কেবল বিনয়পূর্বক যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সদালাপ করিয়া তাঁহার মঙ্গল-
কামনা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং তার পর পাণ্ডবদিগের বিবাহসমাপ্তি পর্য্যন্ত
পাঞ্চালে আপন শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিবাহ সমাপ্ত হইয়া গেলে, তিনি
“কৃতদার পাণ্ডবদিগের যৌতুক স্বরূপ বিচিত্র বৈদূর্য্য মণি, সুবর্ণের আভরণ, নানা দেশীয়
মহার্ঘ্য বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবন্দ,
উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রত্নত কাকন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ

করিলেন না। এ সকল পাণ্ডবদিগের তখন ছিল না; কেননা তখন তাঁহার ভিত্তিক এক ছরবহাণের। অথচ এ সকলে তখন তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন; কেন না তাঁহারা রাজ্য-কর্তার পানিত্রহণ করিয়া পৃথী হইয়াছেন। সুতরাং যুধিষ্ঠির “কৃষ্ণপ্রেরিত কৃষ্ণসামগ্রী সকল আত্মদান পূর্বক গ্রহণ করিলেন।” কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদিগের সঙ্গে আর সাফাং না করিয়া বহুদানে গমন করিলেন। তার পর তিনি পাণ্ডবদিগকে আর ঘোঁষেন নাই। পাণ্ডবেরা রাজ্যার্থ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে নগরনির্মাণপূর্বক বাস করিতে লাগিলেন। যে প্রকারে পুনরায় পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার মিলন হইল, তাহা পরে বলিব।

বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ নিঃস্বার্থ আচরণ করিতেন, যিনি ছরবহাণে-মাত্রেরই হিতাহুসন্ধান করা নিজ জীবনের ব্রতস্বরূপ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মূর্খেরা এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ সেই কৃষ্ণকে কুক্ষ্মাহুরত, ছরভিসন্ধিযুক্ত, ক্রুর এবং পাপাচারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ভাষ্যের বিশ্লেষণের শক্তি বা তাহাতে প্রজ্ঞা এবং যত্ন না থাকিলে, এইরূপ ঘটাই সম্ভব। খুল কথা এই, যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার অস্বাভাবিক সঙ্কল্পিত শ্রায় প্রীতিবৃত্তিও পূর্ণবিকশিত ও ক্ষুণ্ণপ্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব। ক্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের প্রতি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা অনেকেরই পূর্ববন্ধিত সখ্যস্থলে করা সম্ভব। যুধিষ্ঠির কুটূষ; যদি কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্ব হইতে তাঁহার আলাপ প্রণয় এবং আত্মীয়তা থাকিত, তাহা হইলে তিনি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা কেবল ভদ্রজনোচিত বলিয়াই ক্রান্ত হইতে পারিতাম— বেশী বলিবার অধিকার থাকিত না। কিন্তু যিনি অপরিচিত এবং দরিদ্র ও হীনাবস্থাপন্ন কুটূষকে খুঁজিয়া লইয়া, আপনার কার্য্য ক্ষতি করিয়া, তাহার উপকার করেন, তাঁহার প্রীতি আদর্শ প্রীতি। কৃষ্ণের এই কার্য্যটি ক্ষুদ্র কার্য্য বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেই মনুষ্যের চরিত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একটা মহৎ কার্য্য বদ্মায়েসেও চেষ্টাচরিত্র করিয়া করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু যাহার ছোট কাজগুলিও ধর্ম্মাত্মতার পরিচায়ক, তিনি যথার্থ ধর্ম্মাত্মা। তাই, আমরা মহাভারতের আলোচনায় * কৃষ্ণকৃত ছোট বড় সকল কার্য্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা এ প্রণালীতে কখন কৃষ্ণকে বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। তাহা না করিয়া কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে কেবল “অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” এই কথাটি শিখিয়া রাখিয়াছি। অর্থাৎ যাহা সত্য এবং ঐতিহাসিক, তাহার কোন অহুসন্ধান না করিয়া, যাহা মিথ্যা এবং কল্পিত, তাহারই উপর

* হরিবংশ ও পুরাণ সকলে বিবাসবোধ্য কথা পাওয়া যায় না বলিয়া পূর্বে ইহা পারি নাই।

নির্ভর করিয়া আছি। “অথখামা হত ইতি গজঃ” * কথার ব্যাপারটা যে বিষয়, তাহা জ্যোতিষ-পৰ্ব্বাধ্যায় সমালোচনাকালে আমরা প্রমীলিত করিব।

এই বৈবাহিক পৰ্বে কৃষ্ণ সঙ্কে একটি বড় ভাষার কথা ব্যাসোক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহা আমাদের সমালোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত না হইলেও, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যিক বিবেচনা করিলাম। জ্ঞপদরাজ, কচ্ছার পঞ্চাশী হইবে শুনিয়া তাহাতে আপত্তি করিতেছেন। ব্যাস তাহার আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। খণ্ডনোপলক্ষে তিনি জ্ঞপদকে একটি উপাখ্যান শ্রবণ করান। উপস্থাসটি বড় অদ্ভুত ব্যাপার। উহার মূল তাৎপৰ্য্য এই যে, ইন্দ্র একদা গঙ্গাজলে একটি রৌদ্রমণ্ডা স্নান করিয়া উঠিয়া আসেন। সে ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিল যে, এক যুবক এক যুবতীর সঙ্গে পাশক্ৰীড়া করিতেছে। তাহারা ইন্দ্রের যথোচিত সম্মান না করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু যে যুবক পাশক্ৰীড়া করিতেছিলেন, তিনি অয়ং মহাদেব। ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তিনিও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে এক গর্ভের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। ইন্দ্র গর্ভের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে তাহার মত আর চারিটি ইন্দ্র আছেন। শেষ মহাদেব পাঁচ জন ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, “তোমরা গিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য হও।” সেই ইন্দ্রেরাই আবার মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, “ইন্দ্রাদি পঞ্চদেব গিয়া আমাদের কোন মানুষের গর্ভে উৎপন্ন করুন”।।। সেই পাঁচ জন ইন্দ্র ইন্দ্রাদির ঔরসে পঞ্চপাণ্ডব হইলেন। বিনাপরাধে মেয়েটাকে মহাদেব ছকুম দিলেন যে, “তুমি গিয়া ইহাদিগের পত্নী হও।” সে জ্যোতিষী হইল। সে যে কেন কাঁদিয়াছিল, তাহার আর কোন খবরই নাই। অধিকতর রহস্যের বিষয় এই যে, নারায়ণ এই কথা শুনিবামাত্রই আপনার মাথা হইতে দুই গাছি চুল উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। এক গাছি কাঁচা, এক গাছি পাকা। পাকা-গাছটি বলরাম হইলেন, কাঁচা-গাছটি কৃষ্ণ হইলেন।।।

বুদ্ধিমান পাঠককে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে, এই উপাখ্যানটি, আমরা যাহাকে মহাভারতের তৃতীয় স্তর বলিয়াছি, তদন্তর্গত। অর্থাৎ ইহা মূল মহাভারতের কোন অংশ নহে। প্রথমতঃ, উপাখ্যানটির রচনা এবং গঠন এখনকার বাঙ্গালার সর্বনিম্নশ্রেণীর উপস্থাসলেখকদিগের প্রণীত উপস্থাসের রচনা ও গঠন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রতিভাশালী কবিগণ এরূপ উপাখ্যানসৃষ্টির মহাপাপে পাপী হইতে

* পরে দেখিব, “অথখামা হত ইতি গজঃ” এই বুলিটাই মহাভারতে নাই। ইহা কলকাতার সংস্কৃত।

পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতের অন্ত্যস্ত অংশের সঙ্গে ইহার কোন প্রয়োজনীয় সংযোগ নাই। এই উপাখ্যানটির সমুদায় অংশ উঠাইয়া দিলে, মহাভারতের কোন কথাই অক্ষত, অথবা কোন প্রয়োজনই অক্ষত থাকিবে না। প্রথমরাজের আশঙ্কিতজনক ইহার কোন প্রয়োজন নাই; কেন না, ঐ আশঙ্কিত ব্যাসোক্ত দ্বিতীয় একটি উপাখ্যানের দ্বারা খণ্ডিত হইরাছে। দ্বিতীয় উপাখ্যান ঐ অধ্যায়েই আছে। তাহা সংক্ষিপ্ত এবং সরল, এবং আদিম মহাভারতের অন্তর্গত হইলে হইতে পারে। প্রথমোক্ত উপাখ্যানটি ইহার বিরোধী। দুইটিতে জৌপদীর পূর্বজন্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচয় আছে। সুতরাং একটি যে প্রক্ষিপ্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং যাহা উপরে বলিয়াছি, তাহাতে প্রথমোক্ত উপাখ্যানটিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, এই প্রথমোক্ত উপাখ্যান মহাভারতের অন্ত্যস্ত অংশের বিরোধী। মহাভারতের সর্বত্রই কথিত আছে, ইন্দ্র এক। এখানে ইন্দ্র পাঁচ। মহাভারতের সর্বত্রই কথিত আছে যে, পাণ্ডবেরা ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদিগের ঔরসপুত্র মাত্র। এখানে সকলেই এক এক জন ইন্দ্র। এই বিরোধের সামঞ্জস্যের জন্য উপাখ্যানরচনাকারী গদ্ভ লিখিয়াছেন যে, ইন্দ্রেরা মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, “ইন্দ্রাদিই আসিয়া আমাদিগকে মাহুঘীর গর্ভে উৎপন্ন করুন।” জগদ্বিজয়ী গ্রন্থ মহাভারত এরূপ গদ্ভের লেখনীপ্রসূত নহে, উহা নিশ্চিত।

এই অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটির এ স্থলে উল্লেখ করার আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমরা মহাভারতের তিনটি স্তর ভাগ করিতেছি ও করিব, তাহা উদাহরণের দ্বারা পাঠককে বুঝাই। তা ছাড়া একটা ঐতিহাসিক তত্ত্বও ইহা দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয়। যে বিষ্ণু, বেদে সূর্যের মূর্তি বিশেষ মাত্র, পুরাণেতিহাসের উচ্চস্তরে যিনি সর্বব্যাপক ঈশ্বর, তিনি কি প্রকারে পরবর্তী হতভাগ্য লেখকদিগের হস্তে দাড়ি, গোঁপ, কাঁচা চুল, পাকা চুল প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বারা তাহা বুঝা যায়। এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানে হিন্দুধর্মের অবনতির ইতিহাস পড়িতে পাই। তাই এই স্থানে ইহার উল্লেখ করিলাম। কোন কৃষ্ণদেবী শৈব দ্বারা এই উপাখ্যান রচিত হইয়া মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এমন বিবেচনাও করা যাইতে পারে। কেন না, এখানে মহাদেবই সর্বনিয়ন্তা এবং কৃষ্ণ নারায়ণের একটি কেশ মাত্র। মহাভারতের আলোচনায় কৃষ্ণবাদী এবং শৈবদিগের মধ্যে এইরূপ অনেক বিবাদের চিহ্ন দেখিতে পাই। এবং যে সকল অংশে সে চিহ্ন পাই, তাহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ করিবার কারণ পাই। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তবে ইহাই উপলক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই বিবাদ

অসিদ্ধ মহাভারত প্রচারের অনেক পূর্বে উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যখন শিবোপাসনা ও কৃষ্ণোপাসনা উভয়েই প্রবল হয়, তখন বিবাহও যৌনতর হইয়াছিল। মহাভারতপ্রচারের সময়ে বা তাহার পরবর্তী প্রথম কালে এতদ্বয়ের মধ্যে কোন উপাসনাই প্রবল ছিল না। সেই সময়টা বেলের দেবতার প্রবলতার সময়। যত উভয়েই প্রবল হইল, তত বিবাহ বাড়িল—তত মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই অস্তিত্বই মহাভারতের লোহাই দিয়া আপনার দেবতাকে বড় করেন। এই জন্য শৈবেরা শিবমাহাত্ম্য-সূচক রচনা সকল মহাভারতে প্রসিক্ত করিতে লাগিলেন।* তদুত্তরে বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু বা কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচক সেইরূপ রচনা সকল গুঞ্জিয়া দিতে লাগিলেন। অমুশাসন-পূর্বে এই কথার কতকগুলি উদ্ভট উদাহরণ পাওয়া যায়। ইচ্ছা করিলে, পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। প্রায় সকলগুলিতেই একটু একটু গর্দভের গাত্রসৌরভ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুভদ্রাহরণ

জৌপদীস্বয়ংবরের পর, সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। সুভদ্রার বিবাহে কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিজ্ঞেরা তাহা বড় পছন্দ করিবেন না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের উপর, একটা জগদীশ্বরের নীতিশাস্ত্র আছে—তাহা সকল শতাব্দীতে, সকল দেশে খাটিয়া থাকে। কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সেই চিরস্থায়ী অশ্রান্ত জাগতিক নীতির দ্বারাই পরীক্ষা করিব। এ দেশে অনেকেই এককবারি গজের মাংসে লাঞ্ছনাজ বা জোত জমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; জমীদারেরা এখনকার ছোট সরকারি গজে মাগিয়া তাহাদিগের অনেক ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে। তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ছোট মাংসকাটি হইয়াছে, তাহার জ্বালায় আমরা ঐতিহাসিক পৈতৃক সম্পত্তি সকলই হারাইতেছি, ইহা অনেকবার বলিয়াছি। আমরা এক্ষণে সেই এককবারি গজ চালাইব।

কৃষ্ণভক্তেরা বলিতে পারেন, এরূপ একটা বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে, স্থির কর যে, এই সুভদ্রাহরণবৃত্তান্ত মূল মহাভারতের অন্তর্গত কি প্রসিক্ত। যদি ইহা প্রসিক্ত

* সেইগুলি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম প্রকৃতি পান্ডবের পশ্চিমগণ কৃষ্ণকে শৈব বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এবং আধুনিক বলিয়া বোধ করিবার কোন কারণ থাকে, তবে সেই কথা বলিলেই সব গোল মিটিল—এক বাণাড়বরের প্রয়োজন নাই। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য যে, সুভদ্রাহরণ যে মূল মহাভারতের অংশ, ইহা যে প্রথম স্তরের অন্তর্গত, তাহাও আমাদের কোন সংশয় নাই। ইহার প্রসঙ্গ অল্পক্রমশিকাধ্যায়ে এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে আছে। ইহার রচনা অতি উচ্চশ্রেণীর কবির রচনা। দ্বিতীয় স্তরের রচনাও সচরাচর অতি সুন্দর। তবে প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তরে রচনাগত একটা প্রভেদ এই যে, প্রথম স্তরের রচনা সরল ও স্বাভাবিক, দ্বিতীয় স্তরের রচনায় অলঙ্কার ও অত্যাতিরিক্ত বড় বাহুল্য। সুভদ্রাহরণের রচনাও সরল ও স্বাভাবিক, অলঙ্কার ও অত্যাতিরিক্ত তেমন বাহুল্য নাই। সুভদ্রা ইহা প্রথমস্তর-পদ—দ্বিতীয় স্তরের নহে। আর আসল কথা এই যে, সুভদ্রাহরণ মহাভারত হইতে তুলিয়া লইলে, মহাভারত অসম্পূর্ণ হয়। সুভদ্রা হইতে অভিমত্যা, অভিমত্যা হইতে পরিক্ষিৎ, পরিক্ষিৎ হইতে জনমেজয়। ভদ্রার্জুনের বংশই বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে সাম্রাজ্য শাসিত করিয়াছিল—জৌপদীর বংশ নহে। বরং জৌপদীস্বয়ংবর বাদ দেওয়া যায়, তবু সুভদ্রা নয়।

জৌপদীর স্থায় সুভদ্রাকেও সাহেবেরা উড়াইয়া দিয়াছেন। লাসেন্ বলেন,—যাদবসম্প্রদীরূপ যে মঙ্গল, তাহাই সুভদ্রা। বেবর সাহেবের আপত্তি ইহার অপেক্ষা গুরুতর। তিনি কেন কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার মানবীক অস্বীকৃত করেন, তজ্জন্ত যজুর্বেদের মাধ্যানিনীশাখা ২৩ অধ্যায়ের ১৮ কণ্ডিকার ৪র্থ মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিতে হইতেছে।

“হে অশ্ব! হে অধিকে! হে অশ্বালিকে! দেখ, এই অশ্ব এক্ষণে চিরকালের জন্ত নিযুক্ত হইয়াছে, আমি কাম্পিলবাসিনী সুভদ্রা হইয়াও অশ্ব ইহার সমীপে (পতিত্বের বরণ করণার্থ) সমাগত হইয়াছি, এ বিষয়ে আমাকে কেহই নিম্নোগ করে নাই।” *

ইহাতে বেবর সাহেব সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—

“Kampila is a town in the country of the Panchalas. Subhadra, therefore, would seem to be the wife of the King of that district.” &c.

সায়নাচার্য্য কাম্পিলবাসিনীর এইরূপ অর্থ করেন—“কাম্পিলশব্দেই প্লাবো বস্ত্রবিশেষ উচ্যতে।” কিন্তু বেবর সাহেবের বিশ্বাস যে, তিনি সায়নাচার্য্যের অপেক্ষা সংস্কৃত বুঝেন ভাল, অতএব তিনি এ ব্যাখ্যা গ্রাহ্য করেন না। তাহা না-ই করুন, কিন্তু কাম্পিলবাসিনী কোন জ্ঞীর নাম সুভদ্রা ছিল বলিয়া কৃষ্ণভগিনীর নাম কেন সুভদ্রা হইতে

* শ্রীমদ্ মহাভারত সায়নব্রহ্মী কৃত অনুবাদ।

পাঠের দায়িত্ব বৃদ্ধিতে পারিলাম না। সে রাতেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করান, উহারই স্মৃতিরূপে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, উহারকেই বলিতে হইবে, “আমি কাশিরাজ্যবাসিনী সুভদ্রা।” অতএব নামকরণী মহাপুত্র এই অর্থ করেন,—কল্যাণী স্বর্গ্য সৌভাগ্যবর্তী। অধীশ্বর বলেন,—কাশিরাজ্যবাসী মহিলাগণ অতিশয় রূপলাবণ্যবর্তী। অতএব এই মন্ত্রের অর্থ এই যে, “আমি সৌভাগ্যবর্তী ও রূপলাবণ্যবর্তী হইয়াও এই মন্ত্রের নিকট সমাগত হইয়াছি।” অতএব বৃদ্ধিতে পারি না যে, এই মন্ত্রের বলে কৃষ্ণভগিনী অর্জুনপত্নী সুভদ্রার পরিবর্তে কেন এক জন পাকালী সুভদ্রাকে কল্পনা করিতে হইবে। বৃদ্ধির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বহুপূর্ববর্তী রাজগণও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহাই মহাভারতে এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। অতএব ইহাই সম্ভব যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের এই যজুর্মন্ত্র কৃষ্ণ-পাণ্ডবের অপেক্ষা প্রাচীন। এখন যেমন লোকে আধুনিক লেখকদিগের কাব্যগ্রন্থ হইতে পুত্রকন্যার নামকরণ করিতেছে, * তেমনি সেকালেও বেদ হইতে লোকের পুত্রকন্যার নাম রাখা অসম্ভব নহে। এই মন্ত্র হইতেই কাশিরাজ্ঞ আপনার তিনটি কন্যার নাম অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা রাখিয়া থাকিবেন, এবং এইরূপেই কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রারও নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই মন্ত্রে এমন কিছু দেখি না যে, তজ্জন্ম কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা কেহ ছিলেন না, এমন কথা অনুমান করা যায়। অতএব আমরা সুভদ্রাহরণের বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

একণে, সুভদ্রাহরণের নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে পাঠকের নিকট একটা অনুরোধ আছে। তিনি কাশীদাসের গ্রন্থে অথবা কথকের নিকট, অথবা পিতামহীর মুখে, অথবা বাঙ্গালা নাটকাদিতে যে সুভদ্রাহরণ পড়িয়াছেন বা শুনিয়াছেন, তাহা অম্লগ্রহপূর্বক ভুলিয়া যাউন। অর্জুনকে দেখিয়া সুভদ্রা অনঙ্গশরে ব্যথিত হইয়া উন্মত্ত হইলেন, সত্যভামা মধ্যবর্তিনী দূতী হইলেন, অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে যাদবসেনার সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হইল, সুভদ্রা তাঁহার সারথি হইয়া গগনমার্গে তাঁহার রথ চালাইতে লাগিলেন—সে সকল কথা ভুলিয়া যান। এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে, কিন্তু মূল মহাভারতে ইহার কিছুই নাই। ইহা কাশীরাম দাসের গ্রন্থেই প্রথম দেখিতে পাই, কিন্তু এ সকল তাঁহার সৃষ্টি কি তাঁহার পরবর্তী কথকদিগের সৃষ্টি, তাহা বলা যায় না। সংস্কৃত মহাভারতে যে প্রকার সুভদ্রাহরণ কথিত হইয়াছে, তাহার স্থূলমর্শ্ব বলিতেছি।

সৌপারীস কিনারের পর পাড়েরা ইচ্ছা করে মুখে রাখা করিতেছিলেন। কোন কারণে অর্জুন বাসন বসেবের ভয় উপস্থাপ্য পরিত্যাগপূর্বক বিবেকে ভ্রমণ করেন। অত্যন্ত বেশগব্যটানন্তর শেষে তিনি দ্বারকার উপস্থিত হইলেন। তথার দ্বারবেরা তাঁহার বিশেষ সমাদর ও সংকার করেন। অর্জুন কিছু দিন সেখানে অবস্থিতি করেন। একদা দ্বারবেরা রৈবতক পর্বতে একটি মহান উৎসব আয়ত্ত করেন। সেখানে যত্নবীরেরা ও যত্নকুলানাগণ সকলেই উপস্থিত হইয়া আশোদ আজ্ঞাদ করেন। অত্যন্ত জীলোকদিগের মধ্যে সুভদ্রা উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুমারী ও বালিকা। অর্জুন তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া অর্জুনকে বলিলেন, “সখে! বনচর হইয়াও অনঙ্গশরে চকল হইলে?” অর্জুন অপরাধ স্বীকার করিয়া, সুভদ্রা যাহাতে তাঁহার মহিবী হন, তদ্বিধে কৃষ্ণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহা এই :—

“হে অর্জুন! স্বয়ংবরই কজিরদিগের বিধেয়, কিন্তু জীলোকের প্রবৃত্তি কথা কিছুই বলা যায় না, সুতরাং তদ্বিধে আমার সংশয় জন্মিতেছে। আর ধর্মশাস্ত্রকারেরা কহেন, বিবাহোদ্দেশে বলপূর্বক হরণ করাও মহাবীর কজিরদিগের প্রশংসনীয়। অতএব স্বয়ংবরকাল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ, স্বয়ংবরকালে সে কাহার প্রতি অহরক্ত হইবে, কে বলিতে পারে?”

এই পরামর্শের অনুবর্তী হইয়া অর্জুন প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির ও কুস্তীর অনুমতি আনিতে দূত প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগের অনুমতি পাইলে, একদা, সুভদ্রা যখন রৈবতক পর্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া রথে তুলিয়া অর্জুন গ্রহণ করিলেন।

এখন, আজিকালিকার দিনে যদি কেহ বিবাহোদ্দেশে কাহারও মেয়ে বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া গ্রহণ করে, তবে সে সমাজে নিন্দিত এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। এবং এখনকার দিনে কেহ যদি অপর কাহাকে বলে, “মহাশয়! যখন আমার ভগিনীকে বিবাহ করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আপনি উহাকে কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করুন, ইহাই আমার পরামর্শ,” তবে সে ব্যক্তিও জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব প্রচলিত নীতিশাস্ত্রানুসারে (সে নীতিশাস্ত্রের কিছুমাত্র দোষ দিতেছি না,) কৃষ্ণাৰ্জুন উভয়েই অতিশয় নিন্দনীয় কার্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া কৃষ্ণকে বাড়ান যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে সুভদ্রাহরণ-পর্বাধ্যায় প্রস্তুত বলিয়া, কিংবা এমনই একটি কিছু জুয়াচুরি করিয়া, এ কথাটা বাদ দিয়া

যাইকাম। কিন্তু সে সকল পথ আমার অবলম্বনীয় নহে। সত্য ভিন্ন মিথ্যা প্রশংসায়, কাহারও মহিমা বাড়িতে পারে না এবং ধর্মের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হয় না।

কিন্তু কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কাহারও মেয়ে কাড়িয়া লইয়া বিয়া বিবাহ করিলে, সেটা দোষ বলিয়া গণিতে হয় কেন? জিন কামণে। প্রথমতঃ অপরূপ কন্ডার উপর অত্যাচার হয়। দ্বিতীয়তঃ, কন্ডার নিজ মাঝা ও বহুবর্ণের উপর অত্যাচার। তৃতীয়তঃ, সমাজের উপর অত্যাচার। সমাজের কায় মূলমন্ত্র এই যে, কেহ কাহারও উপর অর্থাৎ বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে না। কেহ কাহারও উপর অর্থাৎ বলপ্রয়োগ করিলেই সমাজের স্থিতির উপর আঘাত করা হইল। বিবাহাধিকৃত কন্ডা-হরণকে নিশ্চল কার্য্য বিবেচনা করিবার এই তিনটি গুরুতর কারণ বটে, কিন্তু তন্নিমিত্ত আর চতুর্থ কারণ কিছু নাই।

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণের এই কাজে এই তিন জনের মধ্যে কে কত দূর অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, অপরূপ কন্ডার উপর কত দূর অত্যাচার হইয়াছিল দেখা যাক। কৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বংশের শ্রেষ্ঠ। যাহাতে সুভদ্রার সর্বতোভাবে মঙ্গল হয়, তাহাই তাঁহার কর্তব্য—তাহাই তাঁহার ধর্ম—উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তাঁহার “Duty”। এখন জীলোকের পক্ষে প্রধান মঙ্গল—সর্বদায়ী মঙ্গল বলিলেও হয়—সংপাত্রস্থা হওয়া। অতএব সুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের প্রধান “ডিউটি”—তিনি যাহাতে সংপাত্রস্থা হয়েন, তাহাই করা। এখন, অর্জুনের জ্ঞায় সংপাত্র কৃষ্ণের পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিল না, ইহা বোধ হয় মহাভারতের পাঠকদিগের নিকট কষ্ট পাইয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। অতএব তিনি যাহাতে অর্জুনের পত্নী হইবেন, ইহাই সুভদ্রার মঙ্গলার্থ কৃষ্ণের করা কর্তব্য। তাঁহার যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই তিনি দেখাইয়াছেন, বলপূর্ব্বক হরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এই কর্তব্য সাধন হইতে পারিত কি না, তাহা সন্দেহহীন। যেখানে ভাবিকল চিরজীবনের মঙ্গল, সেখানে যে পথে সন্দেহ সে পথে যাইতে নাই। যে পথে মঙ্গলসিদ্ধি নিশ্চিত, সেই পথেই বাইতে হয়। অতএব কৃষ্ণ, সুভদ্রার চিরজীবনের পরম শুভ সুনিশ্চিত করিয়া দিয়া, তাহার প্রতি পরমধর্ম্মাহুত কার্য্যই করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই।

এ কথা প্রতি দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই যে, আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও, আমার উপর বলপ্রয়োগ করিয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই। পুরোহিত মহাশয়

মনে করেন যে, আমি যদি আমার সর্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করি, তবে আমার পরম মঙ্গল হইবে। কিন্তু তাহার এমন কোন অধিকার নাই যে, আমাকে মারপিট করিয়া সর্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করান। শুভ উদ্দেশ্যের সাধন জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করাও নিষেধীয়। উনকিল্ল শতাব্দীর ভাষায় ইহার অর্থবাচ্য এই যে, “The end does not sanctify the means.”

এ কথার দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে, সুভক্ত্যাহরণ যে অর্থবানের প্রতি অনিচ্ছা বা বিরক্তি ছিল, এমনত কিছুই প্রকাশ নাই। ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই প্রকাশ নাই। প্রকাশ থাকিবার সম্ভাবনা বড় অল্প। হিন্দুর ঘরের কত্যা—কুমারী এবং বালিকা—পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বড় প্রকাশ করে না। বাস্তবিক, তাহাদের মনেও বোধ হয়, পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা অনিচ্ছা বড় জন্মেও না, তবে খেড়ে মেয়ে ঘরে পুখিয়া রাখিলে জন্মিতে পারে। এখন, যদি কোন কাজে আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই থাকে, যদি সেই কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হয়, আর কেবল বিশেষ প্রবৃত্তির অভাবে বা লজ্জা বশতঃ বা উপায়াভাব বশতঃ আমি সে কার্য্য স্বয়ং করিতেছি না, এমন হয়, আর যদি আমার উপর একটু বলপ্রয়োগের ভাণ করিলে সেই পরম মঙ্গলকর কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে সে বলপ্রয়োগ কি অধর্ম্ম? মনে কর, এক জন বড় ঘরের ছেলে দুর্ব্বাস্থ্য পড়িয়াছে, তোমার কাছে একটি চাকরি পাইলে খাইয়া বাঁচে, কিন্তু বড় ঘর বলিয়া তাহাতে তেমন ইচ্ছা নাই, কিন্তু তুমি তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া চাকরিতে বসাইয়া দিলে আপত্তি করিবে না, বরং সপরিবারে খাইয়া বাঁচিবে। সে স্থলে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া ছটো ধমক দিয়া তাহাকে দফতরখানাতে বসাইয়া দেওয়া কি তোমার অধর্ম্মাচরণ বা লীড়ন করা হইবে? সুভক্ত্যাহরণ অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্দুর ঘরের কুমারী মেয়ে, বুঝাইয়া বলিলে, কি “এসো গো” বলিয়া ডাকিলে, বরের সঙ্গে যাইবে না। কাজেই ধরিয়া লইয়া যাওয়ার ভাণ ভিন্ন তাহার মঙ্গলসাধনের উপায়ান্তর ছিল না।

“আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও, আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই।” এই আপত্তির দুইটি উত্তর আছে, আমরা বলিয়াছি। প্রথম উত্তর, উপরে বুঝাইলাম। প্রথম উত্তরে আমরা ঐ আপত্তির কথাটা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া উত্তর দিয়াছি। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, কথাটা সকল সময়ে যথার্থ নয়। যে কার্য্যে আমার পরম মঙ্গল, সে কার্য্যে আমার অনিচ্ছা থাকিলেও বলপ্রয়োগ করিয়া আমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে যে

কাহারও অধিকার নাই, এ কথা সকল সময়ে খাটে না। যে রোগীর রোগপ্রভাবে প্রাণ যায়, কিন্তু ঔষধে রোগীর স্বভাবসুলভ বিরাগবশতঃ সে ঔষধ খাইবে না, তাকে বলপূর্বক ঔষধ খাওয়াইতে চিকিৎসকের এবং বন্ধুবর্গের অধিকার আছে। সাংবাদিক বিস্ফোটক সে ইচ্ছাপূর্বক কাটাইবে না,—জোর করিয়া কাটিবার ডাক্তারের অধিকার আছে। ছেলে লেখাপড়া শিখিবে না, জোর করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার অধিকার শিক্ষক ও পিতা মাতা প্রভৃতির আছে। এই বিবাহের কথাতেই দেখ, অপ্রাপ্তবয়ঃ কুমার কি কুমারী যদি অনুচিত বিবাহে উক্ত হইত, বলপূর্বক তাকে নিবৃত্ত করিতে কি পিতা মাতার অধিকার নাই? আজিও সভ্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহে জোর করিয়া সংপাত্রে কন্যাদান করার প্রথা আছে। যদি পনের বৎসরের কোন হিন্দুর মেয়ে কোন সুপাত্রে আপত্তি উপস্থিত করে, তবে কোন্ পিতা মাতা জোর করিয়া তাকে সংপাত্রস্থ করিতে আপত্তি করিবেন? জোর করিয়া বালিকা কন্যা সংপাত্রস্থ করিলে তিনি কি নিন্দনীয় হইবেন? যদি না হইন, তবে শুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের অনুমতি নিন্দনীয় কেন?

এই গেল প্রথম আপত্তির হই উত্তর। এখন দ্বিতীয় আপত্তির বিচারে প্রবৃত্ত হই।

দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, ভাল, স্বীকার করা গেল যে, কৃষ্ণ শুভদ্রার মঙ্গলকামনা করিয়াই, এই পরামর্শ দিয়াছিলেন—কিন্তু বলপূর্বক হরণ ভিন্ন কি তাঁহাকে অর্জুনমহিষী করিবার অন্য উপায় ছিল না? স্বয়ংবরে যেন ভয় ছিল, যেন মৃত্যুমতি বালিকা কেবল মুখ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া কোন অপাত্রে বরমাল্য দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু উপায়ান্তর কি ছিল না? কৃষ্ণ কি অর্জুন, বসুদেব প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের কাছে কথা পাড়িয়া রীতিমত সম্বন্ধ স্থির করিয়া, তাঁহাদিগকে বিবাহে সম্মত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করাইতে পারিতেন। যাদবেরা কৃষ্ণের বশীভূত; কেহই তাঁহার কথায় অমত করিত না। এবং অর্জুনও সুপাত্র, কেহই আপত্তি করিত না। তবে না হইল কেন?

এখনকার দিনকাল হইলে, এ কাজ সহজে হইত। কিন্তু ভদ্রার্জুনের বিবাহ চারি হাজার বৎসর পূর্বে ঘটয়াছিল, তখনকার বিবাহপ্রথা এখনকার বিবাহপ্রথার মত ছিল না। সেই বিবাহপ্রথা না বুঝিলে কৃষ্ণের আদর্শ বুদ্ধি ও আদর্শ প্রীতি আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিব না।

মম্বতে আছে, বিবাহ অষ্টবিধ, (১) ব্রাহ্ম, (২) দৈব, (৩) আর্ষ, (৪) প্রাজাপত্য, (৫) আশ্বর, (৬) গান্ধর্ব, (৭) রাক্ষস ও (৮) পৈশাচ। এই ক্রমাধ্বয়টা পাঠক মনে রাখিবেন।

এই অষ্টপ্রকার বিবাহে সকল বর্ণের অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের কোন্ কোন্ বিবাহে অধিকার, দেখা যাউক। তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে,

বড়াহপূর্ব্যা বিপ্রশ্র কস্ত্র চতুরোহবরান্ ।

ইহার টীকায় কুল্লুকভট্ট লেখেন, “ক্ষত্রিয়স্ত অবরানুপরিভনানানুসাদীশ্চতুরঃ ।” তবেই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, কেবল আনুহ, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই চারি প্রকার বিবাহ বৈধ। আর সকল অবৈধ।

কিন্তু ২৫ শ্লোকে আছে—

পৈশাচশাস্ত্রবৈশ্বৈ ন কৰ্ত্তব্যো কন্যচন ॥

পৈশাচ ও আনুহ বিবাহ সকলেরই অকৰ্ত্তব্য। অতএব ক্ষত্রিয় পক্ষে কেবল গান্ধর্ব ও রাক্ষস এই দ্বিবিধ বিবাহই বিহিত রহিল।

তন্মধ্যে, বরকস্ত্রার উভয়ে পরস্পর অমুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাহাই গান্ধর্ব বিবাহ। এখানে সুভদ্রার অমুরাগ অভাবে সে বিবাহ অসম্ভব, এবং সেই বিবাহ “কামসম্ভব,” সুতরাং পরম নীতিজ্ঞ কৃষ্ণার্জুনের তাহা কখনও অমুমোদিত হইতে পারে না। অতএব রাক্ষস বিবাহ ভিন্ন অত্র কোন প্রকার বিবাহ শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্য নহে ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত নহে; অত্র প্রকার বিবাহেরও সম্ভাবনা এখানে ছিল না। বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। বস্তুতঃ শাস্ত্রানুসারে এই রাক্ষস বিবাহই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত বিবাহ। মহুর ৩ অ, ২৪ শ্লোকে আছে—

চতুরো ব্রাহ্মণস্তাত্তান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ ।

রাক্ষসঃ ক্ষত্রিয়শ্চৈকমাহবং বৈশ্বশূদ্রয়োঃ ॥

যে বিবাহ ধর্ম্য ও প্রশস্ত, আপনার ভগিনীর ও ভগিনীপতির গৌরবার্থ ও নিজকুলের গৌরবার্থ, কৃষ্ণ সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাধ্য ছিলেন। অতএব কৃষ্ণ অর্জুনকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পরম শাস্ত্রজ্ঞতা, নীতিজ্ঞতা, অভ্রান্তবুদ্ধি এবং সর্বপক্ষের মানসস্তম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতৈচ্ছাই দেখা যায়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানে মহুর দোহাই দিলে চলিবে না। মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে মহুসংহিতা ছিল, ইহার প্রমাণ কি? কথা শ্রাব্য বটে, তত প্রাচীনকালে মহুসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে। তবে মহুসংহিতা পূর্ব্বপ্রচলিত রীতি নীতির সঙ্কলন মাত্র, ইহা পণ্ডিতদিগের মত। যদি তাহা হয়, তবে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে ঐরূপ বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ইহা বিবেচনা করা

বাইতে পারে। নাই পারক—মহাভারতেই এ বিষয়ে কি আছে, তাহাই দেখা যাউক। এই সুভদ্রাহরণ-পর্বোধ্যায়েই সে বিষয়ে কি প্রমাণ পাওয়া যায়, দেখা যাউক। বড় বেশী খুঁজিতে হইবে না। আমরা পাঠকদিগের নিকট যে উত্তর দিতেছি, কৃষ্ণ নিজেই সেই উত্তর বলদেবকে দিয়াছিলেন। অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তনিয়া বান্দবেরা ক্রুদ্ধ হইয়া রণসজ্জা করিতেছিলেন। বলদেব বলিলেন, অত পণ্ডগোল করিবার আগে, কৃষ্ণ কি বলেন শুনা যাউক। তিনি চুপ করিয়া আছেন। তখন বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া, অর্জুন তাঁহাদের বংশের অপমান করিয়াছে বলিয়া রাগ প্রকাশ করিলেন, এবং কৃষ্ণের অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ উত্তর করিলেন—

“অর্জুন আমাদের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং সমধিক সন্মান বক্ষাই করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে অর্থলুপ্ত মনে করেন না বলিয়া অর্থ দ্বারা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টাও করেন নাই। স্বয়ংবরে কন্যা লাভ করা অতীব দুর্লভ ব্যাপার, এই জন্তই তাহাতে সন্মত হন নাই, এবং পিতামাতার অমুমতি গ্রহণ পূর্বক প্রদত্তা কন্যায় পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া বলপূর্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। এই সপক্ষ আমাদের কুলোচিত হইয়াছে, এবং কুলশীল বিদ্ভা ও বৃক্শিম্পদ পার্শ্ব বলপূর্বক হরণ করিয়াছেন, বলিয়া সুভদ্রাও মশম্বিনী হইবেন, সন্দেহ নাই।”

এখানে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের চারি প্রকার বিবাহের কথা বলিয়াছেন;—

- ১। অর্থ (বা শুক) দিয়া যে বিবাহ করা যায় (আসুর)।
- ২। স্বয়ংবর।
- ৩। পিতা মাতা কর্তৃক প্রদত্তা কন্যার সহিত বিবাহ (প্রাজাপত্য)।
- ৪। বলপূর্বক হরণ (রাক্ষস)।

ইহার মধ্যে প্রথমটিতে কন্যাকুলের অকীর্তি ও অযশ, ইহা সর্ববাদিসম্মত। দ্বিতীয়ের ফল অনিশ্চিত। তৃতীয়ে, বরের অগোরব। কাজেই চতুর্থই এখানে একমাত্র বিহিত বিবাহ। ইহা কৃষ্ণোক্তিতেই প্রকাশ আছে।*

ভরসা করি, এমন নির্দোষ কেহই নাই যে, সিদ্ধান্ত করেন যে, আমি রাক্ষস বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতেছি। রাক্ষস বিবাহ অতি নিন্দনীয়, সে কথা বলিয়া স্থান নষ্ট

* মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে যে বিবাহতত্ত্ব আছে, তাহার আমরা কোন উল্লেখ করিলাম না, কেন না, উহা প্রকৃষ্ট। সেখানে রাক্ষস বিবাহ ভীষ্ম কর্তৃক নিষিদ্ধ ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ভীষ্ম যখন কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা স্থির করিয়া, কাশিরাজের তিনটি কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। হৃতরাং ভীষ্মের রাক্ষস বিবাহকে নিষিদ্ধ ও নিষিদ্ধ বলা সম্ভব নহে। ভীষ্মের চরিত্র এই যে, যাহা নিষিদ্ধ ও নিষিদ্ধ, তাহা তিনি প্রাণান্তেও করিতেন না। যে কবি তাঁহার চরিত্র খুঁটি করিয়াছেন, সে কবি কখনই তাঁহার ঘৃণ দিয়া এ কথা বাহির করেন নাই।

করা নিষ্প্রয়োজন। তবে সে কালে যে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল, কৃষ্ণ তাহার দ্বারা নহেন। আমাদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, “রিকর্মর্ই” আদর্শ মহুত্র, এবং কৃষ্ণ যদি আদর্শ মহুত্র, তবে মালাবারি ধরণের রিকর্মর্ হওয়াই তাঁহার উচিত ছিল, এবং এই কুপ্রথার প্রসার না দিয়া দমন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা মালাবারি চণ্টটিকে আদর্শ মহুত্রের গুণের মধ্যে গণি না, সুতরাং এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি না।

আমরা বলিয়াছি যে, বলপূর্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহা তিন কারণে নিন্দনীয়; (১) কস্তার প্রতি অত্যাচার, (২) তাহার পিতৃকুলের প্রতি অত্যাচার, (৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। কস্তার প্রতি যে কোন অত্যাচার হয় নাই, বরং তাহার পরম মঙ্গলই সাধিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে তাঁহার পিতৃকুলের প্রতি কোন অত্যাচার হইয়াছে কি না, দেখা যাউক। কিন্তু আর স্থান নাই, সংক্ষেপে কথা শেষ করিতে হইবে। যাহা বলিয়াছি, তাহাতে সকল কথাই শেষ হইয়া আসিয়াছে।

কস্তাহরণে তৎপিতৃকুলের উপর দুই কারণে অত্যাচার ঘটে। (১) তাঁহাদিগের কস্তা অপাত্রে বা অনভিপ্রেত পাত্রের হস্তগত হয়। কিন্তু এখানে তাহা ঘটে নাই। অর্জুন অপাত্রেও নহে, অনভিপ্রেত পাত্রও নহে। (২) তাঁহাদিগের নিজের অপমান। কিন্তু পূর্বে যাহা উক্ত করিয়াছি, তাহার দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে যাদবেরা অপমানিত হইয়াছেন বিবেচনা করিবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং তাঁহার সে কথা শ্রায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া অপর যাদবেরা অর্জুনকে কিরাইয়া আনিয়া সমারোহপূর্বক তাঁহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল, ইহা বলিবার আমাদের আর আবশ্যকতা নাই।

(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। যে বলকে সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, সমাজমধ্যে কাহারও প্রতি সেই বল প্রযুক্ত হইলেই সমাজের প্রতি অত্যাচার হইল। কিন্তু যখন তাৎকালিক আর্ধ্যসমাজ ক্ষত্রিয়কৃত এই বলপ্রয়োগকে প্রশস্ত ও বিহিত বলিত, তখন সমাজের আর বলিবার অধিকার নাই যে, আমার প্রতি অত্যাচার হইল। যাহা সমাজসম্মত, তদ্বারা সমাজের উপর কোন অত্যাচার হয় নাই।

আমরা এই তত্ত্ব এত সবিস্তারে লিখিলাম, তাহার কারণ আছে। সুভদ্রাহরণের জন্ত কৃষ্ণদেবীরা কৃষ্ণকে কখনও গালি দেন নাই। তজ্জন্ত কৃষ্ণপক্ষসমর্থনের কোন

আমরা স্বীকার করি যে, এ ব্যাখ্যাটা নিভাত চাঁদুবল হইলার ধরনের হইল। কিন্তু আমরা যে এরূপ একটা তাৎপর্য সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইলাম, তাহার কারণ আছে। খাণ্ডবদাহটা অবিকারিত তৃতীয় স্তরাস্তর হইতে পারে, কিন্তু খুল খটনার কোন সূচনা যে আদিম মহাভারতে নাই, এ কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে এবং অম্বুজমণিকাধ্যায়ে ইহার প্রসঙ্গ আছে। এই খাণ্ডবদাহ হইতে সভাপর্ব্বের উৎপত্তি। এই বনমধ্যে ময়দানব বাস করিত। সেও পুড়িয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছিল। সে অর্জুনের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিল; অর্জুনও শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই উপকারের প্রতাপকার জন্ত ময়দানব পাণ্ডবদিগের অত্যাশঙ্কিত সভা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল। সেই সভা লইয়াই সভাপর্ব্বের কথা।

এখন সভাপর্ব্ব অষ্টাদশ পর্ব্বের এক পর্ব্ব। মহাভারতের যুদ্ধের বীজ এইখানে। ইহা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। যদি তা না যায়, তবে ইহার মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। সভা এবং তত্পলক্ষে রাজসূয় যজ্ঞকে মৌলিক এবং ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করার প্রতি কোনই আপত্তি দেখা যায় না। যদি সভা ঐতিহাসিক হইল, তবে তাহার নির্মাতা এক জন অবশ্য থাকিবে। মনে কর, সেই কারিগর বা এঞ্জিনিয়রের নাম ময়। হয়ত সে অনার্য্যবংশীয়—এজন্ত তাহাকে ময়দানব বলিত। এমন হইতে পারে যে, সে বিপন্ন হইয়া অর্জুনের সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছিল, এবং কৃতজ্ঞতাবশতঃ এই এঞ্জিনিয়রী কাজটুকু করিয়া দিয়াছিল। যদি ইহা প্রকৃত হয়, তবে সে যে কিরূপে বিপন্ন হইয়া অর্জুনকৃত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা কেবল খাণ্ডবদাহই পাওয়া যায়। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এ সকলই কেবল অঙ্ককারে ঢিল মারা। তবে অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বই এইরূপ অঙ্ককারেও ঢিল।

হয়ত, ময়দানবের কথাটা সমুদায়ই কবির সৃষ্টি। তা যাই হোক, এই উপলক্ষে কবি যে ভাবে কৃষ্ণাৰ্জুনের চরিত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর। তাহা না লিখিয়া থাকা যায় না। ময়দানব প্রাণ পাইয়া অর্জুনকে বলিলেন, “আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, অতএব আঞ্জা করুন, আপনাকে কি প্রতাপকার করিব?” অর্জুন কিছুই প্রতাপকার চাহিলেন না, কেবল শ্রীতি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু ময়দানব ছাড়ে না; কিছু কাজ না করিয়া যাইবে না। তখন অর্জুন তাহাকে বলিলেন,—

“এ কতক! তুমি আমায় হইতে বলা পাইয়াই বলিয়া আমার প্রত্যাশা করিতে ইচ্ছা করিতেছ, এই নিমিত্ত আমার দ্বারা কোন কর্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে ইচ্ছা হয় না।”

ইহাই নিকাম ধর্ম; খ্রিষ্টান ইউরোপে ইহা নাই। বাইবেলে যে ধর্ম অমূল্য হইয়াছে, ধর্ম বা ঈশ্বর-প্রীতি তাহার কাম্য। আমরা এ সকল পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে যে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা করিতে যাই, আমাদের বিবেচনায় সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। অর্জুনবাক্যের অপরাধে এই নিকাম ধর্ম আরও স্পষ্ট হইতেছে। ময় যদি কিছু কাজ করিতে পারিলে মনে সুখী হয়, তবে সে সুখ হইতে অর্জুন তাহাকে বঞ্চিত করিতে অনিচ্ছুক। অতএব তিনি বলিতে লাগিলেন,—

“তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যাশা করা হইবে।”

অর্থাৎ, তোমার দ্বারা যদি কাজ লইতেই হয়, তবে সেও পরের কাজ। আপনার কাজ লওয়া হইবে না।

তখন ময় কৃষ্ণকে অমুরোধ করিলেন—কিছু কাজ করিতে আদেশ কর। ময় “দানবকুলের বিশ্বকর্মা”—বা চীফ এঞ্জিনিয়ার। কৃষ্ণও তাঁহাকে আপনার কাজ করিতে আদেশ করিলেন না। বলিলেন, “যুধিষ্ঠিরের একটি সভা নির্মাণ কর। এমন সভা গড়িবে, মনুষ্যে যেন তাহার অমুকরণ করিতে না পারে।”

ইহা কৃষ্ণের নিজের কাজ নহে—অথচ নিজের কাজ বটে। আমরা পূর্বের বলিয়াছি, কৃষ্ণ স্বজীবনে দুইটি কার্য উদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্যসংস্থাপন। ধর্মপ্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই। এই সভা নির্মাণ ধর্মরাজ্যসংস্থাপনের প্রথম সূত্র। এইখানেই তাঁহার এই অভিসন্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের সভা নির্মাণ হইতে যে সকল ঘটনাবলী হইল, শেষে তাহা ধর্মরাজ্যসংস্থাপনে পরিণত হইল। ধর্মরাজ্যসংস্থাপন, জগতের কাজ; কিন্তু যখন তাহা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভাসংস্থাপন তাঁহার নিজের কাজ।

গত অধ্যায়ে সমাজসংস্কারের কথাটা উঠিয়াছিল। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি সমাজসংস্থাপক বা Social Reformer হইবার প্রয়াস পান নাই। দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনর্জীবন (Moral and Political Regeneration), ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্য-সংস্থাপন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহা ঘটিলে সমাজসংস্কার আপনি ঘটয়া উঠে—ইহা না ঘটিলে সমাজসংস্কার কোন মতেই ঘটবে না। আদর্শ মনুষ্য তাহা জানিতেন,—

আনিবের, খাটের পাই না করিয়া কেবল একটি ভাল ভাল সেটিলে কল ধরে না। আমরা তাহা জানি না—আমরা তাই সমাজসংস্কারকে একটি পৃথক জিনিষ বলিয়া খাটু করিয়া বক্তব্যের উন্নতি করি। আমাদের খ্যাতিপ্রিয়তাই ইহার এক কারণ। সমাজসংস্কারক হইয়া পাড়াহীলে হঠাৎ খ্যাতিলাভ করা যায়—বিশেষ সংস্করণশ্রুতিরা যদি ইহােঁই ধরনের হয়। আর আর কাজ নাই, হজুক তার বড় ভাল লাগে। সমাজসংস্কার আর কিছুই হউক না হউক, একটি হজুক বটে। হজুক বড় আমাদের জিনিষ। এই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধর্মের উন্নতি ব্যতীত সমাজসংস্কার কিসের জোরে হইবে। রাজনৈতিক উন্নতিরও মূল ধর্মের উন্নতি। অতএব সকলে মিলিয়া ধর্মের উন্নতিতে মন দাও। তাহা হইলে আর সমাজসংস্কারের পৃথক্ চেষ্টা করিতে হইবে না। তা না করিলে, কিছুতেই সমাজসংস্কার হইবে না। তাই আদর্শ মনুষ্য মালাবারি হইবার চেষ্টা করেন নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণের মানবিকতা

কৃষ্ণচরিত্রের এই সমালোচনায় আমি কৃষ্ণের কেবল মানুষী প্রকৃতিরই সমালোচনা করিতেছি। তিনি ঈশ্বর কি না, তাহা আমি কিছু বলিতেছি না। সে কথার সঙ্গে পাঠকের কোন সম্বন্ধ নাই। কেন না, আমার যদি সেই মত হয়, তবু আমি পাঠককে সে মত গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। গ্রহণ করা না করা, পাঠকের নীজের বুদ্ধি ও চিন্তের উপর নির্ভর করে, অনুরোধ চলে না। স্বর্গ জেলখানা নহে—তাহার যে একটি বৈ ফটক নাই, এ কথা আমি মনে করি না। ধর্ম এক বস্তু বটে, কিন্তু তাহার নিকটে পৌঁছিবার অনেক পথ আছে—কৃষ্ণভক্ত এবং খ্রিষ্টিয়ান উভয়েই সেখানে পৌঁছিতে পারে।* অতএব কেহ কৃষ্ণধর্ম গ্রহণ না করিলে, আমি তাঁহাকে পতিত মনে করিব না, এবং ভরসা করি যে কৃষ্ণদেবী বা প্রাচীন বৈষ্ণবের দল আমাকে নিরয়গামী বলিয়া ভাবিবেন না।

আমাদের এখন বলিবার কথা এই, আমরা তাঁহার মানুষী প্রকৃতির নাত্র সমালোচন করিতেছি। আমরা তাঁহাকে আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছি। ইহাতে তাঁহার মনুষ্যাতীত কোন

* “ধর্মের অসংখ্য দ্বার। যে কোন একারে হটক ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি বিফল হয় না।”—মহাত্মার, দাতিশর্ক, ১৭৪ অ।

একটি আকিলের কাহার বিকাশ হইত প্রতিদিন হইত। বলিয়াছি এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর লোকসিদ্ধি আদর্শ রহস্য কল্প লোকসিদ্ধি প্রদর্শন করেন। যদি তাই হয়, তবে তিনি কেবল বাহ্যিক শক্তিতে, অর্থাৎ কেবল বাহ্যিক কার্য করিবেন। তিনি কখনও কোন লোকসিদ্ধি শক্তির দ্বারা কোন লৌকিক বা অলৌকিক কার্য নির্বাহ করিবেন না। কেন না, মনুষ্যের কোন অলৌকিক শক্তি নাই। যিনি তাহার আশ্রয় করিয়া স্বার্থ সাধন করিলেন, তিনি আর মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারিলেন না। যে শক্তি মনুষ্যের নাই, তাহার অনুকরণ মনুষ্য করিবে কি প্রকারে ?

অতএব, খ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও তাঁহার কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ বা অমানুষী কার্যসিদ্ধি সম্ভবে না। মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির আরোপ আছে, তাহা অমূলক এবং প্রক্ষিপ্ত কি না, সে কথার বিচার আমরা যথাস্থানে করিব। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণ কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন না। † কোথাও এমন প্রকাশ করেন নাই যে, তাঁহার কোন প্রকার অমানুষিক শক্তি আছে। কেহ তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে, তখন তিনি সে কথার অনুমোদন করেন নাই, বা এমন কোন আচরণ করেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইতে পারে। বরং এক স্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, “আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।” ‡

তিনি যতপূর্বক মনুষ্যোচিত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন। যাহার মনে থাকে যে, আমি একটা দেবতা বলিয়া পরিচিত হইব, সে একটু মনুষ্যোচিত আচারের উপর চড়ে,

* “We forget that Christ incarnate was such as we are, and some of us are putting him where he can be no example to us at all. Let no fear of losing the dear great truth of the divinity of Jesus make you lose the dear great truth of the humanity of Jesus. He took upon himself our nature; as a man of the like passions, he fought that terrible fight in the wilderness; year by year, as an innocent man, was he persecuted by narrow-hearted Jews; and his was a humanity whose virtue was pressed by all the needs of the multitude and yet kept its richness of nature; a humanity which, though given up to death on the cross, expressed all that is within the capacity of our own humanity; and if we really follow him we shall be holy even as he is holy.”

Sermon by Dr. Brookly, delivered at Trinity Church, Boston, March 29th, 1885.

খ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি ঠিক এই কথা বলি।

† যে হই এক স্থানে এরূপ কথা আছে, সে সকল অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও যথাস্থানে আমরা প্রমাণীকৃত করিব।

‡ অর্থাৎ তৎ করিম্যমি পরং পুরুষকারতঃ।

দৈবং তু ন ময়া শক্যং কর্ত্বং কথঞ্চন।

উদ্যোগপর্ব, ৭৮ অধ্যায়।

কৃষ্ণকে সে ভাব কোথাও লক্ষিত হয় না। এই সকল কথার উপহাসবস্তু হইয়া তিনি বাক্যব্যয়ে পর যুধিষ্ঠিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, তখন দ্বারকা যাত্রা করেন, তখন তিনি যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। উহা অত্যন্ত মাতৃবিক।

“বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ বাহদেব পরম শ্রীত পাণ্ডবগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া কিয়দিন বাণ্ডবগ্রামে বাস করিলেন। পরিশেষে শিশুদর্শনে সাতিশয় উৎসুক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পাশ্চাত্য বীর শিশুত্বলা হুজী দেবীর চরণবন্দন করিলেন। তখন বাহদেব, সাক্ষাৎকরণমানসে স্বীয় ভগিনী হৃজদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া, অর্থহীন বর্থাৎ হিতকর অন্নাকর ও অর্থহীন বাক্যে তাঁহাকে নানাপ্রকার ব্যাহিলেন। ভ্রাতৃত্ববিলী উদ্রাও তাঁহাকে জননী প্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদয় করিয়া দিয়া বারংবার পূজা ও অভিবাদন করিলেন। বৃক্সিবংশাবতঃ কৃষ্ণ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া যৌগবী ও ধোমোর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ধোম্যকে বর্থাবিধি বন্দন ও যৌগবীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জুনসমভিব্যাহারে তথা হইতে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান্ বাহদেব পঞ্চাশবকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমরগণ-পরিবৃত মহেশ্বরের দ্বায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য করিবার মানসে দানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মালা জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেব ও দিগ্গণের পূজা সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য সমাধা করিয়া স্বপ্নর গমনোচ্চোগে বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন। স্বত্তিবাচক ব্রাহ্মগণ দধিপাজ স্বলপ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্কল্য বস্ত্র হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাহদেব তাঁহাদিগকে ধনদানপূর্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অত্যাংকুট তিথিনক্ষত্রযুক্ত মুহুর্তে গদা চক্র অসি শাঙ্খ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রপরিবৃত, গরুড়কেতন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপ্নরে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণপূর্বক দারুণ সারথিকে তৎস্থান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বলগা গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু অর্জুন ও তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্ণগণ্ডবিরাজিত খেত চামর গ্রহণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করতঃ প্রদক্ষিণ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন নকুল এবং সহদেব, ঋষিক্ ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার অহুগমন করিতে লাগিলেন। শত্রুবলান্তক বাহদেব যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ কর্তৃক অহুগম্যমান হইয়া শিশুগণাহুগত গুরুর দ্বায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অর্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও অর্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অর্জু যোজন গমন করিয়া শত্রুনিব্বন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করতঃ প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির চরণপতিত পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার মন্তকাজ্ঞাপূর্বক স্বভবনে গমন করিতে অচ্যুত করিলেন। তখন ভগবান্ বাহদেব পাণ্ডবগণের সহিত বর্থাবিধি প্রতিজ্ঞা করতঃ অতি

কিন্তু তাঁহানিকে প্রতিশ্রুতি করিয়া অমরানন্দীপ্রস্থির গ্রহণের জন্য আশ্বিনী প্রস্থিমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ কতক কক্ষেরে প্রবিষ্ট হইলেন, ততক্ষণ তাঁহার নিমেষমাত্র বয়সে তাঁহাকে নিরীকণ ও মনে মনে তাঁহার অহমসমন করিতে লাগিলেন। কক্ষেরে দেখিয়া তাঁহানিগের মন পরিতুষ্ট না হইতে হইতেই তিনি তাঁহানিগের দৃষ্টিগণের বহির্ভূত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ কক্ষদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া ভ্রমিরাগিণী চিন্তা করিতে করিতে স্বপ্নেরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবকীন্দন কক্ষও অহমসমন মহাবীর সাধুত এবং দারুক সাগরির সহিত বেগবান্ গরুড়ের ভায় সম্বরে দ্বারকাপুরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিবাচারে হৃদয়জনপরিবৃত্ত হইয়া স্বপ্নেরে প্রবেশ করিলেন, এবং জ্ঞাতা পুত্র ও বহুদিগকে বিদায় দিয়া জৌনদীর সহিত আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কক্ষও পদম আত্মনাসিতচিত্তে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন প্রকৃতি যত্বশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। বাহুদেব পুত্রপ্রবেশ করিয়া অগ্রে বৃদ্ধ পিত্তা আত্মক ও বশবিনী মাতাকে, পরে বহুদেবকে অভিষেক করিলেন। অনন্তর তিনি প্রচ্যুর শাখ নিলিষ্ট চাকরদেয় পদ সনিকর ও ভাহকে লাগিলেন করিয়া বৃদ্ধগণের অহমতিগ্রহণপূর্বক ক্রিয়গীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজসম্মানের পরামর্শ

এ দিকে সভানির্মাণ হইল। যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব হইল। সকলেই সে বিষয়ে মত করিল, কিন্তু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের মত ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছুক—কেন না, কৃষ্ণই নীতিজ্ঞ। অতএব তিনি কৃষ্ণকে আনিতে পাঠাইলেন। কৃষ্ণও সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র খাণ্ডবপ্রাঙ্গে উপস্থিত হইলেন।

রাজস্বয়ের অমুষ্ঠান সহজে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন :—

“আমি রাজস্বয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। এই যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয় এমন নহে। যে রূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার হবিষিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে ব্যক্তি সর্বত্র পূজ্য, এবং যিনি সমুদয় পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজস্বয়ামুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।”

কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের এই কথাই জিজ্ঞাস্য। তাঁহার জিজ্ঞাস্য এই যে—“আমি কি সেইরূপ ব্যক্তি? আমাতে কি সকলই সম্ভব? আমি কি সর্বত্র পূজ্য, এবং সমুদয় পৃথিবীর ঈশ্বর?” যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের ভূজবলে এক জন বড় রাজা হইয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি এমন একটা লোক হইয়াছেন কি যে রাজস্বয়ের অমুষ্ঠান করেন? আমি কত বড় লোক, তাহার ঠিক মাপ কেহই আপনা আপনি পায় না। দান্তিক ও দুরাঙ্গগণ খুব

যত বাসনাক্রমে আপনাকে আপনি আপনার মনঃ সর্বদা কৃষ্ণচরিত্র হইয়া সজ্ঞিত হইয়া থাকে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ক্ষার সাধনান্নাৎ বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তির তাহা সম্ভব নহে। তিনি মনে মনে যুধিষ্ঠিরকে বলে যে, আমি খুব বড় রাজা হইয়াছি, কিন্তু আপনার কৃত আত্মদানে তাহার বড় বিশ্বাস হইতেছে না। তিনি আপনার মন্ত্রিগণ ও ভীমার্জুনাদি অহঙ্করণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“কেমন, আমি রাজস্বয় যজ্ঞ করিতে পারি কি?” তাহারা বলিয়াছেন—“হাঁ, অবশ্য পার। তুমি তার যোগ্য পাত্র।” ধোম্য বৈশ্যাদি স্বমিগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কেমন, আমি কি রাজস্বয় পারি?” তাহারাও বলিয়াছিলেন, “পার। তুমি রাজস্বয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।” তথাপি সাধনান্নাৎ যুধিষ্ঠিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অর্জুন হউন, ব্যাস হউন,—যুধিষ্ঠিরের নিকট পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার কাছে এ কথা উত্তর না শুনিলে, যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ যায় না। তাই “মহাবাহু সর্বলোকোত্তম” কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। তাবিলেন, “কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ ও সর্বকৃৎ, তিনি অবশ্যই আমাকে সম্পরামর্শ দিবেন।” তাই তিনি কৃষ্ণকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণ আসিলে তাই, তাহাকে পূর্বোক্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাও কৃষ্ণকে খুলিয়া বলিতেছেন।

“আমার অগ্রাশ্রয় ব্রহ্মসংগ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বহুতার নিমিত্ত দোষোদঘোষণা করেন না। কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য বলেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন! এই পৃথিবী মুখ্য উক্ত প্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য করা যায় না। তুমি উক্ত দোষরহিত ও কাম-ক্রোধ-বিবর্জিত; অতএব আমাকে স্বার্থ পরামর্শ প্রদান কর।”

পাঠক দেখুন, কৃষ্ণের আত্মীয়গণ যাহারা প্রত্যহ তাহার কার্যকলাপ দেখিতেন, তাহারা কৃষ্ণকে কি ভাবিতেন। আর এখন আমরা তাহাকে কি ভাবি। তাহারা

* পাণ্ডব পাঁচ জনের চরিত্র বুদ্ধিমান সমালোচকে সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, যুধিষ্ঠিরের প্রধান গুণ, তাহার সাধনাত্মকতা। ভীম হুসাহসী, “গৌরব”, অর্জুন আপনার বাহুবলের দৌরব আনিয়া নির্ভর ও নিশ্চিন্ত, যুধিষ্ঠির সাধনাত্মক। এ অগ্রগত সাধনাত্মকই অনেক স্থানে ধর্ম বলিয়া পরিচিত হয়। কখনো কখনো অশ্রাসনিক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বলিয়াই এখানে ইহার উত্থাপন করিলাম। এই সাধনাত্মকতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের হৃদয়স্থায়ী কটুত্ব সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্থান নহে।

+ যুধিষ্ঠিরের মন হইতে বাস্তবিক এই কথাগুলি বাহির হইয়াছিল, আর তাহাই কেহ লিখিয়া রাখিয়াছে, এমন নহে। মৌলিক মহাভারতে তাহার কিরণ চরিত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের আলোচ্য।

[illegible]

যাঁহারা কৃষ্ণকে স্বার্থপর ও কুচক্রী ভাবেন, তাঁহারা এই কথা শুনিয়া বলিলেন,

কিন্তু আরও একটু কথা বাকি আছে। জরাসন্ধ সম্রাট, কিন্তু তৈমুরনজ্ বা প্রথম

“হে ভরতকুলপ্রদীপ! বলিপ্রদানার্থ সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমুট হইয়া পশুদিগের আয়

* কেহ কদাচিৎ দিত—সামাজিক প্রথা ছিল না। কৃষক এক স্থানে বলিতেছেন, “আমরা কখন নরবলি দেখি নাই।”
 বার্ষিক ব্যক্তিরা এ ভয়ানক প্রথার দিক দিয়া বাইতেন না।

হেঁদে কবিবে, এই নিমিত্ত আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। এই দুঃখাশ্রয় বৃদ্ধসিদ্ধি
 ব্রহ্মপুত্রকে আশ্রয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দশ জনের অগ্রদূত আছে; চতুর্দশ জন আনীত হইলেই এই
 ব্রহ্মপুত্র উহাদের সকলকে এককালে লঙ্ঘন করিবে। হে ধর্মাত্মন! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুঃখাশ্রয় জরাসন্ধের
 এই ক্রুর কণ্ঠে বির উপদান করিতে পারিবেন, তাহার যশোরশি ভূমণ্ডলে দেবীশ্যামান হইবে, এবং যিনি
 উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।”

অতএব জরাসন্ধবধের জন্ত যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য,
 কৃষ্ণের নিজের হিত নহে;—যুধিষ্ঠিরেরও যদিও তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি আছে, তথাপি তাহাও
 প্রধানতঃ এই পরামর্শের উদ্দেশ্য নহে; উহার উদ্দেশ্য কারারুদ্ধ রাজমণ্ডলীর হিত—
 জরাসন্ধের অত্যাচারপ্রলীড়িত ভারতবর্ষের হিত—সাধারণ লোকের হিত। কৃষ্ণ নিজে
 তখন রৈবতকের দুর্গের আশ্রয়ে, জরাসন্ধের বাহুর অতীত এবং অজ্ঞেয়; জরাসন্ধের বধে
 তাহার নিজের ইষ্টানিষ্ট কিছুই ছিল নাই। আর থাকিলেও, যাহাতে লোকহিত সাধিত হয়,
 সেই পরামর্শ দিতে তিনি ধর্মতঃ বাধ্য—সে পরামর্শে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি থাকিলেও
 সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য। এই কার্যে লোকের হিত সাধিত হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে
 আমারও কিছু স্বার্থসিদ্ধি আছে,—এমন পরামর্শ দিলে লোকে আমাকে স্বার্থপর মনে
 করিবে—অতএব আমি এমন পরামর্শ দিব না;—যিনি এইরূপ ভাবেন, তিনিই যথার্থ
 স্বার্থপর এবং অধার্মিক, কেন না তিনি আপনার মর্যাদাই ভাবিলেন, লোকের হিত
 ভাবিলেন না। যিনি সে কলঙ্ক সাদরে মস্তকে বহন করিয়া লোকের হিতসাধন করেন,
 তিনিই আদর্শ ধার্মিক। ত্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই আদর্শ ধার্মিক।

যুধিষ্ঠির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি হইলেন না। কিন্তু
 ভীমের দৃষ্ট তেজস্বী ও অর্জুনের তেজোগর্ভ বাক্যে, ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে
 সম্মত হইলেন। ভীমার্জুন ও কৃষ্ণ এই তিন জন জরাসন্ধ-জয়ে যাত্রা করিলেন। যাহার
 অগণিত সেনার ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত হৃষ্ণিবংশ রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন,
 তিন জন মাত্র তাহাকে জয় করিতে যাত্রা করিলেন, এ কিরূপ পরামর্শ? এ পরামর্শ
 কৃষ্ণের, এবং এ পরামর্শ কৃষ্ণের আদর্শচরিত্রাভ্যায়ী। জরাসন্ধ দুঃখাশ্রয়, এজন্ত সে দণ্ডনীয়,
 কিন্তু তাহার সৈনিকেরা কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্ত সৈন্য
 লইয়া যাইতে হইবে? এরূপ সৈন্য যুদ্ধে কেবল নিরপরাধদিগের হত্যা, আর হয়ত
 অপরাধীরও নিহতি; কেন না জরাসন্ধের সৈন্যবল বেশী, পাণ্ডবসৈন্য তাহার সমকক্ষ না
 হইতে পারে। কিন্তু তখনকার ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম ছিল যে, দৈবদ্য যুদ্ধে আহুত হইলে

কেহই নিমুখ হইতেন না। অতএব কৃষ্ণের অভিসন্ধি এই যে, অনর্থক লোককর্ম না করিয়া, তাঁহারা তিন জন মাত্র জরাসন্ধের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে বৈরথ্য যুদ্ধে আহৃত করিবেন— তিন জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবশ্য স্বীকৃত হইবে। তখন যাহার শারীরিক বল, সাহস ও শিক্ষা বেশী, সেই জিতবে। এ বিষয়ে চারি জনেই ঐক্য। কিন্তু যুদ্ধসম্বন্ধে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে গমন করিলেন। এ ছদ্মবেশ কেন, তাহা বুঝা যায় না। এমন নহে যে গোপনে জরাসন্ধকে ধরিয়া বধ করিবার তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। তাঁহারা শত্রুভাবে, ঘোরতর ভেরী সকল ভয় করিয়া প্রাকার চৈত্যা চূর্ণ করিয়া জরাসন্ধসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব গোপন উদ্দেশ্য নহে। ছদ্মবেশ কৃষ্ণার্জুনের অযোগ্য। ইহার পর আরও একটি কাণ্ড, তাহাও শোচনীয় ও কৃষ্ণার্জুনের অযোগ্য বলিয়াই বোধ হয়। জরাসন্ধের সমীপবর্তী হইলে ভীমার্জুন “নিয়মস্থ” হইলেন। নিয়মস্থ হইলে কথা কহিতে নাই। তাঁহারা কোন কথাই কহিলেন না। সূতরাং জরাসন্ধের সঙ্গে কথা কহিবার ভার কৃষ্ণের উপর পড়িল। কৃষ্ণ বলিলেন, “ইহারা নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্বরাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন।” জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাদিগকে যজ্ঞালয়ে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, এবং অর্জুরাজ সময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ইহাও একটি কল কৌশল। কল কৌশলটা বড় বিগুহ রকমের নয়—চাতুরী বটে। ধর্মাত্মার ইহা যোগ্য নহে। এ কল কৌশল ফিকির ফন্দীর উদ্দেশ্যটা কি? যে কৃষ্ণার্জুনের এত দিন আমরা ধর্মের আদর্শের মত দেখিয়া আসিতেছি, হঠাৎ তাঁহাদের এ অবনতি কেন? এ চাতুরীর কোন যদি উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলেও বুঝিতে পারি যে, হাঁ, অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত, ইহারা এই খেলা খেলিতেছেন, কল কৌশল করিয়া শত্রুনিপাত করিবেন বলিয়াই এ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব যে, ইহারা ধর্মাত্মা নহেন, এবং কৃষ্ণচরিত্র আমরা যেরূপ বিগুহ মনে করিয়াছিলাম, সেরূপ নহে।

যাঁহারা জরাসন্ধ-বধ-বৃত্তান্ত আত্মোপাস্ত পাঠ করেন নাই, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, কেন, এরূপ চাতুরীর উদ্দেশ্য ত পড়িয়াই রহিয়াছে। নিশীথকালে, যখন জরাসন্ধকে নিঃসহায় অবস্থায় পাইবেন, তখন, তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করাই এ চাতুরীর উদ্দেশ্য। তাই ইহারা যাহাতে নিশীথকালে তাহার সান্নাৎলাভ হয়, এমন একটা কৌশল

করিলেন। বাস্তবিক, এরূপ কোন উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না, এবং এরূপ কোন কার্য তাঁহারা করেন নাই। নিম্নীথকালে তাঁহারা জরাসন্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন নাই—আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। নিম্নীথকালে যুদ্ধ করেন নাই—দিনমানে যুদ্ধ হইয়াছিল। গোপনে যুদ্ধ করেন নাই—প্রকাশে সমস্ত পৌরবর্গ ও মগধবাসীদিগের সমক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন এক দিন যুদ্ধ হয় নাই, চৌদ্দ দিন এমন যুদ্ধ হইয়াছিল। তিন জনে যুদ্ধ করেন নাই, এক জনে করিয়াছিলেন। হঠাৎ আক্রমণ করেন নাই—জরাসন্ধকে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইতে বিশেষ অবকাশ দিয়াছিলেন—এমন কি, পাছে যুদ্ধে আমি মারা পড়ি, এই ভাবিয়া যুদ্ধের পূর্বে জরাসন্ধ আপনার পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন, তত দূর পর্য্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরস্ত্র হইয়া জরাসন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লুকাচুরি কিছুই করেন নাই, জরাসন্ধ ভিজ্ঞাসা করিবামাত্র কৃষ্ণ আপনাদিগের স্বার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে জরাসন্ধের পুরোহিত যুদ্ধজাত অস্ত্রের বেদনা উপশমের উপযোগী ঔষধ সকল লইয়া নিকটে রহিলেন, কৃষ্ণের পক্ষে সেরূপ কোন সাহায্য ছিল না, তথাপি “অস্ত্রায় যুদ্ধ” বলিয়া তাঁহারা কোন আপত্তি করেন নাই। যুদ্ধকালে জরাসন্ধ ভীমকর্তৃক অতিশয় পীড়মান হইলে, দয়াময় কৃষ্ণ ভীমকে তত পীড়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যাহাদের এইরূপ চরিত্র, এই কার্যে তাঁহারা কেন চাতুরী করিলেন? এ উদ্দেশ্যশূন্য চাতুরী কি সম্ভব? অতি নির্বোধে, যে শঠতার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা করিলে করিতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণার্জুন, আর যাহাই হউন, নির্বোধ নহেন, ইহা শত্রুপক্ষও স্বীকার করেন। তবে এ চাতুরীর কথা কোথা হইতে আসিল? যাহার সঙ্গে এই সমস্ত জরাসন্ধ-পর্ব্বাধ্যায়ের অনৈক্য, সে কথা ইহার ভিতর কোথা হইতে আসিল। ইহা কি কেহ বসাইয়া দিয়াছে? এই কথাগুলি কি প্রক্ষিপ্ত? এই বৈ এ কথার আর কোন উত্তর নাই। কিন্তু সে কথাটা আর একটু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা উচিত।

আমরা দেখিয়াছি যে, মহাভারতে কোন স্থানে কোন একটি অধ্যায়, কোন স্থানে কোন একটি পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। যদি একটি অধ্যায়, কি একটি পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, তবে একটি অধ্যায় কি একটি পর্ব্বাধ্যায়ের অংশবিশেষ বা কতক শ্লোক তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না কি? বিচিত্র কিছুই নহে। বরং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলেই এইরূপ ভুরি ভুরি হইয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা। এই জন্যই বেদাদির এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, বামাণ্যাদি গ্রন্থের এত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ, এমন কি শকুন্তলা মেঘদূত প্রভৃতি আধুনিক (অপেক্ষাকৃত আধুনিক) গ্রন্থেরও এত বিবিধ পাঠ। সকল গ্রন্থেরই মৌলিক অংশের

ভিতর এইরূপ এক একটা বা দুই চারিটা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়—
মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহা পাওয়া যাইবে, তাহার বিচ্ছিন্ন কি ?

কিন্তু যে শ্লোকটা আমার মতের বিরোধী সেইটাই যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমি বাদ দিব, তাহা হইতে পারে না। কোনটি প্রক্ষিপ্ত—কোনটি প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দেখিয়া পরীক্ষা করা চাই। যেটাকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিব, আমাকে অবশ্য দেখাইয়া দিতে হইবে যে, প্রক্ষিপ্তের চিহ্ন উহাতে আছে, চিহ্ন দেখিয়া আমি উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেছি।

অতি প্রাচীন কালে যাহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধরিবার উপায়, আভ্যন্তরিক প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। আভ্যন্তরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—অসঙ্গতি, অনৈক্য। যদি দেখি যে কোন পুথিতে এমন কোন কথা আছে যে, সে কথা গ্রন্থের আর সকল অংশের বিরোধী, তখন স্থির করিতে হইবে যে, হয় উহা গ্রন্থকারের বা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ ঘটয়াছে, নয় উহা প্রক্ষিপ্ত। কোনটি ভ্রমপ্রমাদ, আর কোনটি প্রক্ষিপ্ত, তাহাও সহজে নিরূপণ করা যায়। যদি রামায়ণের কোন কাপিতে দেখি যে, লেখা আছে যে, রাম উশ্মিলাকে বিবাহ করিলেন, তখনই সিদ্ধান্ত করিব যে, এটা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদ মাত্র। কিন্তু যদি দেখি যে এমন লেখা আছে যে, রাম উশ্মিলাকে বিবাহ করায় লক্ষ্মণের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল, তার পর রাম, লক্ষ্মণকে উশ্মিলা ছাড়িয়া দিয়া মিটমাট করিলেন, তখন আর বলিতে পারিব না যে এ লিপিকার বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ—তখন বলিতে হইবে যে এটুকু কোন ভ্রাতৃসৌহার্দ রসে রসিকের রচনা, ঐ পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন, আমি দেখাইয়াছি যে জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ের যে কয়টা কথা আমাদের এখন বিচার্য্য, তাহা ঐ পর্ববাধ্যায়ের আর সকল অংশের সম্পূর্ণ বিরোধী। আর ইহাও স্পষ্ট যে, ঐ কথাগুলি এমন কথা নহে যে, তাহা লিপিকারের বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বলিয়া নির্দিষ্ট করা যায়। সুতরাং ঐ কথাগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার আমাদের অধিকার আছে।

ইহাতেও পাঠক বলিতে পারেন যে, যে এই কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত করিল, সেই বা এমন অসংলগ্ন কথা প্রক্ষিপ্ত করিল কেন ? তাহারই বা উদ্দেশ্য কি ? এ কথাটার মীমাংসা আছে। আমি পুনঃপুনঃ বুঝাইয়াছি যে, মহাভারতের তিন স্তর দেখা যায়। তৃতীয় স্তর নানা ব্যক্তির গঠিত। কিন্তু আদিম স্তর, এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাতের। এই দুই জনেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাঁহাদের রচনাপ্রণালী স্পষ্টতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির,

দেখিলেই চেনা যায়। যিনি দ্বিতীয় জন্মের প্রণেতা তাঁহার রচনার কতকগুলি লক্ষণ আছে, বৃদ্ধপর্বগুলিতে তাঁহার বিশেষ হাত আছে—এ পর্বগুলির অধিকাংশই তাঁহার প্রণীত, সেই সকল সমালোচন কালে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই করির রচনার অস্বাভাবিক লক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইনি কৃষ্ণকে চতুরচূড়ামণি সাজাইতে বড় ভালবাসেন। বুদ্ধির কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা ইহার নিকট আদরণীয়। এরূপ লোক এ কালেও বড় দুর্লভ নয়। এখনও বোধ হয় অনেক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোক আছেন যে কৌশলবিদ বুদ্ধিমান চতুরই তাঁহাদের কাছে মনুষ্যত্বের আদর্শ। ইউরোপীয় সমাজে এই আদর্শ বড় প্রিয়—তাহা হইতে আধুনিক Diplomacy বিজ্ঞান সৃষ্টি। বিস্মার্ক এক দিন জগতের প্রধান মনুষ্য ছিলেন। থেমিষ্টক্লিসের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহারা এই বিজ্ঞান পটু, তাঁহারা ই ইউরোপে মাণ্ড—“Francis d' Assisi বা Imitation of Christ” গ্রন্থের প্রণেতাকে কে চিনে? মহাভারতের দ্বিতীয় কবিরও মনে সেইরূপ চরমাদর্শ ছিল। আবার কৃষ্ণের দৈবরসে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাই তিনি পুরুষোত্তমকে কৌশলীর শ্রেষ্ঠ সাজাইয়াছেন। তিনি মিথ্যা কথার দ্বারা জোপহত্যা সম্বন্ধে বিশ্বাস উপজন্মের প্রণেতা। জয়দ্রথবধে সুদর্শনচক্রে রবি আচ্ছাদন, কর্ণাজ্জনের যুদ্ধে অর্জুনের রথচক্র পৃথিবীতে পুতিয়া ফেলা, আর ঘোড়া বসাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি কৃষ্ণকৃত অভূত কৌশলের তিনিই রচয়িতা। এক্ষণে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, জরাসন্ধবধ-পর্বাদ্যায় এই অনর্থক এবং অসংলগ্ন কৌশলবিষয়ক প্রাক্কিপ্ত শ্লোকগুলির প্রণেতা তাঁহাকেই বিবেচনা হয়, এবং তাঁহাকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচনা করিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর বড় অন্ধকার থাকে না। কৃষ্ণকে কৌশলময় বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কেবল এইটুকুর উপর নির্ভর করিতে হইলে হয়ত আমি এত কথা বলিতাম না। কিন্তু জরাসন্ধবধ-পর্বাদ্যায়ের তাঁর হাত আরও দেখিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ-জরাসন্ধ-সংবাদ

নিশীথকালে যজ্ঞাগারে জরাসন্ধ স্নাতকবেশধারী তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। এখানে কিছুই প্রকাশ নাই যে, তাঁহার জরাসন্ধের পূজা

গ্রহণ করিলেন কি না। আর এক স্থানে আছে। মূলের উপর আর একজন কারিগরি করায় এই রকম গোলযোগ ঘটিয়াছে।

তৎপরে সৌজন্য-বিনিময়ের পর জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, “হে বিপ্রগণ। আমি জানি, স্নাতকব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন কখন মালা * বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ; অঙ্গে পুষ্পমালা ও অমুলেপন সুশোভিত; ভুজে জ্যাচিহ্ন লঙ্কিত হইতেছে, আকার দর্শনে ক্ষত্রতেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া, নির্ভয়ে চৈতক পর্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা বীৰ্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। আরও, আপনারা আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন না? এক্ষণে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন বলুন।”

তদন্তরে কৃষ্ণ স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরে (মৌলিক মহাভারতে কোথাও দেখি না যে কৃষ্ণ চঞ্চল বা ক্রুদ্ধ হইয়া কোন কথা বলিলেন, তাঁহার সকল রিপুই বশীভূত) বলিলেন, “হে রাজান্। তুমি আমাদের স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিই স্নাতক-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্ হয় বলিয়া আমরা পুষ্পধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান, বাবীৰ্য্যশালী নহেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের অপ্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ করা নিকারিত আছে।”

কথাগুলি শাস্ত্রোক্ত ও চতুরের কথা বটে, কিন্তু কৃষ্ণের যোগ্য কথা নহে, সত্যপ্রিয় ধর্ম্মাত্মার কথা নহে। কিন্তু যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে তাহাকে এইরূপ উত্তর কাজেই দিতে হয়। ছদ্মবেশটা যদি দ্বিতীয় স্তরের কবির সৃষ্টি হয়, তবে এ বাক্যগুলির জন্ত তিনিই দায়ী। কৃষ্ণকে যে রকম চতুরচূড়ামনি সাজাইতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এই উত্তর

* লিখিত আছে যে, মালা তাঁহার একজন মালাকারের নিকট বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়াছিলেন। বীহাদের এত ঐক্য যে রাজসূয়ের অন্তর্গত প্রবৃত্ত, তাঁহাদের তিন ছড়া মালা কিনিবার যে কড়ি জুটবে না, ইহা অতি অসম্ভব। বীহারী কণটদূতাগলভ রাজাই ধর্ম্মানুযায়ী পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার যে ডাকাতি করিয়া তিন ছড়া মালা সংগ্রহ করিলেন, উহা অতি অসম্ভব। এ সকল দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত। বৃহৎ ক্ষত্রতেজের বর্ণনায় এ সকল কথা বেশ সাজে।

তাহার অঙ্গ বটে। কিন্তু যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ বলিয়া চলনা করিবার কৃষ্ণের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কৃত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার। শত্রুভাবে যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন, তাহাও স্পষ্টই বলিতেছেন।

“বিধাতা কৃত্রিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজনু! যদি তোমার আমাদের বাহুবল দেখিতে বাসনা থাকে, তবে অস্ত্রই দেখিতে পাইবে, সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রথনন্দন! ধীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশভাবে এবং বৃহদগৃহে প্রকাশভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে রাজনু! আমরা স্বকাৰ্য্যসাধনার্থ শত্রুগৃহে আগমন করিয়া তদন্ত পূজা গ্রহণ করি না; এই আমাদের নিত্যব্রত।”

কোন গোল নাই—সব কথাগুলি স্পষ্ট। এইখানে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশের গোলযোগটা মিটিয়া গেল। দেখা গেল যে, ছদ্মবেশের কোন মানে নাই। তার পর, পর-অধ্যায়ে কৃষ্ণ যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকার। তাঁহার যে উন্নত চরিত্র এ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি, সে তাহারই যোগ্য। পূর্ব্ব অধ্যায়ে এবং পর-অধ্যায়ে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রে এত গুরুতর প্রভেদ যে, দুই হাতের বর্গন বলিয়া বিবেচনা করিবার আমাদের অধিকার আছে।

জরাসন্ধের গৃহকে কৃষ্ণ তাঁহাদের শত্রুগৃহ বলিয়া নির্দেশ করাতে, জরাসন্ধ বলিলেন, “আমি কোন সময়ে তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ।”

উক্তরে, জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শত্রুতা, তাহাই বলিলেন। তাঁহার নিজের সঙ্গে জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপনা করিলেন না। নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্ত কেহ তাঁহার শত্রু হইতে পারে না, কেন না তিনি সর্বত্র সমদর্শী, শত্রুমিত্র সমান দেখেন। তিনি পাণ্ডবের মুহুদ এবং কৌরবের শত্রু, এইরূপ লৌকিক বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবিক মৌলিক মহাভারতের সমালোচনে আমরা ক্রমশঃ দেখিব যে, তিনি ধর্ম্মের পক্ষ, এবং অধর্ম্মের বিপক্ষ; তত্ত্বির তাঁহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আমরা এখানে দেখিব যে, কৃষ্ণ উপযাচক হইয়া জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন, কিন্তু নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্ত তাঁহাকে শত্রু বলিয়া নির্দেশ করিলেন না। তবে যে মহুগুজাতির শত্রু, সে কৃষ্ণের শত্রু। কেন না আদর্শ পুরুষ সর্বভূতে আপনাকে দেখেন, তত্ত্বির তাঁহার অস্ত্র প্রকার আত্মজ্ঞান নাই। তাই তিনি জরাসন্ধের প্রশ্নের উত্তরে, জরাসন্ধ

তাহার যে অপকার করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ মাত্র না করিয়া সাধারণের যে অনিষ্ট করিয়াছে, কেবল তাহাই বলিলেন। বলিলেন যে, তুমি রাজগণকে মহাদেবের নিকট বলি দিবার জন্য বন্দী করিয়া রাখিয়াছ। তাই, যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে, আমরা তোমার প্রতি সমুদ্রত হইয়াছি। শত্রুতাটা বুঝাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিতেছেন :—

“হে বৃহদ্রথনন্দন! আমরাগিকেও স্বংকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্মচারী এবং ধর্মরক্ষণে সমর্থ।”

এই কথাটার প্রতি পাঠক বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এই ভরসায় আমরা ইহা বড় অক্ষরে লিখিলাম। এখন, পুরাতন বলিয়া বোধ হইলেও, কথাটা অতিশয় গুরুতর। যে ধর্মরক্ষণ ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারী। অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম। “আমি ত কোন পাপ করিতেছি না, পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ কি?” যিনি এইরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনিও পাপী। কিন্তু সচরাচর ধর্ম্মাচারীও তাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য জগতে যে সকল নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা এই ধর্ম্মরক্ষা ও পাপনিবারণত্রে গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ, যিশুখ্রিষ্ট প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। এই বাক্যই তাঁহাদের জীবনচরিতের মূলমন্ত্র। খ্রীকৃষ্ণেরও সেই ব্রত। এই মহাবাক্য স্মরণ না রাখিলে তাঁহাদের জীবনচরিত বুঝা যাইবে না। জরাসন্ধ কংস শিশুপালের বধ, মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা, কৃষ্ণের এই সকল কার্য্য এই মূলমন্ত্রের সাহায্যেই বুঝা যায়। ইহাকেই পুরাণকারেরা “পৃথিবীর ভারহরণ” বলিয়াছেন। খ্রিষ্টকৃত হউক, বুদ্ধকৃত হউক, কৃষ্ণকৃত হউক, এই পাপনিবারণ ত্রয়ের নাম ধর্ম্মপ্রচার। ধর্ম্মপ্রচার দুই প্রকারে হইতে পারে ও হইয়া থাকে; এক, বাক্যতঃ অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশের দ্বারা; দ্বিতীয়, কার্য্যতঃ অর্থাৎ আপনার কার্য্য সকলকে ধর্ম্মের আদর্শে পরিণত করণের দ্বারা। খ্রিষ্ট, শাক্যসিংহ ও খ্রীকৃষ্ণ এই দ্বিবিধ অমুল্যতানই করিয়াছিলেন। তবে শাক্যসিংহ ও খ্রিষ্টকৃত ধর্ম্মপ্রচার, উপদেশপ্রধান; কৃষ্ণকৃত ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যপ্রধান। ইহাতে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য, কেন না, বাক্য সহজ, কার্য্য কঠিন এবং অধিকতর কলোপধায়ক। যিনি কেবল মায়াব, তাঁহার দ্বারা ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে কি না, সে কথা এক্ষণে আমাদের বিচার্য্য নহে।

এইখানে একটা কথাই মীমাংসা করা ভাল। কৃষ্ণকৃত কংস-শিশুপালদির বধের উল্লেখ করিলাম, এবং জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্যই কৃষ্ণ আসিয়াছেন বলিয়াছি; কিন্তু পাপীকে বধ করা কি আদর্শ মনুষ্যের কাজ? যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনি পাপাচারকেও

আদর্শবৎ সেখিয়া, তাহারও হিতাকাঙ্ক্ষী হইবেন না কেন? সত্য বটে, পানীকে জগতে রাখিলে জগতের মজল নাই, কিন্তু তাহার বধসাধনই কি জগৎ উদ্ধারের একমাত্র উপায়? পানীকে শাপ হইতে বিরত করিয়া, ধর্ম্যে প্রবৃত্তি দিয়া, জগতের এবং পানীর উভয়ের মজল এক কালে লিঙ্গ করা তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় নয় কি? আদর্শ পুরুষের তাহাই অবলম্বন করাই কি উচিত ছিল না? যিশু, শাক্যসিংহ ও চৈতন্য এইরূপে পানীর উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ কথার উত্তর হইতি। প্রথম উত্তর এই যে, কৃষ্ণচরিত্রে এ ধর্মেরও অভাব নাই। তবে ক্ষেত্রভেদে ফলভেদও ঘটিয়াছে। দুর্ঘোষণ ও কর্ণ, যাহাতে নিহত না হইয়া ধর্মপথ অবলম্বনপূর্বক জীবনে ও রাজ্যে বজায় থাকে, সে চেষ্টা তিনি বিধিমতে করিয়াছিলেন, এবং সেই কার্য্য সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন, পুরুষকারের দ্বারা যাহা সাধ্য, তাহা আমি করিতে পারি; কিন্তু দৈব আমার আয়ত্ত নহে। কৃষ্ণ মামুষী শক্তির দ্বারা কার্য্য করিতেন, তজ্জন্তু যাহা স্বভাবতঃ অসাধ্য তাহাতে যত্ন করিয়াও কখন কখন নিফল হইতেন। শিশুপালেরও শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই ক্ষমার কথাটা অলৌকিক উপস্থাসে আবৃত হইয়া আছে। যথাস্থানে আমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। কংস-বধের কথা পূর্বে বলিয়াছি।

পাইলেটকে খ্রিষ্টিয়ান করা, খ্রিষ্টের পক্ষে যত দূর সম্ভব ছিল, কংসকে ধর্মপথে আনয়ন করা কৃষ্ণের পক্ষে তত দূর সম্ভব। জরাসন্ধ সম্বন্ধেও তাই বলা যাইতে পারে। তথাপি জরাসন্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণের সে বিষয়ের একটু কথোপকথন হইয়াছিল। জরাসন্ধ কৃষ্ণের নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সে কৃষ্ণকেই ধর্মবিষয়ক একটি লেক্চার শুনাইয়া দিল, যথা—

“দেব ধর্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রিয়াকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্মজ হইয়াও নিয়মপাথে লোকের ধর্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই।” ইত্যাদি

এ সব স্থলে ধর্মোপদেশে কিছু হয় না। জরাসন্ধকে সংপথে আনিবার জন্ত উপায় ছিল কি না, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। অতিমানুষকীর্ত্তি একটা প্রচার করিলে, যা হয়, একটা কাণ্ড হইতে পারিত। তেমন অস্ত্রাশ্রয় ধর্মপ্রচারকদিগের মধ্যে অনেক দেখি, কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র অতিমানুষী শক্তির বিরোধী। ত্রীকৃষ্ণ ভূত ছাড়াইয়া, রোগ ভাল করিয়া, বা কোন প্রকার বুজুর্কী ভেল্কির দ্বারা ধর্মপ্রচার বা আপনার দেবদ্বস্থাপন করেন নাই।

তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, জরাসন্ধের বধ কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে; ধর্মের রক্ষা অর্থায় নির্দোষী অথচ প্রসিদ্ধিত রাজগণের উদ্ধারই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি জরাসন্ধকে অনেক বুঝাইয়া পরে বলিলেন, “আমি বহুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডুনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ করিয়া বনালয়ে গমন কর।” অতএব জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়া দিলে, কৃষ্ণ তাহাকে নিকৃতি দিতেন। জরাসন্ধ তাহাতে সন্মত না হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন, সুতরাং যুদ্ধই হইল। জরাসন্ধ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিচারে যাতার্থ্য স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যিশু বা বুদ্ধের জীবনীতে যতটা পতিতোদ্ধারের চেষ্টা দেখি, কৃষ্ণের জীবনে ততটা দেখি না, ইহা স্বীকার্য। যিশু বা শাক্যের ব্যবসায়ই ধর্মপ্রচার। কৃষ্ণ ধর্মপ্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্মপ্রচার তাঁহার ব্যবসায় নহে; সেটা আদর্শ পুরুষের আদর্শজীবননির্বাহের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। কথাটা এই রকম করিয়া বলাতে কেহই না মনে করেন যে, যিশুখ্রিষ্ট বা শাক্যসিংহের, বা ধর্মপ্রচার ব্যবসায়ের কিছুমাত্র লাভব করিতে ইচ্ছা করি। যিশু এবং শাক্য উভয়কেই আমি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তি করি, এবং তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়া তাহাতে জ্ঞানলাভ করিবার ভরসা করি। ধর্মপ্রচারকের ব্যবসায় (ব্যবসায় অর্থে এখানে যে কর্মের অমুষ্ঠানে আমরা সর্বদা প্রবৃত্ত) আর সকল ব্যবসায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। কিন্তু যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার সে ব্যবসায় হইতে পারে না। কারণ, তিনি আদর্শ মনুষ্য, মানুষের যত প্রকার অমুষ্ঠেয় কর্ম আছে, সকলই তাঁহার অমুষ্ঠেয়। কোন কর্মই তাঁহার “ব্যবসায় নহে,” অর্থাৎ অশ্রম কর্মের অপেক্ষা প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে না। যিশু বা শাক্যসিংহ আদর্শ পুরুষ নহেন, কিন্তু মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় অবলম্বনই তাঁহাদের বিষয়, এবং তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা লোকহিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

কথাটা যে আমার সকল শিক্ষিত পাঠক বুঝিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় না। বুঝিবার একটা প্রতিবন্ধক আছে। আদর্শ পুরুষের কথা বলিতেছি। অনেক শিক্ষিত পাঠক “আদর্শ” শব্দটি “Ideal” শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিবেন। অনুবাদ দৃষ্ট হইবে না। এখন, একটা “Christian Ideal” আছে। খ্রিষ্টিয়ানের আদর্শ পুরুষ যিশু। আমরা বাল্যকাল হইতে খ্রিষ্টিয়ান জাতির সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া সেই আদর্শটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আদর্শ পুরুষের কথা হইলেই সেই আদর্শের কথা মনে পড়ে। যে আদর্শ

সেই আদর্শের সঙ্গে মিলে না, তাহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। খ্রিষ্ট পতিতোদ্ধারী; কোন ছুরাঘাতকে তিনি প্রাণে নষ্ট করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও রাখিতেন না। শাক্যসিংহে বা চৈতন্যে আমরা সেই গুণ দেখিতে পাই, এজন্য ইহাদিগকে আমরা আদর্শ পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কৃষ্ণ পতিতপাবন নাম ধরিয়াও, প্রধানতঃ পতিত-নিপাতী বলিয়াই ইতিহাসে পরিচিত। সুতরাং তাহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়াই আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের একটা কথা বিচার করিয়া দেখা উচিত। এই Christian Ideal কি যথার্থ মনুষ্যের আদর্শ। সকল জাতির জাতীয় আদর্শ কি সেইরূপই হইবে?

এই প্রশ্নে আর একটা প্রশ্ন উঠে—হিন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে না কি? Hindu Ideal আছে না কি? যদি থাকে, তবে কে? কথাটা শিক্ষিত হিন্দুমণ্ডলীমধ্যে জিজ্ঞাসা হইলে অনেকেই মস্তককণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। কেহ হয়ত জটাবকলধারী গুপ্তশস্ত্রশুষ্কবিভূষিত ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিবেন, কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন, “ও ছাই ভস্ম নাই।” নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের এমন হৃদয় হইবে কেন? কিন্তু এক দিন ছিল। তখন হিন্দু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সে আদর্শ হিন্দু কে? ইহার উত্তর আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা পূর্বে বুঝাইয়াছি। রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ সেই আদর্শপ্রতিমার নিকটবর্তী, কিন্তু যথার্থ হিন্দু আদর্শ ত্রীকৃষ্ণ। তিনিই যথার্থ মনুষ্যের আদর্শ—খ্রিষ্ট প্রভৃতিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

কেন, তাহা বলিতেছি। মনুষ্য কি, ধর্মতত্ত্বে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফুর্তি ও সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। ঘাঁহাতে সে সকলের চরম স্ফুর্তি ও সামঞ্জস্য পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনুষ্য। খ্রিষ্টে তাহা নাই—ত্রীকৃষ্ণে তাহা আছে। যিশুর যদি রোমক সম্রাট যিহুদার শাসনকর্ত্ত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি স্মৃশাসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না—কেন না, রাজকার্য্যের জন্য যে সকল বৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহার অহুশীলিত হয় নাই। অথচ এরূপ ধর্ম্মাঘাত ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে ত্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ, তাহা প্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ভূরি ভূরি বর্ণিত হইয়াছেন, এবং যুধিষ্ঠির বা উগ্রসেন শাসনকার্য্যে তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ করিতেন না। এইরূপে কৃষ্ণ নিজে রাজা না হইয়াও প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন—

এই জরাসন্ধের বন্দীগণের মুক্তি তাহার এক উদাহরণ। পুনশ্চ, মনে কর, যদি যুদ্ধদীরা রোমন্থকের অভ্যাসচরিত্রিত হইয়া স্বাধীনতার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া, যিশুর সেনাপতিবে বরণ করিত, যিশু কি করিতেন? যুদ্ধে তাঁহার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। “কাইসরের পাওনা কাইসরকে দাও” বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন। কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশূন্য—কিন্তু ধর্মার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি অজ্ঞেয় ছিলেন। যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রবিৎ। অস্ত্রাশ্রয় গুণ সম্বন্ধেও ঐক্যপ। উভয়েই জ্যেষ্ঠ ধার্মিক ও ধর্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য—“Christian Ideal” অপেক্ষা “Hindu Ideal” জ্যেষ্ঠ।

ঈদৃশ সর্বগুণসম্পন্ন আদর্শ মনুষ্য কার্যাবিশেষে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন না। তাহা হইলে, ইতর কার্যগুলি অননুষ্ঠিত, অথবা অসামঞ্জস্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। লোক চরিত্রভেদে, অবস্থাভেদে, শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের অধিকারী; আদর্শ মনুষ্য, সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের, শাক্যসিংহ, যিশু বা চৈতন্যের স্থায় সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক ধর্ম প্রচার ব্যবসায়স্বরূপ অবলম্বন করা অসম্ভব। কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী, এবং ধর্মপ্রচারক; সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্মবেত্তাদিগের এবং একাধারে সর্বদাপ্রাণ মনুষ্যের আদর্শ। জরাসন্ধাদির বধ আদর্শরাজপুরুষ ও দণ্ড-প্রণেতার অবশ্য অনুষ্টেয়। ইহাই Hindu Ideal. অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ বা খ্রিষ্ট ধর্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আদর্শ স্থানে বসাইয়া, সম্পূর্ণ যে হিন্দুধর্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আমরা বুঝিতে পারিব না।

কিন্তু বুঝিবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, কেন না, ইহার ভিতর আর একটা বিস্ময়কর কথা আছে। কি খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপে, কি হিন্দুধর্মাবলম্বী ভারতবর্ষে, আদর্শের ঠিক বিপরীত ফল ফলিয়াছে। খ্রিষ্টীয় আদর্শ পুরুষ, বিনীত, নিরীহ, নির্বিবরোধী, সন্ন্যাসী; এখনকার খ্রিষ্টিয়ান ঠিক বিপরীত। ইউরোপ এখন ঐহিক সুখরত সশস্ত্র যোদ্ধাবর্গের বিস্তীর্ণ শিবির মাত্র। হিন্দুধর্মের আদর্শ পুরুষ সর্বকর্মকৃৎ—এখনকার হিন্দু সর্ব কর্মে অকর্ম্ম। এরূপ ফলবিপরীততা ঘটিল কেন? উত্তর সহজ,—লোকের চিন্তা হইতে উভয় দেশেই সেই প্রাচীন আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে। উভয় দেশেই এককালে সেই আদর্শ এক দিন প্রবল ছিল—প্রাচীন খ্রিষ্টিয়ানদিগের ধর্মপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা, ও প্রাচীন হিন্দু রাজগণ ও রাজপুরুষগণের সর্বগুণবন্তা তাহার প্রমাণ। যে দিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিন্তা হইতে

মিস্ট্রিক হইল—যে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদের শাসনাত্মক অবনতি। জরদেব গোসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ মরণ করে না।

এখন আবার সেই আদর্শ পুঙ্খবৎ জাতীয় হৃদয়ে আগরিত করিতে হইবে। ভরসা করি, এই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় সে কার্যের কিছু আশুকূল্য হইতে পারিবে।

জরাসন্ধবধের ব্যাখ্যায় এ সকল কথা বলিবার তত প্রয়োজন ছিল না, প্রসঙ্গতঃ এ তব উৎখাপিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু এ কথাগুলি এক স্থানে না এক স্থানে আমাকে বলিতে হইত। আগে বলিয়া রাখায় লেখক পাঠক উভয়ের পথ সুগম হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভীম জরাসন্ধের যুদ্ধ

আমরা এ পর্য্যন্ত কৃষ্ণচরিত্র যত দূর সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে মহাভারতে কৃষ্ণকে কোথাও বিষ্ণু বলিয়া পরিচিত হইতে দেখি নাই। কেহ তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধন বা বিষ্ণুজ্ঞানে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করে নাই। তাঁহাকেও এ পর্য্যন্ত মহুগ্ৰ-শক্তির অতিরিক্ত শক্তিতে কোন কার্য করিতে দেখি নাই। তিনি বিষ্ণুর অবতার হউন বা না হউন, কৃষ্ণচরিত্রের স্মূল মর্শ্ব মহুগ্ৰ, দেবত্ব নহে, ইহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়াছি।

কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইহার পরে মহাভারতের অনেক স্থানে তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধিত এবং পরিচিত হইতে দেখি। অনেকে বিষ্ণু বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে দেখি; এবং কদাচ কখনও তাঁহাকে লোকাতীতা বৈষ্ণবী শক্তিতে কার্য করিতেও দেখি; এ পর্য্যন্ত তাহা দেখি নাই, কিন্তু এখনই দেখিব। এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী কি না?

যদি কেহ বলেন যে, এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী নহে, কেন না, যখন দৈব শক্তির বা দেবত্বের কোন প্রকার বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন কাব্যে বা ইতিহাসে কেবল মহুগ্ৰভাব প্রকটিত হয়, আর যখন তাহার প্রয়োজন আছে, তখন দৈবভাব প্রকটিত হয়; তাহা হইলে আমরা বলিব যে, এই উত্তর যথার্থ হইল না। কেন না, নিম্নপ্রয়োজনেই দৈবভাবের প্রকাশ অনেক সময়ে দেখা যায়। এই জরাসন্ধবধ হইতেই দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

জরাসন্ধবধের পর কৃষ্ণ ও ভীমশূন্য জরাসন্ধের রথখানা পইয়া তাহাতে আরোহণ-পূর্বক নিক্রান্ত হইলেন। দেবনির্ঘূত রথ, তাহাতে কিছুই অভাব নাই। তদু-খানখাই কৃষ্ণ গরুড়কে স্বরণ করিলেন, স্বরণমাত্র গরুড় আসিয়া রথের চড়ায় বসিলেন। গরুড় আসিয়া আর কোন কাজ করিলেন না, তাহাতে আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। কথাটারও আর কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, কেবল মাঝে হইতে কৃষ্ণের বিক্ষুব্ধ সৃষ্টি হয়। জরাসন্ধকে বধ করিবার সময় কোন দৈব শক্তির প্রয়োজন হইল না, কিন্তু রথে চড়িবার বেলা হইল।

আবার যুদ্ধের পূর্বে, অমনি একটা কথা আছে। জরাসন্ধ যুদ্ধে হিরসংকল্প হইলে কৃষ্ণ ভিজ্ঞাসা করিলেন,

“হে রাজন্! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয় বল? কে যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবে?” জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অথচ ইহার দুই ছত্র পূর্বেই লেখা আছে যে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্বরণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাঁহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না।

ব্রহ্মার এই আদেশ কি, তাহা মহাভারতে কোথাও নাই। পরবর্তী গ্রন্থে আছে। এখন পাঠকের বিশ্বাস হয় না কি যে, এইগুলি আদিম মহাভারতের মূলের উপর পরবর্তী লেখকের কারিগরি? আর কৃষ্ণের বিক্ষুব্ধ ভিতরে ভিতরে খাড়া রাখা ইহার উদ্দেশ্য? আদিম স্তরের মূলে কৃষ্ণবিষ্মতে কোনরূপ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয় নাই, কেন না কৃষ্ণচরিত্র মনুজচরিত্র; দেবচরিত্র নহে। যখন ইহাতে কৃষ্ণোপাসক দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত পড়িল, তখন এটা বড় ভুল বলিয়া বোধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরবর্তী কবিকল্পনাটা তাঁহার জানা ছিল, তিনি অভাব পূরণ করিয়া দিলেন।

এইরূপ, যেখানে বন্ধনবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কৃষ্ণকে ধর্ম্মরক্ষার জন্ত ধন্যবাদ করিতেছেন, সেখানেও, কোথাও কিছু নাই, খানকা তাঁহারা কৃষ্ণকে “বিষ্ণো” বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। এখন ইতিপূর্বে কোথাও দেখা যায় না যে, তিনি বিষ্ণু বা তদর্থক অন্ত নামে সম্বোধিত হইয়াছেন। যদি এমন দেখিতাম যে, ইতিপূর্বে কৃষ্ণ এরূপ নামে মধ্যে মধ্যে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে বুঝিতাম যে ইহাতে অসঙ্গত বা অনৈসগিক কিছুই নাই, লোকের এমন বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহা হইল। যদি এমন দেখিতাম যে, এই সময়ে কৃষ্ণ কোন অলৌকিক কাজ করিয়াছেন, তাহা দেবতা ভিন্ন মহেশ্বরের সাধ্য নহে, তাহা হইলেও হঠাৎ এ “বিষ্ণো!” সম্বোধনের উপযোগিতা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু কৃষ্ণ তেমন কিছুই কাজ করেন নাই। তিনি জরাসন্ধকে বধ করেন শাই—

সর্বলোকসমক্ষে ভীম তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। সে কার্যের প্রবর্তক কৃষ্ণ বটে, কিন্তু কারাবাসী রাজগণ তাহার কিছুই জানেন না। অতএব কৃষ্ণে অকস্মাৎ রাজগণ কর্তৃক এই বিকৃত আয়োগ কখন ঐতিহাসিক বা মৌলিক হইতে পারে না। কিন্তু উহা ঐ গুরুত্ব অরূপ ও ব্রহ্মার আদেশ শ্রবণের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গত, জরাসন্ধবধের আর কোন অংশের সঙ্গে সঙ্গত নহে। তিনটি কথা এক হাতের কারিগরি—আর তিনটা কথাই মূলান্তিরিক্ত। বোধ হয়, ইহা পাঠকের মননকল হইয়াছে।

তাহারা বলিবেন, তাহা হয় নাই, তাঁহাদিগের এ কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনের অন্তিমার্গ হইবার আর কোন ফল দেখি না। কেন না, এ সকল বিষয়ে অল্প কোন প্রকার প্রমাণ সংগ্রহের সম্ভাবনা নাই। আর এই সমালোচনার যাহাদের এমন বিশ্বাস হইয়াছে যে, জরাসন্ধবধ মধ্যে কৃষ্ণের এই বিকৃতসূচনা পরবর্তী কবি শ্রীকৃষ্ণ ও প্রকৃষ্ণ, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, তবে কৃষ্ণের ছদ্মবেশ ও কপটাচার বিষয়ক যে কয়েকটি কথা এই জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে আছে, তাহাও ঐরূপ প্রকৃষ্ণ বলিয়া পরিত্যাগ করিব না কেন? দুই বিষয়ই ঠিক একই প্রমাণের উপর নির্ভর করে।

বস্তুতঃ এই দুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, এই জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে পরবর্তী কবির বিলক্ষণ কারিগরি আছে, এবং এই সকল অসঙ্গতি তাহারই ফল। দুই কবির যে হাত আছে, তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি।

জরাসন্ধের পূর্ববৃত্তান্ত কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে বিবৃত করিলেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। সেই সঙ্গে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের কংসবধজনিত যে বিরোধ তাহারও পরিচয় দিলেন। তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃতও করিয়াছি। তাহার পরেই মহাভারতকার কি বলিতেছেন, শুনি।

“বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভার্য্যাস্বয় সমভিব্যাহারে তপোবনে বহুদিবস তপোহুষ্ঠান করিয়া স্বর্ণ গমন করিলেন। তাহারা জরাসন্ধ ও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদায় বর লাভ করিয়া নিকটকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ বাহুবল কংস নরপতিকে সংহার করেন। কংসনিপাত নিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল।”

এ সকলই ত কৃষ্ণ বলিয়াছেন—আরও সবিস্তার বলিয়াছেন—আবার সে কথা কেন? প্রয়োজন আছে। মূল মহাভারতপ্রণেতা অদ্বৈতরসে বড় রসিক নহেন—কৃষ্ণ অলৌকিক ঘটনা কিছুই বলিলেন না। সে অভাব এখন পূরিত হইতে চলিল। বৈশম্পায়ন বলিতেছেন,—

“মহারল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরিজেয় মধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহৎ গদা একোনশত যার দুর্গায়মান করিয়া নিক্ষেপ করিল। গদা মধুরাহিত অদ্ভুত কণ্ঠি বায়ুদেবের একোনশত যোজন অন্তরে পতিত হইল। পৌরগণ কক্ষসমীপে গদাপতনের বিষয় নিবেদন করিল। তদবধি সেই মধুরার সমীপবর্তী স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল।”

এখনও যদি কোন পাঠকের বিশ্বাস থাকে যে, বর্তমান জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ের সমুদায় অংশই মূল মহাকাব্যের অন্তর্গত এবং একব্যক্তি প্রসীদ, এবং কৃত্তবীজ যদ্যর্থই হস্তবশে গিরিজে আসিয়াছিলেন, তবে তাঁহাকে অজ্ঞান করি হিন্দুধর্মের পুরাণগতিহাস মধ্যে ঐতিহাসিক তত্ত্বের অজ্ঞান পরিচয় করিয়া অন্ধ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। এদিকে কিছু হইবে না।

অতঃপর, জরাসন্ধবধের অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া এ পর্বাধ্যায়ের উপসংহার করিব ; সে সকল খুব সোজা কথা।

জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ ভীমকে মনোনীত করিলে, জরাসন্ধ “যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্তৃক কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষত্রধর্মামুসারে বর্ম ও কিরীট পরিত্যাগ পূর্বক” যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। “তখন যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বনিতা ও যুদ্ধগণ তাঁহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ হইল।” “চতুর্দশ দিবস যুদ্ধ হইল।” (যদি সত্য হয়, বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত) চতুর্দশ দিবসে “বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্রান্ত দেখিয়া ভীমকর্ত্তা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৌশ্লেয়। ক্রান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে ; অধিকতর পীড়মান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে। অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্ষভ, ইহার সহিত বাধ্যযুদ্ধ কর।” (অর্থাৎ যে শত্রুকে ধর্মতঃ বধ করিতে হইবে, তাহাকেও পীড়ন কর্তব্য নহে।) ভীম জরাসন্ধকে পীড়ন করিয়াই বধ করিলেন। ভীমের ধর্মজ্ঞান কৃষ্ণের তুল্য হইতে পারে না।

তখন কৃষ্ণার্জুন ও ভীম কারাবদ্ধ মহাপালগণকে বিমুক্ত করিলেন। তাহাই জরাসন্ধবধের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব রাজগণকে মুক্ত করিয়া আর কিছুই করিলেন না, দেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা Annexationist ছিলেন না—পিতার অপরাধে পুত্রের রাজ্য অপহরণ করিতেন না, তাঁহারা জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সহদেব কিছু নজর দিল, তাহা গ্রহণ করিলেন। কারামুক্ত রাজগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“একশ্রেণে এই ভৃত্যদিগকে কি করিতে হইতে অহমতি করুন।”

কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কহিলেন,

“রাজ্য যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্য-চিকীর্ষু ধাম্বিকের সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা।”

যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়া ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করা, কৃষ্ণের একশ্রেণে জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব প্রতি পদে তিনি তাহার উত্তোগ করিতেছেন।

এই জরাসন্ধবধে কৃষ্ণচরিত্রের বিশেষ মহিমা প্রকাশমান—কিন্তু পরবর্তী লেখক-দিগের দৌরাণ্যে ইহা বড় জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর শিশুপালবধ। সেখানে আরও গণ্ডগোল।

নবম পরিচ্ছেদ

অর্থাভিহরণ

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হইল। নানাদিক্দেশ হইতে আগত রাজগণ, ঋষিগণ, এবং অন্তান্ত জ্ঞেয়ীরা লোকে রাজধানী পুরিয়া গেল। এই বৃহৎ কার্যের সুনির্বাহ জন্ত পাণ্ডবেরা আত্মীয়বর্গকে বিশেষ বিশেষ কার্যে নিযুক্ত করিলেন। হুঃশাসন ভোজ্য জ্ব্যের তত্ত্বাবধানে, সজ্জয় পরিচর্যায়, কৃপাচার্য্য রত্নরক্ষায় ও দক্ষিণাদানে, দুর্ঘোষন উপায়নপ্রতিগ্রহে, ইত্যাদি রূপে সকলকেই নিযুক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন কার্যে নিযুক্ত হইলেন? হুঃশাসনাদির নিয়োগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগের কথাও লেখা আছে। তিনি ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন।

কথাটা বুঝা গেল না। শ্রীকৃষ্ণ কেন এই ভৃত্যোপযোগী কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? তাঁহার যোগ্য কি আর কোন ভাল কাজ ছিল না? না, ব্রাহ্মণের পা ধোয়াই বড় মহৎ কাজ? তাঁহাকে আদর্শপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া কি পাচক ব্রাহ্মণঠাকুরদিগের পাদপ্রক্ষালন করিয়া বেড়াইতে হইবে? যদি তাই হয়, তবে তিনি আদর্শপুরুষ নহেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

কথাটার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণগণের প্রচারিত এবং এখনকার প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের গৌরব বাড়াইবার জন্তই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এইটিতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ ব্যাখ্যা অতি

অজ্ঞেয় বলিয়া আমাদেরই বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞাত ক্রিয়াদিগের জ্ঞায় ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও ব্রাহ্মণের গৌরব প্রচারের জন্ত বিশেষ ব্যস্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে তাঁহাকে বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দেখি। যদি বনপর্বে দুর্বার্যাসার আভিষ্য বৃত্তান্তটা মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি রকম স্কম করিয়া ব্রাহ্মণঠাকুরদিগকে পাণ্ডবদিগের আশ্রম হইতে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ঘোরতর সাম্যবাদী। গীতোক্ত ধর্ম যদি কুশোক্ত ধর্ম হয়, তবে

বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

তিনি চৈব ধর্মকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৫ ॥ ১৭

তাঁহার মতে ব্রাহ্মণে, গোরুতে, হাতিতে, কুকুরে ও চণ্ডালে সমান দেখিতে হইবে। তাহা হইলে ইহা অসম্ভব যে, তিনি ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধির জন্ত তাঁহাদের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইবেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবার জন্তই এই ভূতাকার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাস্য, তবে কেবল ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনেই নিযুক্ত কেন? বয়োবৃদ্ধ ক্রিয়গণেরও পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত নহেন কেন? আর ইহাও বক্তব্য যে, এইরূপ বিনয়কে আমরা আদর্শ বিনয় বলিতে পারি না। এটা বিনয়ের বড়াই।

অন্তে বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণচরিত্র সময়োপযোগী। সে সময়ে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি বড় প্রবল ছিল; কৃষ্ণ ধূর্ত, পশার করিবার জন্ত এইরূপ অলৌকিক ব্রহ্মভক্তি দেখাইতেছিলেন।

আমি বলি, এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। কেন না, আমরা এই শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ের অন্ত অধ্যায়ে (চৌয়াল্লিশে) দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত না থাকিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়োচিত ও বীরোচিত কার্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় লিখিত আছে, “মহাবাহু বাসুদেব শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ পূর্বক সমাপন পর্যন্ত ঐ যন্তর রক্ষা করিয়াছিলেন।” হয়ত দুইটা কথাই প্রক্ষিপ্ত। আমরা এ পরিচ্ছেদে এ কথার বেশী আলোচনা আবশ্যক বিবেচনা করি না। কথাটা তেমন গুরুতর কথা নয়। কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে মহাভারতীয় উক্তি অনেক সময়েই পরস্পর অসঙ্গত, ইহা দেখাইবার জন্তই এতটা বলিলাম। নানা হাতের কাছ বলিয়া এত অসঙ্গতি।

এই রাজস্বয় যজ্ঞের মহাভারত কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা নিহত হয়েন। পাণ্ডবদিগের সংগ্রাম মাত্রে থাকিয়া কৃষ্ণের এই এক মাত্র অস্ত্র ধারণ বলিলেও হয়। খাণ্ডবদাহের যুদ্ধটা আমরা বড় মৌলিক বলিয়া ধরি নাই, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে।

শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ে একটা গুরুতর ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। বলিতে গেলে, তেমন গুরুতর ঐতিহাসিক তথ্য মহাভারতের আর কোথাও নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, জরাসন্ধবধের পূর্বে, কৃষ্ণ কোথাও মৌলিক মহাভারতে, দেবতা বা ঈশ্বরাবতার-স্বরূপ অভিহিত বা স্বীকৃত নহেন। জরাসন্ধবধে, সে কথাটা অমনি অকুট রকম আছে। এই শিশুপালবধেই প্রথম কৃষ্ণের সমসাময়িক লোক কর্তৃক তিনি জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত। এখানে কুরুবংশের তাৎকালিক নেতা ভীষ্মই এই মতের প্রচারকর্তা।

এখন ঐতিহাসিক স্কুল প্রস্তুত। এই যে যখন দেখিয়াছি যে কৃষ্ণ তাঁহার জীবনের প্রথমার্ধে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত নহেন, তখন জানিতে হইবে, কোন্ সময়ে তিনি প্রথম ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইলেন? তাঁহার জীবিতকালেই কি ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন? দেখিতে পাই বটে যে এই শিশুপালবধে, এবং তৎপরবর্তী মহাভারতের অন্ত্যস্ত অংশে তিনি ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইতেছেন। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায় এবং সেই সেই অংশ প্রাক্কৃত। এ প্রশ্নের উত্তরে কোন্ পক্ষ অবলম্বনীয়?

এ কথার আমরা এক্ষণে কোন উত্তর দিব না। ভরসা করি ক্রমশঃ উত্তর আপনিই পরিষ্কৃত হইবে। তবে ইহা বক্তব্য যে, শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়, যদি মৌলিক মহাভারতের অংশ হয়, তবে এমন বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, এই সময়েই কৃষ্ণ ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন। এবং এ বিষয়ে তাঁহার স্বপক্ষ বিপক্ষ দুই পক্ষ ছিল। তাঁহার পক্ষীয়দিগের প্রধান ভীষ্ম, এবং পাণ্ডবেরা। তাঁহার বিপক্ষদিগের এক জন নেতা শিশুপাল। শিশুপাল-বধ বৃত্তান্তের স্কুল মর্ম্ম এই যে, ভীষ্মাদি সেই সভামধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পান। শিশুপাল তাহার বিরোধী হন। তাহাতে তুমুল বিবাদের যোগাড় হইয়া উঠে। তখন কৃষ্ণ শিশুপালকে নিহত করেন, তাহাতে সব গোল মিটিয়া যায়। যজ্ঞের বিঘ্ন বিনষ্ট হইলে, যজ্ঞ নিষিদ্ধে নির্বাহ হয়।

এ সকল কথার ভিতর যথার্থ ঐতিহাসিকতা কিছুমাত্র আছে কি না তাহার মীমাংসার পূর্বে বুদ্ধিতে হয় যে, এই শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায় মৌলিক কি না? এ কথাটার

উত্তর বড় সহজ নহে। শিশুপালবধের সঙ্গে মহাভারতের স্থল ঘটনাক্রমের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তা না থাকিলেই যে প্রসিদ্ধ বলিতে হইবে, এমন নহে। ইহা সত্য বটে যে, ইতিপূর্বে অনেক স্থানে শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক জন রাজার কথা দেখিতে পাই। পরভাগে দেখি, তিনি নাই। মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। পাণ্ডব সভায় কৃষ্ণের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহার বিরোধী কোন কথা পাই না। অমুক্রমশিকাধ্যায়ে এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে শিশুপালবধের কথা আছে। আর রচনাপ্রণালী দেখিলেও শিশুপালবধ-পর্বাদ্যায়কে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াই বোধ হয় বটে। মৌলিক মহাভারতের আর কয়টি অংশের স্তায়, নাটক্যাংশে ইহার বিশেষ উৎকর্ষ আছে। অতএব ইহাকে অমৌলিক বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

তা না পারি, কিন্তু ইহাও স্পষ্ট বোধ হয় যে, যেমন জরাসন্ধবধ-পর্বাদ্যায়ের দুই হাতের কারিগরি দেখিয়াছি, ইহাতেও সেই রকম। বরং জরাসন্ধবধের অপেক্ষা সে বৈচিত্র্য শিশুপালবধে বেশী। অতএব আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে, শিশুপালবধ স্থলতঃ মৌলিক বটে, কিন্তু ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির বা অগ্র পরবর্তী লেখকের অনেক হাত আছে।

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিব।

আজিকার দিনেও আমাদের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে সভা হইলে সভাস্থ সর্বপ্রধান ব্যক্তিকে শ্রদ্ধাচন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাকে “মালাচন্দন” বলে। ইহা এখন পাত্রের গুণ দেখিয়া দেওয়া হয় না, বংশমর্যাদা দেখিয়া দেওয়া হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোষ্ঠীপতিকেই মালাচন্দন দেওয়া হয়। কেন না, কুলীনের কাছে গোষ্ঠীপতি বংশই বড় মান্য। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাটা একটু ভিন্ন প্রকার ছিল। সভাস্থ সর্বপ্রধান ব্যক্তিকে অর্ঘ প্রদান করিতে হইত। বংশমর্যাদা দেখিয়া দেওয়া হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়া দেওয়া হইত।

যুধিষ্ঠিরের সভায় অর্ঘ দিতে হইবে—কে ইহার উপযুক্ত পাত্র? ভারতবর্ষীয় সমস্ত রাজগণ সভাস্থ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? এই কথা বিচার্য। ভীষ্ম বলিলেন, “কৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাকে অর্ঘ প্রদান কর।”

প্রথম যখন এই কথা বলেন, তখন ভীষ্ম যে কৃষ্ণকে দেবতা বিবেচনাতেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়াছিলেন, এমন ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। কৃষ্ণ “তেজঃ বল ও পরাক্রম বিষয়ে

কৃষ্ণ বলিয়াই তাঁহাকে অর্ঘদান করিতে বলিলেন। কল্পক্ষেপে কৃষ্ণ করিয়গণের স্বেচ্ছা এই প্রস্তাব কর দিতে বলিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে তাঁহা কৃষ্ণের বহুচরিত্রই দেখিতেছেন।

এই কথাগুলিতে কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদত্ত হইল। তিনিও তাহা গ্রহণ করিলেন। ইহা শিশুপালের অসম্মত হইল। শিশুপাল ভীষ্ম, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগকে এককালীন ভিন্নকার করিয়া যে বক্তৃতা করিলেন, বিলাতে পাল্‌মেণ্ট মহাসভায় উহা উক্ত হইলে উচিত মতে বিকসিত। তাঁহার বক্তৃতার প্রথম ভাগে তিনি যাহা বলিলেন, তাঁহার বাগ্মিতা বড় বিস্তৃত অথচ তীব্র। কৃষ্ণ রাজা নহেন, তবে এত রাজা থাকিতে তিনি অর্ঘ পান কেন? যদি হুবির বলিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাক, তবে তাঁর বাপ বাসুদেবকে পূজা করিলে না কেন? তিনি তোমাদের আত্মীয় এবং প্রিয়চিকীর্ষু বলিয়া কি তাঁর পূজা করিয়াছ? যন্ত্রের ক্ষেপণ থাকিতে তাঁকে কেন? কৃষ্ণকে আচার্য্য * মনে করিয়াছ? দ্রোণাচার্য্য থাকিতে কৃষ্ণের অর্চনা কেন? অশ্বিক্ বলিয়া কি তাঁহাকে অর্ঘ দাও? বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণ কেন? † ইত্যাদি।

মহারাজ শিশুপাল কথা কহিতে কহিতে অগ্রান্ত বাগ্মীর শ্রায় গরম হইয়া উঠিলেন, তখন লজ্জিক ছাড়িয়া রেটরিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়া দিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া কৃষ্ণকে ধরিলেন। অলঙ্কারশাস্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন,— প্রথমে “প্রিয়চিকীর্ষু” “অপ্রাপ্তলক্ষণ” ইত্যাদি চুটকিতে ধরিয়া, শেষ “ধর্মভ্রষ্ট” “জুরাঘা” প্রভৃতি বড় বড় গালিতে উঠিলেন। পরিশেষে Climax—কৃষ্ণ যতভোজী কুক্কর, দারপরিগ্রহকারী ক্লীব, ‡ ইত্যাদি। গালির একশেষ করিলেন।

সুনিয়া, ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরমযোগী আদর্শ পুরুষ কোন উত্তর করিলেন না। কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল যে, তদগোঁই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম—পরবর্তী ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কখন যে এরূপ পরুষবচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এমন দেখা যায় না। তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ক্ষেপণও করিলেন না। ইউরোপীয়দিগের মত ডাকিয়া বলিলেন না, “শিশুপাল! ক্ষমা বড় ধর্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।” নীরবে শত্রুকে ক্ষমা করিলেন।

* কৃষ্ণ, অভিমত, সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীর, এবং কদাপি বয়ঃ অর্জুনেরও বুদ্ধিভার আচার্য্য।

† অতএব কৃষ্ণ বিখ্যাত বেদজ্ঞ, ইহা স্বীকৃত হইল।

‡ কৃষ্ণ অনপত্য নহেন—তবে ইঞ্জিরপরাধ ব্যক্তির মতে প্রিয়কে এইরূপ গালি দেয়।

করিকর্তা সুমিত্রা, বাহুর কাছার প্রাণের দোষের কারণে সাধুমা করিতে যেমন—
বন্ধবান্ধব করিকর্তার বেমন নব্বর। মধুরবাক্যে কৃষ্ণের দুঃখাকারীকে দুই করিবার
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুড়া ভীষ্ম পৌহনিশ্চিত—ভাঁহার সেটা বড় ভাল লাগিল না।
বুড়া স্পষ্টই বলিল, “কৃষ্ণের অর্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অহুন্নয় বা সাধনা
করা অসুচিত।”

তখন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, সমর্থযুক্ত বাক্যপরম্পরায়, কেন তিনি কৃষ্ণের অর্চনার পরামর্শ
দিয়াছেন, তাহার কৈকিয়ৎ দিতে লাগিলেন। আমরা সেই বাক্যগুলির সারভাগ উদ্ধৃত
করিতেছি, কিন্তু তাহার ভিতর একটা রহস্য আছে, আগে দেখাইয়া দিই। কতকগুলি
বাক্যের তাৎপর্য এই যে, আর সকল মনুষ্যের বিশেষত: ক্ষত্রিয়ের যে সকল গুণ থাকে,
সেই সকল গুণে কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্ত তিনি অর্থের যোগ্য। আবার তারই মাঝে
কতকগুলি কথা আছে, তাহাতে ভীষ্ম বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর, এই জন্ত কৃষ্ণ
সকলের অর্চনীয়। আমরা দুই রকম পৃথক পৃথক দেখাইতেছি, পাঠক তাহার প্রকৃত
তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা করুন। ভীষ্ম বলিলেন,

“এই মহতী নৃপসভায় একজন মহাপালও দৃষ্ট হয় না, যাহাকে কৃষ্ণ ভেজোবলে পরাজয় করেন নাই।”
এ গেল মনুষ্যত্ববাদ—তার পরেই দেবত্ববাদ—

“অচ্যুত কেবল আমাদের অর্চনীয় এমনত নহে, সেই মহাভূজ জিলোকীর পূজনীয়। তিনি যুদ্ধে
অসংখ্য ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।”

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব—

“কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কার্য করিয়াছেন, লোকে মৎসরিধানে পুনঃ পুনঃ তৎসমুদায় কীর্তন
করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য, বীৰ্য,
কীর্তি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া”—

পরে, সঙ্গে সঙ্গে দেবত্ববাদ,

“সেই ভূতত্ত্বাবহ জগৎপতি অচ্যুতের পূজা বিধান করিয়াছি।”

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব, পরিষ্কার রকম—

“কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে দুটা হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী ও সমধিক বলশালী।
ফলত: মনুষ্যলোকে তাদৃশ বলবান্ এবং বেদবেদাঙ্গসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া
স্বকঠিন। দান, দান্য, শ্রুত, শৌর্য, লজ্জা, কীর্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অহুন্নয় শ্রী, ধৈর্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায়
গুণাবলি কৃষ্ণে নিয়ত বিয়াজিত রহিয়াছে। অতএব সেই সর্বগুণদম্পর আচার্য্য, পিতা, ও গুরু স্বরূপ পূজ্য

কৃষ্ণের প্রতি কথা প্রদর্শন ভোমাসের সর্বতোভাবে কর্তব্য। তিনি ঋষিক, গুহ, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা, এবং প্রিয়পাত্র। এই নিমিত্ত অচ্যুত অক্ষিত হইয়াছেন।”*

পুনশ্চ দেবদ্বন্দ্ব,

“কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, তিনিই অব্যক্তপ্রকৃতি, সনাতন, কর্তা, এবং সর্বদ্রুতের অধীশ্বর, হুতরাং পরম পূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহাব, পৃথিব্যাदि পঞ্চদ্রুত, সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্‌বিদিক্‌ সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইত্যাদি।”

ভীষ্ম বলিয়াছেন, কৃষ্ণের পূজার দুইটি কারণ (১) যিনি বলে সর্বক্షেষ্ট, (২) তাঁহার তুল্য বেদবেদাঙ্গপারদর্শী কেহ নহে। অদ্বিতীয় পরাক্রমের প্রমাণ এই গ্রন্থে অনেক দেওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণের অদ্বিতীয় বেদজ্ঞতার প্রমাণ গীতা। যাহা আমরা ভগবদগীতা বলিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণ-প্রণীত নহে। উহা ব্যাস-প্রণীত বলিয়া ব্যাস—“শৈবসানিকী সংহিতা” নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্মমতের সঙ্কলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাঁহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্তৃক উহা এই আকারে সঙ্কলিত, এবং মহাভারতে প্রসিদ্ধ হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এখন বলিবান কথা এই যে, গীতাক্ত ধর্ম বাহ্যার প্রণীত, তিনি স্পষ্টতই অদ্বিতীয় বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বেদকে সর্বোচ্চ স্থানে বসাইতেন না—কখন বা বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন। কিন্তু তথাপি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অস্ত্রের দ্বারা গীতাক্ত ধর্ম প্রণীত হয় নাই, ইহা যে গীতা ও বেদ উভয়ই অধ্যয়ন করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে।

যিনি এইরূপ, পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্য্যে ও শিক্ষায়, কর্ম্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্ম্মে, দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্য রূপেই সর্বক্షেষ্ট, তিনিই আদর্শ পুরুষ।

* প্রথম অধ্যায়ে বাহা বলিয়াছি—অরুণীন্দ্রধর্ম্মের চরদর্শন গ্রন্থ, এই ভীষ্মজ্ঞিতে তাহা পরিষ্কৃত হইতেছে।

দশম পরিচ্ছেদ

শিশুপালবধ

ভীষ্ম কথা সমাপ্ত করিয়া, শিশুপালকে নিভাস্ত অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, “যদি কৃষ্ণের পুত্রা শিশুপালের নিভাস্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেকোন অভিরুচি হয়, করুন।” অর্থাৎ “ভাল না লাগে, উঠিয়া যাও।”

পরে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

“কৃষ্ণ অস্তিত হইলেন দেখিয়া হনুখনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ক্রোধে কম্পাৱিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ‘আমি পূর্বে সেনাপতি ছিলাম, সশ্রুতি যাদব ও পাণ্ডবকুলের সমুলোন্মুলন করিবার নিমিত্ত অন্তর্ই সময়াগারে আবগাহন করিব।’ চৈকিয়াস্ত শিশুপাল, মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত যন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিব্যক্তি এবং কৃষ্ণের পুত্রা না হয়, তাহা আশ্রয়গণের সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। রাজারা নির্বেদ প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া যন্ত্রণা করিতেছেন, দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, যে তাঁহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন।”

রাজা যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রৌবপ্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে পিতামহ! এই মহান রাজসমুদ্র সংকোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, অনুমতি করুন।”

শিশুপালবধের ইহাই যথার্থ কারণ। শিশুপালকে বধ না করিলে তিনি রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতেন।

শিশুপাল আবার ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে কতকগুলি গালিগালাজ করিলেন।

ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশি গালি দিলেন। “দুরাস্তা” “যাহাকে বালকেও ঘৃণা করে,” “গোপাল,” “দাস” ইত্যাদি। পরম যোগী ক্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার তাহাকে কমা করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ, কুমার তেমনি আদর্শ। ভীষ্ম প্রথমে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ করিবার জন্ত উত্তিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া শিশুপালের পূর্ব্ববৃত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত অসম্ভব, অনৈসর্গিক ও অবিবাসযোগ্য। সে কথা এই—

ভীষ্মে ও শিশুপালে আরও কিছু বকাবকি হইল। ভীষ্ম বলিলেন, “শিশুপাল কৃষ্ণের তেজেরই তেজস্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ করিবেন।” শিশুপাল জলিয়া উঠিয়া ভীষ্মকে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, “তোমার জীবন এই দুপালগণের অমুগ্ৰহাধীন, ইহারা মনে করিলেই তোমার প্রাণসংহার করিতে পারেন।” ভীষ্ম তখনকার ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা—তিনি বলিলেন, “আমি ইহাদিগকে তুণতুল্য বোধ করি না।” শুনিয়া সমবেত রাজমণ্ডলী গজ্জিয়া উঠিয়া বলিল, “এই ভীষ্মকে পশুবাৎ বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হতাশনে দগ্ধ কর।” ভীষ্ম উত্তর করিলেন, “যা হয় কর, আমি এই তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করিলাম।”

বুড়াকে ছোরেও আঁটিবার যো নাই, বিচারেও আঁটিবার যো নাই। ভীষ্ম তখন রাজগণকে মীমাংসার সহজ উপায়টা দেখাইয়া দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার স্মূল মৰ্ম্ম এই;—“ভাল, কৃষ্ণের পূজা করিয়াছি বলিয়া তোমরা গোল করিতেছ; তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিতেছ না। গোলে কাজ কি, তিনি ত সম্মুখেই আছেন—একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ না? যাহার মরণ কণ্ঠে থাকে, তিনি একবার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া দেখুন না?”

শুনিয়া কি শিশুপাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে? শিশুপাল কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিল, “আইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।”

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কহিলেন। কিন্তু শিশুপালের সঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়া কৃষ্ণ যুদ্ধে আহূত হইয়াছেন, আর যুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রহিল না; এবং যুদ্ধেরও ধৰ্ম্মতঃ প্রয়োজন ছিল। তখন সভাস্থ সকলকে সঙ্বাদন করিয়া শিশুপালকৃত পূর্বাপরাধ সকল একটি একটি করিয়া বিবৃত করিলেন। তার পর বলিলেন, “এত দিন ক্ষমা করিয়াছি। আজ ক্ষমা করিব না।”

এই কৃষ্ণোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে যে, তিনি পিতৃষসার অমুরোধেই তাহার এত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। ইতিপূর্বেই যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া হয়ত পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, এ কথাটাও প্রক্ষিপ্ত? আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ইহাতে অনৈসর্গিকতা কিছুই নাই; বরং ইহা বিশেষরূপে স্বাভাবিক ও সম্ভব। ছেলে ছরস্তু, কৃষ্ণদেবী; কৃষ্ণও বলবান, মনে করিলে শিশুপালকে মাছির মত টিপিয়া মারিতে পারেন, এমন অবস্থার পিসী যে ভ্রাতৃপুত্রকে অমুরোধ করিবেন, ইহা খুব সম্ভব। ক্ষমাপরায়ণ কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ গুণেই ক্ষমা করিলেও পিসীর অমুরোধ স্মরণ রাখিবেন, ইহাও খুব

সম্ভব। আর পিতৃদমার পুত্রকে বধ করা আপাততঃ নিন্দনীয় কার্য, কৃষ্ণ পিসীর খাতির কিছুই করিলেন না, এ কথাটা উঠিতেও পারিত। সে কথার একটা কৈকিয়ৎ দেওয়া চাই। এ জন্ত কৃষ্ণের এই উক্তি খুব সঙ্গত।

তার পরেই আবার একটা অনৈসর্গিক কাণ্ড উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপালের বধ জন্ত আপনার চক্রোজ্ঞ স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবা মাত্র চক্র তাঁহার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কৃষ্ণ চক্রের দ্বারা শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

বোধ করি এ অনৈসর্গিক ব্যাপার কোন পাঠকেই ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। যিনি বলিবেন, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, ঈশ্বরে সকলেই সম্মত, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি চক্রের দ্বারা শিশুপালকে বধ করিতে হইবে, তবে সে জন্ত কৃষ্ণের মনুষ্যশরীর ধারণের কি প্রয়োজন ছিল? চক্র ত চেতনাবিশিষ্ট জীবের দ্বারা আক্রাম্যত যাতায়াত করিতে পারে দেখা যাইতেছে, তবে বৈকুণ্ঠ হইতেই বিষ্ণু তাহাকে শিশুপালের শিরশ্ছেদ জন্ত পাঠাইতে পারেন নাই কেন? এ সকল কাজের জন্ত মনুষ্য-শরীর গ্রহণের প্রয়োজন কি? ঈশ্বর কি আপনার নৈসর্গিক নিয়মে বা কেবল ইচ্ছা মাত্র একটা মনুষ্যের মৃত্যু ঘটাইতে পারেন না যে, তজ্জন্ত তাঁহাকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইবে? এবং মনুষ্য-দেহ ধারণ করিলেও কি তিনি এমনই হীনবল হইবেন যে, স্বীয় মানুষী শক্তিতে একটা মানুষের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, এশী শক্তির দ্বারা দৈব অস্ত্রকে স্মরণ করিয়া আনিতে হইবে? ঈশ্বর যদি একরূপ অল্পশক্তিমান হন, তবে মানুষের সঙ্গে তাঁহার তফাৎ বড় অল্প। আমরাও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করি না—কিন্তু আমাদের মতে কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন অস্ত্র শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কার্যই সম্পন্ন করিতেন। এই অনৈসর্গিক চক্রোজ্ঞস্মরণযুক্তান্ত যে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণ যে মানুষ্যযুদ্ধেই শিশুপালকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। উদ্যোগপর্বের দ্বুতরাষ্ট শিশুপাল-বধের ইতিহাস কহিতেছেন, যথা,

“পূর্বে রাজস্বয় যজ্ঞে, চেন্দ্রিয়াজ ও করুযক প্রভৃতি যে সমস্ত ভূপাল সর্বপ্রকার উদ্যোগবিশিষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক বীরপুরুষ সমভিষাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চেন্দ্রিয়াজতনয় পুত্রের দ্বারা প্রতাপশালী, শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর, ও বৃদ্ধ অজ্ঞেয়। ভগবান্ কৃষ্ণ স্বর্ণকাল মধ্যে তাঁহারে পরাজয় করিয়া কজ্রিগণের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন; এবং করুযরাজপ্রমুখ নরেন্দ্রবর্গ যে শিশুপালের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে বথাক্রুত নিরীক্ষণ করিয়া চেন্দ্রিপতিরে পরিভ্যাগ পূর্বক ক্ষুদ্র যুগের দ্বারা পলায়ন করিলেন, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের শ্রাণসংহার পূর্বক পাণ্ডবগণের বশ ও বান বর্দ্ধন করিলেন।”—১২ অধ্যায়।

এখানেও চক্ষুর কোন কথা দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই, কৃষ্ণকে রথারূপে হইয়া রীতিমত সাহসিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইরাছিল। এবং তিনি মাহুবুধকেই শিশুপাল ও তাহার অমুচরবর্গকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। যেখানে এক গ্রায়ে একই ঘটনার দুই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই—একটি নৈসর্গিক, অপরটি অনৈসর্গিক, সেখানে অনৈসর্গিক বর্ণনাকে অগ্রাহ্য করিয়া নৈসর্গিককে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়। যিনি পুরাণেতিহাসের মধ্যে সত্যের অমুসন্ধান করিবেন, তিনি যেন এই সোজা কথাটা স্মরণ রাখেন। নহিলে সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে।

শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচনা করিলাম, তাহাতে উক্ত ঘটনার স্থূল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমরা এইরূপ দেখিতেছি। রাজসূয়ের মহাসভায় সকল ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। ইহাতে শিশুপাল প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় রুষ্ট হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত করে। কৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপিত হয়।

আমরা দেখিয়াছি, কৃষ্ণ যুদ্ধে সচরাচর বিদ্রোহবিশিষ্ট। তবে অর্জুনাদি যুদ্ধক্ষম পাণ্ডবেরা থাকিতে, তিনি যজ্ঞদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? রাজসূয়ে যে কার্যের ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন। যজ্ঞরক্ষার ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। যে কাজের ভার যাহার উপর থাকে, তাহা তাহার অমুঠেয় কর্ম (Duty)। আপনার অমুঠেয় কর্মের সাধন জন্মাই কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পাণ্ডবের বনবাস

রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন। সভাপূর্বক আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তবে এক স্থানে তাঁহার নাম হইয়াছে।

দ্যুতজ্ঞৌড়ায় যুধিষ্ঠির জ্যোপদীকে হারিলেন। তার পর জ্যোপদীর কেশাকর্ষণ, এবং সভামধ্যে বস্ত্রহরণ। মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্য্যাংশে উৎকৃষ্ট রচনা জনগণের সাহিত্যে বড় চুল্লভ। কিন্তু কাব্য আমাদের এখন সমালোচনীয় নহে—ঐতিহাসিক মূল্য

কিছু আছে কি না পরীক্ষা করিতে হইবে। যখন দুঃশাসির সভা মধ্যে দ্রৌপদীর বজ্রহরণ করিতে প্রবৃত্ত, নিকপায় দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। সে আশ উদ্ধৃত করিয়াছি:—

“গোবিন্দ ষাণ্ঠকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়।”

এবং সে সম্বন্ধে আশাদিগের যাহা বলিবার তাহা পূর্বে বলিয়াছি।

তার পর বনপর্ব। বনপর্বে তিনবার মাত্র কৃষ্ণের সাংক্ৰাণ্ড পাওয়া যায়। প্রথম, পাণ্ডবেরা বনে গিয়াছেন শুনিয়া যুধিষ্ঠিরেরা সকলে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল—কৃষ্ণও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব। কিন্তু যে অংশে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও নহে। রচনার সাদৃশ্য কিছুমাত্র নাই। চরিত্রগত সঙ্গতি কিছুমাত্র নাই। কৃষ্ণকে আর কোথাও রাগিতে দেখা যায় না, কিন্তু এখানে, যুধিষ্ঠিরের কাছে আসিয়াই কৃষ্ণ চটিয়া লাগল। কারণ কিছুই নাই, কেহ শত্রু উপস্থিত নাই, কেহ কিছু বলে নাই, কেবল দুঃখোদন প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে, এই বলিয়াই এত রাগ যে, যুধিষ্ঠির বহুতর স্তব স্তুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে ধামাইলেন। যে কবি লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না, এ কথা সে কবির লেখা নয়, ইহা নিশ্চিত। তার পর এখনকার হৌৎকাদিগের মত কৃষ্ণ বলিয়া বসিলেন, “আমি থাকিলে এতটা হয়।—আমি বাড়ী ছিলাম না।” তখন যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছিলেন, সেই পরিচয় লইতে লাগিলেন। তাহাতে শাষবধের কথাটা উঠিল। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পরিচয় দিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৌভ নামে তাহার রাজধানী। সেই রাজধানী আকাশময় উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়; শাষ তাহার উপর থাকিয়া যুদ্ধ করে। সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বিস্তর কাঁদাকাটি। শাষ একটা মায়া বসুদেব গড়িয়া তাহাকে কৃষ্ণের সম্মুখে বধ করিল দেখিয়া কৃষ্ণ কাঁদিয়া মুচ্ছিত। এ জগদীশ্বরের চিত্র নহে, কোন মাহুঘিক ব্যাপারের চিত্রও নহে। অমুক্তমণিকাধ্যায়ে এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে এই সকল ব্যাপারের কোন প্রসঙ্গও নাই। ভরসা করি, কোন পাঠক এ সকল উপস্থাসের সমালোচনার প্রত্যাশা করেন না।

তার পরে দুঃশাসির সশস্ত্র ভোজন। সে ঘোরতর অনৈসর্গিক ব্যাপার। অমুক্তমণিকাধ্যায়ে সে কথা থাকিলেও তাহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। সুতরাং তাহা আমাদের সমালোচনীয় নহে।

তার পর বনপর্বের শেষের দিকে মার্কণ্ডেয়সমস্তা-পর্বাধ্যায়ে আবার কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে আসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আবার দেখিতে আসিয়াছিলেন—এবার একা নহে; ছোট ঠাকুরাণীটি সঙ্গে। মার্কণ্ডেয়সমস্তা-পর্বাধ্যায় একখানি বৃহৎ গ্রন্থ বলিলেও হয়। কিন্তু মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, এমন কথা উহাতে কিছুই নাই। সমস্তটাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়-সমস্তা-পর্বাধ্যায়ের কথা আছে বটে, কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রচনার সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্যই নাই। কিন্তু ইহা মৌলিক মহাভারতের অংশ কি না, তাহা আমাদের বিচার করিবারও কোন প্রয়োজন রাখে না। কেন না, কৃষ্ণ এখানে কিছুই করেন নাই। আসিয়া যুধিষ্ঠির জ্যোপদী প্রভৃতিকে কিছু মিষ্ট কথা বলিলেন, উত্তরে কিছু মিষ্ট কথা শুনিলেন। তার পর কয় জনে মিলিয়া ঋষি ঠাকুরের আশাড়ে গল্প সকল শুনিতে লাগিলেন।

মার্কণ্ডেয়ের কথা ফুরাইলে জ্যোপদী সত্যভামাতে কিছু কথা হইল। পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে জ্যোপদী সত্যভামার সংবাদ গণিত হইয়াছে; কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পূর্বে বলিয়াছি।

তাহার পর বিরাটপর্ব। বিরাটপর্বের কৃষ্ণ দেখা দেন নাই—কেবল শেষে উত্তরার বিবাহে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া যে সকল কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাহা উত্তোগপর্বের আছে। উত্তোগপর্বের কৃষ্ণের অনেক কথা আছে। ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।

পঞ্চম খণ্ড

উপপ্লব্য

সৰ্বভূতাঋতুতায় ভূতাদিনিধনায় চ ।

অক্ৰোধশ্ৰোহমোহায় তঠৈশ্চ শান্তাঙ্গনে নমঃ ॥

শাস্তিপৰ্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহাভারতের যুদ্ধের সেনোত্তোগ

এক্ষেণে উত্তোগপর্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

সমাজে অপরাধী আছে। মহুত্যাগণ পরম্পরের প্রতি অপরাধ সর্বদাই করিতেছে। সেই অপরাধের দমন সমাজে একটি মুখ্য কার্য। রাজনীতি রাজদণ্ড ব্যবস্থাস্বাতন্ত্র্য ধর্মশাস্ত্র আইন আদালত সকলেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাই।

অপরাধীর পক্ষে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, নীতিশাস্ত্রে তৎসম্বন্ধে দুইটি মত আছে। এক মত এই যে :—দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা দোষের দমন করিতে হইবে—আর একটি মত এই যে, অপরাধ ক্ষমা করিবে। বল এবং ক্ষমা দুইটি পরম্পর বিরোধী—কাজেই দুইটি মত যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটির মধ্যে একটি যে একেবারে পরিহার্য্য এমন হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধ্বংস হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মহুত্যা পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটি অতি কঠিন তত্ত্ব। আধুনিক সুসভ্য ইউরোপ ইহার সামঞ্জস্যে অজ্ঞাপি পৌছিতে পারিলেন না। ইউরোপীয়দিগের খ্রীষ্টধর্ম বলে, সকল অপরাধ ক্ষমা কর; তাহাদিগের রাজনীতি বলে, সকল অপরাধ দণ্ডিত কর। ইউরোপে ধর্ম অপেক্ষা রাজনীতি প্রবল, এজন্য ক্ষমা ইউরোপে লুপ্তপ্রায়, এবং বলের প্রবল প্রতাপ।

বল ও ক্ষমার যথার্থ সামঞ্জস্য এই উত্তোগপর্ব মধ্যে প্রধান তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই তাহার মীমাংসক, প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণই উত্তোগপর্বের নায়ক। বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যেরূপ আদর্শ কার্য্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। যে তাহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন, এবং যে লোকের অনিষ্ট করে, তিনি বলপ্রয়োগপূর্বক তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক স্থলে ঘটে যেখানে ঠিক এই বিধান অনুসারে কার্য্য চলে না, অথবা এই বিধানানুসারে বল কি ক্ষমা প্রযোজ্য তাহার বিচার কঠিন হইয়া পড়ে। মনে কর, কেহ আমার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সামাজিক ধর্ম। যদি সকলেই আপনার সম্পত্তি উদ্ধারে পরাশ্রুত হয় তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অতএব অপহৃত সম্পত্তির উদ্ধার করিতে হইবে। এখনকার দিনে সভ্যসমাজ সকলে, আইন আদালতের সাহায্যে, আমরা আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু যদি এমন ঘটে যে,

আইন-আদালতের সাহায্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বলপ্রয়োগ ধর্মসঙ্গত কি না? বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য সহজে এই সকল কূটতর্ক উঠিয়া থাকে। কার্যতঃ প্রায় দেখিতে পাই যে, যে বলবান, সে বলপ্রয়োগের দিকেই যায়। যে দুর্বল, সে ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্তু যে বলবান্ অথচ ক্ষমাবান্, তাহার কি করা কর্তব্য? অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এরূপ স্থলে কি কর্তব্য? তাহার মীমাংসা উজোগপর্বেই আমরা কৃষ্ণবাক্যে পাইতেছি।

ভরসা করি, পাঠকেরা সকলেই জানেন যে, পাণ্ডবেরা দ্যুতক্রীড়ায় শকুনির নিকট হারিয়া এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের রাজ্য দ্ব্যধোদধনকে সম্প্রদান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিবেন। তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন; যদি অজ্ঞাতবাসের ঐ এক বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায়, তবে তাঁহারা রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবেন না, পুনর্ব্বার দ্বাদশ বর্ষ জঙ্গ বনগমন করিবেন। কিন্তু যদি কেহ পরিচয় না পায়, তবে তাঁহারা দ্ব্যধোদধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে তাঁহারা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া বিরাটরাজ্যের পুরী মধ্যে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন করিয়াছেন, ঐ বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায় নাই। অতএব তাঁহারা দ্ব্যধোদধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার স্মায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অধিকারী। কিন্তু দ্ব্যধোদধন রাজ্য কিরাইয়া দিবে কি? না দিবারই সম্ভাবনা। যদি না দেয়, তবে কি করা কর্তব্য? যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা কর্তব্য কি না?

অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হইলে পাণ্ডবেরা বিরাটরাজ্যের নিকট পরিচিত হইলেন। বিরাটরাজ্য তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার কন্যা উত্তরাকে অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকে সম্প্রদান করিলেন। সেই বিবাহ দিতে অভিমন্যুর মাতুল কৃষ্ণ ও বলদেব ও অশ্বাত্থ যাদবেরা আসিয়াছিলেন। এবং পাণ্ডবদিগের স্বস্তর রূপদ এবং অশ্বাত্থ কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে বিরাটরাজ্যের সভায় আসীন হইলে পাণ্ডব-রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হইল। নৃপতিগণ “শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।” তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজাদিগকে সযোদন করিয়া অবস্থা সকল বুঝাইয়া বলিলেন। যাহা যাহা ঘটয়াছে তাহা বুঝাইয়া তার পর বলিলেন, “এক্ষণে কোরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন।”

কৃষ্ণ এমন কথা বলিলেন না যে, যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা করুন। কেন না হিত, ধর্ম্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য, তাহা তিনি কাহারও প্রার্থনীয়

বিবেচনা করেন না। তাই পুনর্বীর বুঝাইয়া বলিতেছেন, “ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্মগত সুরসাজাজ্যও কামনা করেন না, কিন্তু ধর্মার্থ সংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন।” আমরা পূর্বে বুঝাইয়াছি যে, আদর্শ মহত্ত্ব সন্ন্যাসী হইলে চলিবে না—বিষয়ী হইতে হইবে। বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ। অধর্মগত সুরসাজাজ্যও কামনা করিব না, কিন্তু ধর্মতঃ আমি বাহার অধিকারী, তাহার এক তিলও বকককে ছাড়িয়া দিব না; ছাড়িলে কেবল আমি একা দুঃখী হইব, এমন নহে, আমি দুঃখী না হইতেও পারি, কিন্তু সমাজবিধ্বংসের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে।

তার পর কৃষ্ণ কৌরবদিগের লোভ ও শঠতা, যুধিষ্ঠিরের ধার্মিকতা এবং ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনাপূর্বক ইতিকর্ষব্যতা অবধারণ করিতে রাজগণকে অনুরোধ করিলেন। নিজের অভিপ্রায়ও কিছু ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, যাহাতে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্থ প্রদান করেন—এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্মিক পুরুষ দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করুন। কৃষ্ণের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহে, সন্ধি। তিনি এত দূর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে, অর্দ্ধরাজ্য মাত্র প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সে যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া নরশোণিতশ্রোত বৃদ্ধি করিবেন না।

কৃষ্ণের বাক্যাবসানে বলদেব তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন, যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়ার জন্ত কিছু নিন্দা করিলেন, এবং শেষে বলিলেন যে, সন্ধি দ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা উপার্জিত তাহা অর্থই নহে। সুরাপায়ী বলদেবের এই কথাগুলি সেণার অঙ্করে লিখিয়া ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে মহাযজ্ঞাতির কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে সাত্যকি গাত্রোথান করিয়া (পাঠক দেখিবেন, সেকালেও “parliamentary procedure” ছিল) প্রতিবক্তৃত্তা করিলেন। সাত্যকি নিজে মহাবলবান্ বীরপুরুষ, তিনি কৃষ্ণের শিষ্য এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদিগের মধ্যে অর্জুন ও অতিমহু্যর পরেই তাঁহার প্রশংসা দেখা যায়। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করায় সাত্যকি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, বলদেবের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া বলদেবকে ক্লীব ও কাপুরুষ ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত করিলেন। দ্যুতক্রীড়ার জন্ত বলদেব যুধিষ্ঠিরকে যেটুকু দোষ দিয়াছিলেন, সাত্যকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং আপনার অভিপ্রায় এই প্রকাশ করিলেন যে, যদি কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে তাহাদের

পৈত্রিক রাজ্য সমস্ত প্রত্যর্পণ না করেন, তবে কোঁরবদিগকে সমূলে নির্মূল করাই কর্তব্য।

তার পর যুদ্ধ ফ্রপদের বক্তৃতা। ফ্রপদও সাত্যকির মতাবলম্বী। তিনি যুদ্ধার্থ উত্তোগ করিতে, সৈন্য সংগ্রহ করিতে এবং মিত্ররাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও বলিলেন যে, হৃষ্যোধনের নিকটেও দূত প্রেরণ করা হউক।

পরিশেষে কৃষ্ণ পুনর্ব্বার বক্তৃতা করিলেন। ফ্রপদ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গুরুতর, এই জন্ত কৃষ্ণ স্পষ্টতঃ তাঁহার কথার বিরোধ করিলেন না। কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। তিনি বলিলেন, “কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাঁহারা কখন মর্য্যাদালবনপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, আমরা পরমাহ্লাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব।” গুরুজনকে ইহার পর আর কি ভৎসনা করা যাইতে পারে? কৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, যদি হৃষ্যোধন সন্ধি না করে, “তাহা হইলে অগ্রে অশ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন,” অর্থাৎ “এ যুদ্ধে আসিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা নাই।” এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকা চলিয়া গেলেন।

আমরা দেখিলাম যে কৃষ্ণ যুদ্ধে নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি তজ্জন্ত অর্দ্ধরাজ্য পরিত্যাগেও পাণ্ডবদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম যে, তিনি কোঁরব পাণ্ডবদিগের মধ্যে পক্ষপাতশূন্য, উভয়ের সহিত তাঁহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাহা ঘটিল তাহাতে এই দুই কথারই আরও বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এদিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের উত্তোগ হইতে লাগিল, সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল, এবং রাজগণের নিকট দূত গমন করিতে লাগিল। কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্ত অর্জুন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। হৃষ্যোধনও তাই করিলেন। দুই জনে এক দিনে এক সময়ে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, মহাভারত হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

“বান্ধবের তৎকালে শয়ন ও নিত্রান্তভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা হৃষ্যোধন তাঁহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তকসমীপস্থত শ্রবণ আসনে উপবেশন করিলেন। ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশ পূর্ব্বক বিনীত

ও কৃত্যজলি হইয়া যাবৎপ্রতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণদমন আগবিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয় পথে দ্রুতগমনকে নহনগোচর করিবার্থে আগত প্রের সহকারে সংকারপূর্বক আগমন হেতু বিজ্ঞাপা করিলেন।

দ্রুতগমন সহায় বসনে কহিলেন “হে বাসব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সশস্ত্র ও তুল্য সৌহৃদ্য; তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের প্রের্ষ ও মাননীয়; অতএব অস্ত্র সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।”

কৃষ্ণ কহিলেন, হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নহনগোচর করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়কেই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত। এই বলিয়া ভগবান যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন। হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্জুদ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক। আর অস্ত্র পক্ষে আমি সমরপরায়ুধ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার দৃঢ়তর, তাহাই অবলম্বন কর।

ধনঞ্জয় অরতিমর্দন জনার্দন সমরপরায়ুধ হইবেন, শ্রবণ করিয়াও তাঁহারে বরণ করিলেন। তখন রাজা দ্রুতগমন অর্জুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরে পরায়ুধ বিবেচনা করতঃ শ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।”

উচ্চোগপর্বের এই অংশ সমালোচন করিয়া আমরা এই কয়টি কথা বৃত্তিতে পারি।

প্রথম—যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে কাহারও আপনার ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত অধিকার পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাঁহার বিবেচনায় এত দূর উৎকৃষ্ট যে, বলপ্রয়োগ করার অপেক্ষা অর্দ্রেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল।

দ্বিতীয়—কৃষ্ণ সর্বত্র সমদর্শী। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাণ্ডবদিগের পক্ষ, এবং কোরবদিগের বিপক্ষ। উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য।

তৃতীয়—তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তার পর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত হইল, এবং অগত্যা তাঁহাকে একপক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, ক্ষিত্রিয় এবং সর্বব্যাপী ভীষ্মেরও নহে।

আমরা দেখিব যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্ম কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শত্রু, এবং যিনি একাই সর্বত্র সমদর্শী, লোকে তাঁহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা অনুষ্ঠাতা এবং পাণ্ডব পক্ষের প্রধান কূটক্রী বলিয়া স্থির করিয়াছে। কাজেই এত সবিস্তারে কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে।

ভার পর, নিরস্ত্র কৃষ্ণকে লইয়া অর্জুন যুদ্ধের কোন্ কার্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া, কৃষ্ণকে তাঁহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য অতি হেয় কার্য। যখন মজ্ঞরাজ শল্য কর্ণের সারথ্য করিবার জন্ত অমুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আদর্শপুরুষ অহঙ্কারশূন্য। অতএব কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি সর্বদোষশূন্য এবং সর্বগুণাযুক্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সঞ্জয়মান

উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে থাকুক। এদিকে দ্রুপদের পরামর্শানুসারে যুধিষ্ঠিরাদি দ্রুপদের পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সন্ধিস্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু পুরোহিত মহাশয় কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। কেন না বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রবেধ্য ভূমিও প্রত্যর্পণ করা দুর্ঘোষনাতির অভিপ্রায় নহে। এদিকে যুদ্ধে ভীমার্জুন ও কৃষ্ণকে * ধৃতরাষ্ট্রের বড় ভয়; অতএব যাহাতে পাণ্ডবেরা যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ দিবার জন্ত ধৃতরাষ্ট্র আপনার অমাত্য সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। “তোমাদের

* বিপক্ষেরাও যে এক্ষণে কৃষ্ণের সর্বপ্রাধান্ত স্বীকার করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ উল্লেখ্যপক্ষে পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের অস্ত্রাভ্যাস সহায়ের নামোন্মেষ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, “যুধিসিংহ কৃষ্ণ বাহাদিগের সহায়, তাহাদিগের প্রতাপ সহ্য করা কাহার সাধ্য?” (২১ অধ্যায়) পুনশ্চ বলিতেছেন, “সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিতেছেন। কোন্ শত্রু বিজরাভিলাষী ইহা বৈরথ্যবুদ্ধি তাঁহার সমুখীন হইবে? হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ পাণ্ডবাবধি বৈরাগ্য পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা আমি ভ্রমণ করিয়াছি। তাঁহার কার্য অনুক্ষণ স্মরণ করত আমি শান্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি; কৃষ্ণ বাহাদিগের অগ্রণী, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন গুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।” আর এক স্থানে ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন কিন্তু “কেশবও অধুনা, লোকত্রয়ের অধিপতি, এবং মহাত্মা। যিনি সর্বলোকে একমাত্র বরেন্দ্র, কোন্ মনুষ্য তাঁহার সমুখে অবস্থান করিবে?” এইরূপ অনেক কথা আছে।

রাজ্যও আমরা অধর্ম করিয়া কাড়িয়া লইব, কিন্তু তোমরা তজ্জন্ম যুদ্ধ করিও না, সে কাজটা ভাল নহে”; এরূপ অসঙ্গত কথা বিশেষ নির্লজ্জ ব্যক্তি নহিলে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু দূতের লজ্জা নাই। অতএব সমুদ্র পাণ্ডবসভায় আসিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার শুল্কমর্শ এই যে, “যুদ্ধ বড় গুরুতর অধর্ম, তোমরা সেই অধর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ, অতএব তোমরা বড় অধার্মিক।” যুধিষ্ঠির, তত্ত্বতরে অনেক কথা বলিলেন, তন্মধ্যে আমাদের যেটুকু প্রয়োজনীয় তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

“হে সমুদ্র! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছে তৎসমুদায় এবং প্রাজাপত্য বর্ণ এবং ব্রহ্মলোক এই সকলও অধর্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্মপ্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণ্যগণের উপাসক। উনি কৌরব ও পাণ্ডব উভয় কুলেরই হিতৈষী এবং বহুসংখ্যক মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে উনিই বলুন যে যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই তাহা হইলে আমার স্বধর্ম পরিত্যাগ করা হয়, এস্থলে কি কর্তব্য। মহাপ্রভাব শিনির নপ্থা এবং চেদি, অন্ধক, বৃদ্ধি, ভোজ, কুজ ও শৃঙ্গবংশীয়গণ বাহুদেবের বৃদ্ধি প্রভাবেই শত্রু দমন পূর্বক স্তম্ভদগণকে আনন্দিত করিতেছেন। ইন্দ্রকয়ল উগ্রসেন প্রভৃতি বীর সকল এবং মহাবলপরাক্রান্ত মনসী সত্যপরায়ণ যাদবগণ কৃষ্ণ কর্তৃক সততই উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ ভ্রাতা ও কর্তা বলিয়াই কাশীধর বক্র উত্তম শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন; ঐশ্যবাসনে জলদজাল বেমন প্রজাদিগকে বারিদান করে, তরুণ বাহুদেব কাশীধরকে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। কশ্মিন্চয়জ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন্ন, ইনি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও সাধুতম, আমি কদাচ ইহার কথার অত্যাচারণ করিব না।”

বাহুদেব কহিলেন, “হে সমুদ্র! আমি নিরস্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশ, সমৃদ্ধি ও হিত এবং সুপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যাদয় বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধি সংস্থাপন হয় ইহা আমার অভিপ্রেত, আমি উহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পদ্যমর্শ প্রদান করি না। অত্যান্ত পাণ্ডবগণের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেকবার সন্ধি সংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ সান্তিশয় অর্থলোভী, পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সন্ধি সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর, হৃতরাং বিবাহ যে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইবে তাহার আশঙ্কা কি? হে সমুদ্র! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম হইতে বিচলিত হই না, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্মসাধনোচ্চত উৎসাহসম্পন্ন স্বজন-পরিপালক রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্মিক বলিয়া নির্দেশ করিলে?”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথাটা কৃষ্ণচরিত্রে বড় প্রয়োজনীয়। আমরা বলিয়াছি, তাঁহার জীবনের কাজ দুইটি; ধর্মরাজ্য সংস্থাপন এবং ধর্মপ্রচার। মহাভারতে তাঁহার কৃত ধর্মরাজ্য সংস্থাপন সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্মের কথা প্রধানতঃ ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত গীতা-পর্বোধ্যায়েই আছে।

এমন বিচার উঠিতে পারে যে, গীতায় যে ধর্ম কথিত হইয়াছে তাহা গীতাকার কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম যে কৃষ্ণ প্রচারিত কি গীতাকার প্রণীত, তাহার স্থিরতা কি? সৌভাগ্য ক্রমে আমরা গীতা-পর্ব্বাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃষ্ণদত্ত ধর্মোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমরা দেখি যে গীতায় যে অভিনব ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম ব্যাখ্যাত করিতেছেন, ইহার মধ্যে একতা আছে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে এই ধর্ম কৃষ্ণপ্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারিতই বটে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে মহাভারতকার যে ধর্মব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র এক প্রকৃতির ধর্ম, যদি পুনশ্চ দেখি যে সেই ধর্ম প্রচলিত ধর্ম হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম; তবে বলিব এই ধর্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে গীতায় যে ধর্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মের সঙ্গে ঐক্য আছে, উহা তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব যে গীতোক্ত ধর্ম যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত বটে।

এখন দেখা যাউক কৃষ্ণ এখানে সমুদয়কে কি বলিতেছেন।

“ভূচি ও কুটুস্থপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবনযাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি বিद्यমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানা প্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কৰ্মবশতঃ কেহ বা কৰ্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তজ্জপ কৰ্মাহুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিজ্ঞা দ্বারা কৰ্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কৰ্মাহুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিজ্ঞা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তির জল পান করিবামাত্র পিপাসা শান্তি হয়, তজ্জপ ইহকালে যে সকল কৰ্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অহুষ্ঠান করা কর্তব্য। হে সঞ্জয়! কৰ্মবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে; সুতরাং কৰ্মই সৰ্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কৰ্ম অপেক্ষা অল্প কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কৰ্মই নিষ্ফল হয়।

“দেখ, দেবগণ কৰ্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন; সমীরণ কৰ্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; দিবাকর কৰ্মবলে আলোকশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কৰ্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবৃত্ত হইয়া মাসার্ধ উদ্ভিত হইতেছেন, হতাশন কৰ্মবলে প্রজাগণের কৰ্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কৰ্মবলে নিতান্ত দুৰ্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন; শ্রোতস্বতী সকল কৰ্মবলে প্রাণীগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে; অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধিক্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্যের অহুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কৰ্মবলে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল প্রাতিধ্বনিত করিয়া বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগাভিলাষ

বিসর্জন ও ত্রিবিম্ব সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম প্রতিপালন-পূর্বক মেঘদাক্ষা অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়নিরোধ পূর্বক ব্রহ্মচর্য্যে অহুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি মেঘগণের আচার্য্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্রতু, আদিভ্য, দম, ক্রবের, গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, অশ্বর, বিশ্বাবহু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্ম প্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন; মহর্বিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য, অস্ত্রাস্ত্র ক্রিয়াকলাপের অহুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন।”

কর্ম্মবাদ কৃষ্ণের পূর্বেরও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডই কর্ম্ম। মনুস্মৃতিবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যেরা Duty বলেন—সে অর্থে সে প্রচলিত ধর্ম্মে কর্ম্ম শব্দ ব্যবহৃত হইত না। গীতাতেই আমরা দেখি কর্ম্ম শব্দের পূর্বপ্রচলিত অর্থ পরিবর্তিত হইয়া, যাহা কর্তব্য, যাহা অনুষ্ঠেয়, যাহা Duty, সাধারণতঃ তাহাই কর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এইখানে হইতেছে। ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে—কিন্তু মর্ম্মার্থ এক। এখানে যিনি বক্তা, গীতাতেও তিনিই প্রকৃত বক্তা এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে।

অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের যথাবিহিত নির্বাহের অর্থাৎ (ডিউটির সম্পাদনের) নামাস্তুর স্বধর্ম্মপালন। গীতার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্ম্মপালনে অর্জুনকে উপদিষ্ট করিতেছেন। এখানেও কৃষ্ণ সেই স্বধর্ম্মপালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা,

“হে সঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম্ম সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন মানসে পাণ্ডবদিগের নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছ? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজস্বয়যজ্ঞের অহুষ্ঠানকর্ত্তা। যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী এবং হস্তাস্ত্ররথ চালনে হুনিপূর্ণ। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা কৌরবগণের প্রাণহিংসা না করিয়া ভীমসেনকে সাস্ত্রনা করতঃ রাজ্যলাভের অন্ত কোন উপায় অবধারণ করিতে পারেন; তাহা হইলে ধর্ম্মরক্ষা ও পুণ্যকর্ম্মের অহুষ্ঠান হয়। অথবা ইহারা যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্বক স্বকর্ম্ম সংসাধন করিয়া দূরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন তাহাও প্রশস্ত। বোধ হয়, তুমি সন্ধিসংস্থাপনই শ্রেয়ঃসাধন বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্ম্মরক্ষা হয়, কি যুদ্ধ না করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে আমি তাহারই অহুষ্ঠান করিব।”

তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্বর্ণের ধর্ম্মকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্রের যেরূপ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে—এখানেও ঠিক সেইরূপ। এইরূপ মহাভারতে অস্ত্রতত্ত্ব ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গীতাক্ত ধর্ম্ম, এবং মহাভারতের অস্ত্রতত্ত্ব কথিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম এক। অতএব গীতাক্ত ধর্ম্ম যে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম—সে ধর্ম্ম যে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত এমন নহে—যথার্থ ই কৃষ্ণপ্রণীত ধর্ম্ম, ইহা এক প্রকার

সিদ্ধ। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে আরও অনেক কথা বলিলেন। তাহার হই একটা কথা উদ্ধৃত করিব।

ইউরোপীয়দিগের বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ অপেক্ষা গৌরবের কর্ম কিছুই নাই। “উহার নাম “Conquest,” “Glory,” “Extension of Empire” ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন ইংরেজিতে, ইউরোপীয় অস্বাভাবিক ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপহরণের গুণানুবাদ। শুধু এক “Gloire” শব্দের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রুসিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডরীক তিনবার ইউরোপে সমরানল জালিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের সর্বনাশের কারণ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ কথিরাপিপাসু রাক্ষস ভিন্ন অস্ত্র ব্যক্তির সহজেই ইহা বোধ হয় যে, এইরূপ “Gloire” ও তৎস্বরূপে প্রভেদ আর কিছুই নাই—কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অস্ত্র চোর ছোট চোর। * কিন্তু এ কথাটা বলা বড় দায়, কেন না দিগ্বিজয়ের এমনই একটা মোহ আছে যে, আর্থা ক্ষত্রিয়েরাও মুগ্ধ হইয়া অনেক সময়ে ধর্মধর্ম ভুলিয়া যাইতেন। ইউরোপে কেবল Diogenes মহাবীর আলেকজান্ডারকে বলিয়াছিলেন, “তুমি এক জন বড় দস্যু মাত্র। ভারতবর্ষেও শ্রীকৃষ্ণ পররাজ্যলোপ রাজাদিগকে তাই বলিতেছেন,—তাঁহার মতে ছোট চোর লুকাইয়া চুরি করে, বড় চোর প্রকাশে চুরি করে। তিনি বলিতেছেন,

“তৎস্ব দৃশ বা অদৃশ হইয়া হঠাৎ যে সর্বস্ব অপহরণ করে, উভয়ই নিন্দনীয়। স্বতরাং দুর্ধ্যোধনের কাণ্ডও একপ্রকার তৎস্বকাণ্ড বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।”

এই তৎস্বদিগের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষা করাকে কৃষ্ণ পরম ধর্ম বিবেচনা করেন। আধুনিক নীতিজ্ঞদিগেরও সেই মত। ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজি নাম Justice; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism। উভয়েরই দেশীয় নাম স্বধর্মপালন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,

“এই বিষয়ের অস্ত্র প্রাণ পণ্যস্ত পণ্যস্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও প্রাণনীয়, তথাপি পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধারণে বিমুগ্ধ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে।”

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধর্মের ভণ্ডামি শুনিয়া সঞ্জয়কে কিছু সঙ্গত তিরস্কারও করিলেন। বলিলেন, “তুমি এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ, কিন্তু তৎকালে (যখন হুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে)

* তবে যেখানে কেবল পরোপকারার্থ পরের রাজ্য হস্তগত করা যায়, সেখানে নাকি ভিন্ন কথা হইতে পারে। সেজন্য কাণ্ডের বিচারে আমি সন্মত নহি—কেন না রাজনীতিজ্ঞ নহি

সজ্জনগণে হুঁশিয়ারনকে ধর্মোপদেশ প্রদান কর নাই।” কৃষ্ণ সতরাচর প্রিয়বাদী, কিন্তু যথার্থ দোষকীর্তনকালে যড় স্পষ্টবক্তা। সত্যই সর্বকালে তাঁহার নিকট প্রিয়।

সজ্জনকে তিরস্কার করিয়া, ত্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন যে, উভয় পক্ষের হিত সাধনার্থ স্বয়ং হস্তিনা নগরে গমন করিবেন। বলিলেন, “যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্বহানি না হয়, এবং কৌরবেরাও সজ্জি সংস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে, সুমহৎ পুণ্যকর্মের অমুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।”

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণরক্ষার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ, কৃষ্ণ এই দুষ্কর কর্মে স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন। মনুষ্য শক্তিতে দুষ্কর কর্ম, কেন না এক্ষণে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে বরণ করিয়াছে; এজন্ত কৌরবেরা তাঁহার সঙ্গে শত্রুৎসবং ব্যবহার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু লোকহিতার্থ তিনি নিরস্ত্র হইয়া শত্রুপুরী মধ্যে প্রবেশ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যানসন্ধি

এইখানে সজ্জনযান-পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত। সজ্জনযান-পর্ব্বাধ্যায়ে শেষ ভাগে দেখা যায় যে কৃষ্ণ হস্তিনা যাইতে প্রতীক্ষিত হইলেন, এবং বাস্তবিক তাহার পরেই তিনি হস্তিনায় গমন করিলেন বটে। কিন্তু সজ্জনযান-পর্ব্বাধ্যায় ও ভগবদযান-পর্ব্বাধ্যায়ের মধ্যে আর তিনটি পর্ব্বাধ্যায় আছে; “প্রজাগর,” “সনৎসুজাত” এবং “যানসন্ধি।” প্রথম দুইটি প্রসিদ্ধ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই নাই—অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম ও নীতি কথা আছে। কৃষ্ণের কোন কথাই নাই, সুতরাং ঐ দুই পর্ব্বাধ্যায়ে আমাদের কোন প্রয়োজনও নাই।

যানসন্ধি-পর্ব্বাধ্যায়ে সজ্জন হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া গুহতরাষ্ট্রকে যাহা যাহা বলিলেন, এবং তজ্জু বণে গুহতরাষ্ট্র, ত্র্যর্থোদধন এবং অম্বাশ্র কৌরবগণে যে বাদানুবাদ হইল, তাহাই কথিত আছে। বক্তৃত্তা সকল অতি দীর্ঘ, পুনরুক্তির অত্যন্ত বাছল্যবিশিষ্ট এবং অনেক সময়ে নিশ্চয়োজ্ঞনীয়। কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, ইহার দুই স্থানে আছে।

প্রথম, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে। ধৃতরাষ্ট্র অতিবিস্তারে অর্জুনবাক্য সঞ্জয় মুখে শুনিয়া, আবার হঠাৎ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি, অতএব তাহাই কীর্তন কর।”

তদুত্তরে, সঞ্জয়, সভাতলে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহার কিছুই না বলিয়া, এক আঘাতে গল্প আরম্ভ করিলেন। বলিলেন যে তিনি পাটিপি পাটিপি,—অর্থাৎ চোরের মত, পাণ্ডবদিগের অন্তঃপুরमध्ये অভিমত্য় প্রভৃতিরও অগম্য স্থানে গমন করিয়া কৃষ্ণার্জুনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেখেন কৃষ্ণার্জুন মদ খাইয়া উন্নত। অর্জুন, দ্রৌপদী ও সভাভামার পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া আছেন। কথাবার্তা নূতন কিছুই হইল না। কৃষ্ণ কেবল কিছু দস্তুর কথা বলিলেন,—বলিলেন, “আমি যখন সহায় তখন অর্জুন সকলকে মারিয়া ফেলিবে।”

তার পর অর্জুন কি বলিলেন, সে কথা এখানে আর কিছু নাই, অথচ ধৃতরাষ্ট্র তাহা শুনিতে চাহিয়াছিলেন। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শেষে আছে, “অনন্তর মহাবীর কীরীটি তাঁহার (কৃষ্ণের) বাক্য সকল শুনিয়া লোমহর্ষণ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।” এই কথায় পাঠকের এমন মনে হইবে যে, বুদ্ধি উনষষ্টিতম অধ্যায়ে অর্জুন যাহা বলিলেন, তাহাই কথিত হইতেছে। সে দিক্ দিয়া উনষষ্টিতম অধ্যায় যায় নাই। উনষষ্টিতম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে কিছু অনুযোগ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বলিলেন। ষষ্টিতম অধ্যায়ে দুর্যোধন প্রত্যুত্তরে বাপকে কিন্তু কড়া কড়া শুনাইয়া দিল। একষষ্টিতম অধ্যায়ে কর্ণ আসিয়া মাঝে পড়িয়া কিছু বক্তৃতা করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে উত্তম মধ্যম রকম শুনাইলেন। কর্ণে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। দ্বিষষ্টিতমে দুর্যোধনে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। ত্রিষষ্টিতমে ভীষ্মের বক্তৃতা। চতুঃষষ্টিতমে বাপ বেটায় আবার বাধিল। পরে, এত কালের পর আবার হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অর্জুন কি বলিলেন? তখন সঞ্জয় সেই অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের ছিন্ন সূত্র যোড়া দিয়া অর্জুনবাক্য বলিতে লাগিলেন। বোধ করি কোন পাঠকেরই এখন সংশয় নাই যে, ৫৯৬০৬১৬২১৬৩১৬৪ অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত। এই কয় অধ্যায়ে মহাভারতের ক্রিয়া এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। এই অধ্যায়গুলি বড় স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম।

যে সকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়কেও সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে—পরবর্তী এই অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্তের উপর প্রক্ষিপ্ত। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে, ইহা যে

কেবল অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন এমন নহে, পূর্বোক্ত কৃষ্ণবাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সকল বৃত্তান্তের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ অমৃতকমণিকাধ্যায়ে বা পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই। বোধ হয়, কোন রসিক লেখক, অমরনিপাতন শৌরি এবং অরনিপাতনী সুরা, উভয়েরই ভক্ত; একত্রে উভয় উপাত্তকে দেবিস্বার জন্ত অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়টি প্রস্তুত করিয়াছেন।

যানসন্ধি-পর্বাদ্যায়ে এই গেল কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রথম প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, সপ্তষষ্টিতম হইতে সপ্ততিতম পর্য্যন্ত চারি অধ্যায়ে। এখানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। সঞ্জয় এখানে পূর্বের যাহাকে মন্ত্যপানে উদ্ধৃত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকেই জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বোধ হয় ইহাও প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ হউক না হউক ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যদি অস্ত্র কারণে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে আমাদের প্রয়োজন কি? আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে এমন কিছুই নাই যে, তাহার বলে আমাদের বিশ্বাস হইতে পারে। অতএব সঞ্জয়বাক্যের সমালোচনা আমাদের নিম্প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের মাহুয চরিত্রের কোন কথাই তাহাতে আমরা পাই না। তাহাই আমাদের সমালোচ্য।

এইখানে যানসন্ধি-পর্বাদ্যায় সমাপ্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা যাত্রার প্রস্তাব

শ্রীকৃষ্ণ, পূর্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরবদিগের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। গমনকালে পাণ্ডবেরা ও দ্রৌপদী, সকলেই তাঁহাকে কিছু কিছু বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের কথার উত্তর দিলেন। এই সকল কথোপকথন অবশ্য ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে কবি ও ইতিহাসবেত্তা যে সকল কথা কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, কৃষ্ণের কিরূপ পরিচয় তিনি অবগত ছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতা হইতে আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন, “হে মহারাজ, ব্রহ্মচর্য্যাদি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদায় আশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের তৈক্ষ্ণ্যচরণ নিষেধ করিয়া

থাকেন। বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণপরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। হে অস্বাভিনিপাতন বৃথিষ্ঠির! আপনি দীনতা অবলম্বন করিলে, কখনই স্বীয় অংশ লাভ করিতে পারিবেন না। অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করুন।”

গীতাতেও অর্জুনকে কৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিয়াছেন দেখা যায়। ইহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা পূর্বে বুঝান গিয়াছে। পুনশ্চ ভীমের কথার উত্তরে বলিতেছেন, “মমুহ্ম পুরুষকার পরিত্যাগপূর্বক কেবল দৈব বা দৈব পরিত্যাগপূর্বক কেবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে কর্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যথিত বা কর্ম সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট হয় না।”

গীতাতেও এইরূপ উক্তি আছে।* অর্জুনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন,

“উর্ধ্ব ক্ষেত্রে যথানিয়মে হলচালন বীজবপনাদি করিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোৎপত্তি হয় না। পুরুষ যদি পুরুষকার সহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাপি দৈবপ্রভাবে উহা শুষ্ক হইতে পারে। অতএব প্রাচীন মহাত্মাগণ দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মিলিত না হইলে কার্য সিদ্ধি হয় না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি; কিন্তু দৈব কর্মের অহুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।”

এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্বে করিয়াছি। কৃষ্ণ এখানে দেবত্ব একেবারে অস্বীকার করিলেন। কেন না, তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম সাধনে প্রবৃত্ত। ঐশী শক্তির দ্বারা কর্মসাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, অবতারের কোন প্রয়োজন থাকে না।

অত্যাশ্রয় বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় এমন একটা কথা আছে যে, জীলোকের মুখে তাহা অতি বিস্ময়কর। তিনি বলিতেছেন—

“অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।”

এই উক্তি জীলোকের মুখে বিস্ময়কর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বহু বৎসর পূর্বে বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদীচরিত্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে এই বাক্যের অত্যন্ত স্মরণ্যতা আছে। আর জীলোকের মুখে ভাল শুনাচ্ না শুনাচ্, ইহা যে প্রকৃত ধর্ম, এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত, ইহাও আমি জরাসন্ধবধের সমালোচনাকালে ও অন্ত্র সময়ে বুঝাইয়াছি।

জ্যোৎস্নার এই বহুতার উপসংহারকালে এক অগূৰ্ব কবিত্বকৌশল আছে। তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

“অনিতাপাক্ষী জগদনন্দিনী এই কথা শুনিয়া কুটিলগ্র, পরম রমণীয়, সর্বগন্ধাধিবাসিত, সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন, মহাত্মজগদদূষ, কেশকলাপ ধারণ করিয়া অঙ্গপূর্ণলোচনে দীননয়নে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দন! দুঃখা দুঃশাসন আমার এই কেশ আর্ষণ করিয়াছিল। শক্রগণ সন্ধিস্থাপনের মতপ্রকাশ করিলে তুমি এই কেশকলাপ শ্রবণ করিবে। ভীমার্জুন দীনের ছায় সন্ধি স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, আমার বৃদ্ধ পিতা মহাবীর পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন, আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র অভিমহ্যারে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে। দুঃখা দুঃশাসনের শ্রামল বাহু ছিন্ন, ধরাতলে নিপতিত, ও পাংশুলুষ্ঠিত, না দেখিলে আমার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ছায় ক্রোধ স্থাপন পূর্বক ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি তাহা উপশমিত হইবার কিছুমাত্র উপায় দেখিতেছি না; আজি আবার দর্শ্যপঞ্চাবলম্বী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

“নিবিড়নিতম্বিনী আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা কহিয়া বাস্পগদগদস্বরে কম্পিতকলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, অবীভূত হতাশনের ছায় অত্যাশ নেত্রজলে তাঁহার স্তনযুগল অভিযুক্ত হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু বাহুদেব তাঁহারে সান্ধনা করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি অতি অল্প দিন মধ্যেই কৌরব মহিলাগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি যেমন রোদন করিতেছ, কুরুকুলকামিনীরাও তাহাদের জাতি বান্ধবগণ নিহত হইলে এইরূপ রোদন করিবে। আমি যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীমার্জুন নকুল সহদেব সমভিব্যাহারে কৌরবগণের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কানপ্রেরিতের ছায় আমার বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিলে অচিরে নিহত ও শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইয়া ধরাতলে শয়ন করিবে। যদি হিমবান্ প্রচলিত, যেদিনী উৎক্লিষ্ট ও আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহের সহিত নিপতিত হয় তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে কৃষ্ণ! বাস্প সংবরণ কর; আমি তোমারে যথার্থ কহিতেছি, তুমি অচিরকাল মধ্যেই স্বীয় পতিগণকে শত্রু সংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিতে দেখিবে।”

এই উক্তি শোণিতপিপাসুর ত্রিসাপ্রসূত্বজনিত বা ক্রুদ্ধের ক্রোধোত্তিভ্যক্তি নহে। যিনি সর্বত্রগামী সর্বকালব্যাপী বুদ্ধির প্রভাবে, ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যদ্বক্তা মাত্র। কৃষ্ণ বিলক্ষণ জানিতেন যে, দুর্ঘোষন রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণপূর্বক সন্ধি স্থাপন করিতে কদাপি সম্মত হইবে না। ইহা জানিয়াও যে তিনি সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরব সভায় গমনের জন্ত উজোগী, তাহার কারণ এই যে, যাহা অন্তর্ভুক্ত তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, করিতে হইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিতে

হইবে। ইহাই তাঁহার সুখনির্দিষ্ট নীতান্ত অমৃতময় ধর্ম। তিনি নিজেই আত্মনকে লিখাইয়াছেন যে,

সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সর্বো কৃষ্ণা সমস্তং বোপ উচ্যতে।

সেই নীতির বশবর্তী হইয়া, আদর্শযোগী, ভবিষ্যৎ জানিয়াও সঙ্কীর্ণাপনের চেষ্টার কৌরব সত্তার চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যাত্রা

যাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্যবহারই মনুষ্যোপযোগী এবং কালোচিত। তিনি “রেবতী নক্ষত্রযুক্ত কার্তিকমাসীয় দিনে মৈত্র মুহূর্ত্তে কৌরব সভায় গমন করিবার বাসনায় সুবিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল্য পুণ্যনির্ঘোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক স্নান ও বসনভূষণ পরিধান করিয়া সূর্য্য ও বহির উপাসনা করিলেন; এবং বুধলাঙ্গুল দর্শন, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ, ও কল্যাণকর দ্রব্য সকল সন্দর্শনপূর্বক,” যাত্রা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ধর্ম প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে তৎকালে প্রবল কাম্যকর্ম-পরায়ণ যে বৈদিক ধর্ম, তাহার নিন্দাবাদ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে কখনও অবমাননা করিতেন না। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এই জন্ত তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে ব্যবহার উচিত ছিল, তিনি তাহাই করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণেরা বিদ্বান, জ্ঞানবান, ধর্ম্মাত্মা, এবং অস্বার্থপর হইয়া সমাজের মঙ্গলসাধনে নিরত ছিলেন, এজন্ত অশ্রু বর্ণের নিকট, পূজা তাঁহাদের স্থায়্য প্রাপ্য। কৃষ্ণও সেই জন্ত তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপ পূজা করিতেন। উদাহরণস্বরূপ, পথিমধ্যে স্বমিগণের সমাগমের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি।

“মহাবাহু কেশব এইরূপে কিয়দূর গমন করিয়া পথের উভয়পার্শ্বে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান কতিপয় মহাবিরে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অভিবাদনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাবিগ্ণ! সমুদায় লোকের কুশল? ধর্ম উত্তমরূপে অম্লষিত হইতেছে? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণজয় ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় শিষ্ট হইয়াছেন?

কোন্‌র বাইতে বাল্য কবিত্তেছেন? আগনাদের প্রয়োজন কি? আরোহে আপনাদের কোন্‌ কারী অহুষ্ঠান করিতে হইবে? এবং আপনাদি কি নিমিত্ত বয়সীতে অরতীপ হইয়াছেন?

“তখন মহাজ্ঞানী জামদগ্ন্য কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবর্ষি, কেহ কেহ বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ রাজর্ষি এবং কেহ কেহ তপস্বী। আমরা অনেকবার দেবাত্মের সমাগম দেখিয়াছি; এক্ষণে সমুদায় ক্ষত্রিয় সভাপন হুগতি ও আপনাদের অবলোকন করিবার বাল্যায় গমন করিতেছি। আমরা কোরব সভায় আপনায় মুখনির্গত ধর্ম্মার্থবৃত্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে বাদবশ্ৰেষ্ঠ! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদ্যর প্রভৃতি মহাত্মগণ এবং আপনি যে গতা ও ভিত্তকর বাক্য কহিবেন; আমরা সেই সকল বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি।

“এক্ষণে আপনি সম্মুখে হুহুরাজ্যে গমন করুন; আমরা তথায় আপনাদের সভামণ্ডপে দ্বিধ্য আসনে আসীন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনায় সহিত কথোপকথন করিব।”

এখানে ইহাও বক্তব্য যে, এই জামদগ্ন্য পরশুরাম কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রামায়ণে আবার তিনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অথচ পুরাণে তিনি রাম কৃষ্ণ উভয়েরই পূর্বগামী বিষ্ণুর অবতারান্তর বলিয়া খ্যাত। পুরাণের দশাবতারবাদ কত দূর সঙ্গত, তাহা আমরা প্রস্থান্তরে বিচার করিব।

এই হস্তিনায়াত্রার বর্ণনায় জানা যায় যে, কৃষ্ণ নিজেরও সাধারণ প্রজার নিকটেও পূজ্য ছিলেন। হস্তিনায়াত্রার বর্ণনা আরও কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

“দেবকীন্দন সর্বশস্ত্রপরিপূর্ণ অতি রম্য স্থানস্পদ পরম পবিত্রশালিভবন এবং অতি মনোহর ও হৃদয়-তোষণ বহুবিধ গ্রাম্যপশু সন্দর্শনকরতঃ বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত নিত্য-প্রস্তুত অহুষ্ণি ব্যসনরহিত পুরবাসিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে উপলব্ধ নগর হইতে পথিমধ্যে আগমন করিয়া তাঁহার পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বাহুদেব সমাগত হইলে তাহার বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

“এদিকে ভগবান্‌ মরীচিমালী স্বীয় কিরণজাল পরিত্যাগ করিয়া লোহিত কলেবর ধারণ করিলে অরাতিনিপাতন মধুসূদন বৃকস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সম্মুখে রথ হইতে অবতরণপূর্বক যথাবিধি শৌচ সমাপনান্তে রথায়মোচনে আদেশ করিয়া সন্ধ্যায় উপাসন: করিতে লাগিলেন। দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করতঃ শাস্ত্রানুসারে তাহাদের পরিচর্যা ও গাত্র হইতে সমুদয় যোক্তাদি মোচন করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। মহাত্মা মধুসূদন সন্ধ্যা সমাপনান্তে স্বীয় সমভিব্যাহারী জনগণকে কহিলেন, হে পরিচারকবর্গ! অস্ত্র যুধিষ্ঠিরের কার্য্যাহুরোধে এই স্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে। তখন পরিচারকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্ডপ নির্মাণ ও বিবিধ হুমিষ্ট অন্নপান প্রস্তুত করিল। অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বী আৰ্য্য কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদায় অমাত্যকুলকালান্তক মহাত্মা স্ববীকেশের সমীপে আগমনপূর্বক বিধানানুসারে তাঁহার পূজা ও আশীর্বাদ করিয়া স্ব স্ব ভবনে আশ্রয়

করিতে আসনা করিলেন। ভগ্নবান্ মধুসূদন তাঁহারে অভিশ্রমে লম্বত হইলেন এবং তাঁহারিগকে অর্চন-পূর্বক তাঁহারে বঁধনে গমন করিয়া তাঁহারিগের সমভিব্যাহারে পুনর্বার স্বীয় পটমণ্ডপে আগমন করিলেন। পরে সেই লম্বদার ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে স্থমিষ্ট এব্যাক্ত ভোজন করিয়া পরে হুখে বাসিনী যাপন করিলেন।

ইহা নিভাঙ্কই সাদ্ধব চরিত্র, কিন্তু আদর্শ মনুষ্যের চরিত্র।

দেখা যাইতেছে যে, দেবতা বলিয়া কেহ তাঁহাকে পূজা করিতেছে, এমন কথা নাই। তবে জ্যেষ্ঠ মনুষ্য যেরূপ পূজা পাইবার সম্ভাবনা তাহাই তিনি পাইতেছেন, এবং আদর্শ মনুষ্যের লোকের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা সম্ভব, তিনি তাহাই করিতেছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হস্তিনায় প্রথম দিবস

কৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার অভ্যর্থনা ও সম্মানের জন্ত বড় বেশী রকম উত্তোগ আরম্ভ করিলেন। নানারত্নসমাকীর্ণ সভা সকল নির্মাণ করাইলেন, এবং তাঁহাকে উপঢৌকন দিবার জন্ত অনেক হস্ত্যশ্বরথ, দাস, “অজ্ঞাতাপত্য শতসংখ্যক দাসী”, মেঘ, অশ্বতরী, মণিমাণিক্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

বিহ্বল দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, “ভাল, ভাল। তুমি যেমন ধার্মিক, তেমনই বুদ্ধিমান। কিন্তু রত্নাদি দিয়া কৃষ্ণকে ঠকাইতে পারিবে না।, তিনি যে জন্ত আসিতেছেন, তাহা সম্পাদন কর; তাহা হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন—অর্থপ্রলোভিত হইয়া তোমার বশ হইবেন না।”

ধৃতরাষ্ট্র ধূর্ত, এবং বিহ্বল সরল, দুর্যোধন হুই। তিনি বলিলেন, “কৃষ্ণ পূজনীয় বটে, কিন্তু তাঁহার পূজা করা হইবে না। যুদ্ধ ত ছাড়িব না; তবে তাঁর সমাদরে কাজ কি? লোকে মনে করিবে আমরা ভয়েই বা তাঁহার খোষামোদ করিতেছি। আমি তদপেক্ষা সং পরামর্শ স্থির করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিব। পাণ্ডবের বল বুদ্ধি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ আটক থাকিলে পাণ্ডবেরা আমার বশীভূত থাকিবে।”

এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রকে তিরস্কার করিতে বাধ্য হইলেন। কেন না, কৃষ্ণ দূত হইয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম দুর্যোধনকে কতকগুলি কটুক্তি করিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন।

নাগরিকেরা, এবং কোরবেরা বহু সম্মানের সহিত কৃষ্ণকে কুরুসভায় আনিত করিলেন। তাঁহার জন্ত যে সকল সজ্জা নির্মিত ও রত্নভাজ রক্ষিত হইয়াছিল, তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। তিনি ধৃতরাষ্ট্র ভবনে গমন করিয়া কুরুসভায় উপবেশন-পূর্বক, যে যেমন যোগ্য তাঁহার সঙ্গে সেইরূপ সংসদ্বাষণ করিলেন। পরে সেই রাজপ্রাসাদ পরিভ্রমণ করিয়া, দীনবন্ধু এক দীনভবনে চলিলেন।

বিহুর, ধৃতরাষ্ট্রের এক রক্ষক ভাই। উভয়েরই ব্যাসদেবের ঔরসে জন্ম। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র রাজা বিচিত্রবীর্ষের ক্ষেত্রজ পুত্র; বিহুর তাহা নহে। তিনি, বিচিত্রবীর্ষের দাসী এক বৈশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিচিত্রবীর্ষের ক্ষেত্রজ ধরিলেও, তাঁহার জাতি নির্ণয় হয় না। কেন না, ব্রাহ্মণের ঔরসে, কত্রিয়ের ক্ষেত্রে, বৈশ্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম। তিনি সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু পরম ধার্মিক। কৃষ্ণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়া, তাঁহার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেই জন্ত, আজিও এ দেশে “বিহুরের খুদ,” এই বাক্য প্রচলিত আছে। পাণ্ডবমাতা কুন্তী, কৃষ্ণের পিতৃসমা, সেইখানে বাস করিতেন। বনগমনকালে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সেইখানে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীকে প্রণাম করিতে গেলেন। কুন্তী পুত্রগণ ও পুত্রবধূর চুঃখের বিবরণ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। উত্তরে কৃষ্ণ যাহা তাঁহাকে বলিলেন, তাহা অমূল্য। যে ব্যক্তি মনুষ্য চরিত্রের সর্বপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহই সে কথার অমূল্যত্ব বুঝিবে না। মূর্খের ত কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

* মহাতারতীয় নায়কদিগের সকলেরই জাতি সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ। পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ : পাণ্ডবদিগের অপিতামহী সভ্যবতী, দাসকন্যা। ভীষ্মের মার জাতি বৃকোদ্বার বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এমনটা তিনি পলানন্দন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ব্রাহ্মণের ঔরসে, কত্রিয়ার গর্ভজাত। ব্যাস নিজে সেই ধীবরনন্দিনীর কানীনপুত্র। অতএব পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জাতি সম্বন্ধে এত গোলযোগ বে, এখনকার দিনে, তাঁহারা সর্বজাতির অপাক্ষেপ হইতেন। পাণ্ডুর পুত্রগণ, কুন্তীর গর্ভজাত বটে, কিন্তু বাপের বেটা নহেন; পাণ্ডু নিজে পুত্রোৎপাদনে অক্ষম। তাঁহারা ইন্দ্রাবির ঔরসপুত্র বলিয়া পরিচিত। এমিকে, দ্রোণাচার্যের পিতা ভরদ্বাজ কবি, কিন্তু না একটা কলসী : কলসীর গর্ভধার যাহাদের বিশ্বাস না হইবে, তাঁহারা দ্রোণের মাতৃহুল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইবেন। পাণ্ডবদিগের পিতা সম্ভার যত গোলযোগ, কর্ণ সম্বন্ধেও তত—বেশীর জাগ তিনি কানীন। দ্রোণদী ও ধুট্টারের বাপ না কে, কেহ বলিতে পারে না; তাঁহারা যজ্ঞোদ্ধৃত।

এ সময়ে কিন্তু, বিবাহ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ ছিল না। অমূল্যের প্রতিভার বিবাহের কথা বলিতেছি না। অনেক ধর্মি ধর্মপত্নীও কত্রিয় কন্যা ছিলেন; যথা অশ্বত্থপত্নী দ্রোণামুদ্রা, পুত্রশূরের স্ত্রী শান্তা, বটীকভার্যা, জমদগ্নির ভার্যা (কেহ কেহ বলেন পরশুরামের ভার্যা) রেণুকা ইত্যাদি। এমনও কথা আছে যে, পরশুরাম পৃথিবী কত্রিয়শূত্র করিলে, ব্রাহ্মণদিগের ঔরসেই পরবর্তী কত্রিয়ারা জন্মিয়াছিলেন। পঞ্চাশত্রে ব্রাহ্মণকন্যা দেবদানী, কত্রিয় বহাতির ধর্মপত্নী। আহািরাদি সম্বন্ধে কোন বাঁধাবিধি ছিল না, তাহাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য, পরশুরামের অন্নভোজন করিতেন।

“পাণ্ডবগণ, নিজা, ভজা, কোণ, হৰ্ষ, সুখা, শিপাসা, হিম, রৌদ্র, পরাজয় করিয়া বীরোচিত হুখে নিরত বহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়হুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত হুখে লুপ্ত আছেন; সেই মহাবল-পরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অরে: লুপ্ত হইবেন না। বীরব্যক্তির হৃদয় অতিশয় ক্রোধ না হয় অত্যাশঙ্ক্য হুখ সন্তোষ করিয়া থাকেন; আর ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই লুপ্ত থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস দুঃখের নিদান।”

“রাজ্যলাভ বা বনবাস” * এ কথা ত আধুনিক হিন্দু বুঝে না। বুঝিলে, এত দুঃখ থাকিত না। যে দিন বুঝিবে, সে দিন আর দুঃখ থাকিবে না। হিন্দু পুরাণেতিহাসে এমন কথা থাকিতে আমরা কি না, মেম সাহেবদের লেখা নবেল পড়িয়া দিন কাটাই, না হয় সভা করিয়া পাঁচ জনে জুটিয়া পাখির মত কিচির মিচির করি।

কৃষ্ণ কুন্তীকে আরও বলিলেন, “আপনি তাহাদিগকে শত্রুবিনাশ করিয়া সকল লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে দেখিবেন।”

অতএব কৃষ্ণ নিশ্চিত জানিতেন যে, সন্ধি হইবে না—যুদ্ধ হইবে। তথাপি সন্ধি স্থাপন জন্ত হস্তিনায় আসিয়াছেন; কেন না যে কর্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা সন্ধি হইক বা না হইক, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, ফলাফলে অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য সাধন করিতে হয়। ইহাকেই তিনি গীতায় কর্মযোগ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। যুদ্ধের অপেক্ষা সন্ধি মনুষ্যের হিতকর; এই জন্ত সন্ধিস্থাপন অনুষ্ঠেয়। কিন্তু যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণই আবার যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ অর্জুনের প্রধান উৎসাহদাতা, ও সহায়। কেন না, যখন সন্ধি অসাধ্য তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় ধর্ম। অতএব যে কর্মযোগ তিনি গীতায় উপদিষ্ট করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহাতে প্রধান যোগী। তাঁহার আদর্শ চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিব বলিয়াই এত প্রয়াস পাইতেছি।

কৃষ্ণ, কুন্তীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনর্বীর কৌরব সভায় গমন করিলেন। সেখানে গেলে, হৃষ্যোধন তাঁহাকে ভোজনের জন্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। হৃষ্যোধন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাকে লৌকিক

* মিল্টনের সূত্রচোতা সমতানু বলিয়াছিল যে, স্বর্গে দাসত্বের অপেক্ষা বরং নরকে রাজত্ব শ্রেয়ঃ। আমি জানি যে, আমরা এমন পাঠক অনেক আছেন, বাঁহারা এই কুস্রোক্তির সঙ্গে উপরি লিখিত মহতী বাণীর কোন প্রভেদ দেখিবেন না। তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব সন্দেহ আমি সম্পূর্ণরূপে আশাপাণ্ড। লঘুচেতা, পরের প্রভুত্ব সহ্য করিতে পারে না। মহাত্মা, কর্তব্যানুরোধে তাহা পারেন, কিন্তু মহাত্মা জানেন যে, মহাত্ম্য বা মহাহুখ বাতীত, তাঁহার বহুবিধায়াকালিনী চিত্তবৃত্তি সকল ক্ষুণ্ণপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

নীতিটা অরণ করাইয়া দিলেন। বলিলেন, “দুঃখণ কার্যসম্বাদে ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাক; অতঃপর আমি কৃতকার্য হইলেই আপনার পূজা গ্রহণ করিব।” হৃষ্যোধন তবুও ছাড়েন না; আবার শীড়্যগাড়ি করিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন,

“লোকে হয় শ্রীতি পূর্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অস্তের অন্ন ভোজন করে। আপনি শ্রীতি সহকারে আমায়ে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই; আমিও বিপন্ন হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব?”

ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ একটা সামান্য কর্ম; কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবন, সচরাচর কতকগুলি সামান্য কর্মের সমবায় মাত্র। সামান্য কর্মের ক্ষুদ্র একটা নীতি আছে অথবা ধাকা উচিত। বৃহৎ কর্ম সকলের নীতির যে ভিত্তি, ক্ষুদ্র কর্ম সকলের নীতির সেই ভিত্তি। সে ভিত্তি ধর্ম। তবে উন্নতচরিত্র মনুষ্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রচেতার এই প্রভেদ যে, ক্ষুদ্রচেতা ধর্মে পরামুখ না হইলেও, সামান্য বিষয়ে নীতির অনুবর্তী হইতে সক্ষম হয়েন না, কেন না নীতির ভিত্তি তিনি অনুসন্ধান করেন না। আদর্শ মনুষ্য এই ক্ষুদ্র বিষয়েও নীতির ভিত্তি অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন যে, এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ সরলতা ও সত্যের বিরুদ্ধ হয়। অতঃপর হৃষ্যোধনকে সরল ও সত্য উত্তর দিলেন, স্পষ্ট কথা পরুষ হইলেও তাহা বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। যেখানে অকপট ব্যবহার ধর্মোন্মত্ত হয়, সেখানেও তাহা পরুষ বলিয়া আমরা পরামুখ। এই ধর্মবিরুদ্ধ লজ্জা অনেক সময়ে আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধর্মে বিপন্নও করে।

কৃষ্ণ তার পর কুরুসভা হইতে উঠিয়া, বিহুরের ভবনে গমন করিলেন।

বিহুরের সঙ্গে রাখে তাঁহার অনেক কথোপকথন হইল। বিহুর তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার হস্তিনায় আসা অস্বাভাবিক হইয়াছে; কেন না হৃষ্যোধন কোনমতেই সন্ধি স্থাপন করিবে না। কৃষ্ণের উত্তর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

“যিনি অশক্লান্তরথসমবেত বিপর্যস্ত সমুদ্র পৃথিবী রূপাশ্রয় হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্মলাভ হয়।”

ইউরোপের প্রতি রাজপ্রাসাদে এই কথাগুলি সর্বাঙ্গেরে লিখিয়া রাখা উচিত। সিমলার রাজপ্রাসাদেও বাদ না পড়ে। কৃষ্ণ পুনশ্চ বলিতেছেন,

“যে ব্যক্তি বাসনগ্রস্ত বান্ধব মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ববান না হয়, পণ্ডিতগণ তাঁহারে নৃশংস বলিয়া কীর্জন করেন। প্রাজ ব্যক্তি মিথ্যের বেশ পর্যস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। * * * * * যদি তিনি (হৃষ্যোধন) আমার হিতকর বাক্য গ্রহণ করিয়াও আমার

প্রতি শ্রদ্ধা করেন, তাহাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই; প্রত্যুত আত্মীয়কে সহৃদয়প্রদান নিরাক্ষর পরম সন্তোষ ও আনন্ধ্য লাভ হইবে। যে ব্যক্তি জাতিভেদ সময়ে সম্পরামর্শ প্রদান না করে; সে ব্যক্তি কখন আত্মীয় নহে।”

ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাস, কৃষ্ণ কেবল পরজীবীলোক পাণ্ডিত্য গোপ; এ দেশের লোকের কাহারও বা সেইরূপ বিশ্বাস, কাহারও বিশ্বাস যে তিনি মনুষ্যহত্যার জন্ত অবতীর্ণ, কাহারও বিশ্বাস তিনি “চক্রী”—অর্থাৎ স্বাভিলাষসিদ্ধি জন্ত কুচক্র উপস্থিত করেন। তিনি যে এ সকল নহে—তিনি যে তৎপরিবর্তে লোকহিতৈষীর শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, ধর্মোপদেষ্টার শ্রেষ্ঠ, আদর্শ মনুষ্য, ইহাই বুঝাইবার জন্ত এই সকল উদ্ধৃত করিতেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস

পরদিন প্রাতে স্বয়ং হৃষ্যোধন ও শকুনি আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিচরভবন হইতে কোরবলভায় লইয়া গেলেন। অতি মহতী সভা হইল। নারদাদি দেবর্ষি, এবং জমদগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি ভাষায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ পরম বাগ্মিতার সহিত দীর্ঘ বক্তৃতায় যুতরাষ্ট্রকে সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন। স্ববিগণও সেইরূপ করিলেন। কিছুতে কিছু হইল না। যুতরাষ্ট্র বলিলেন, “আমার সাধ্য নহে, হৃষ্যোধনকে বল।” হৃষ্যোধনকে কৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি অনেক প্রকার বুঝাইলেন। সন্ধি স্থাপন দূরে থাক, হৃষ্যোধন কৃষ্ণকে কড়া কড়া শুনাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও তাহার উপযুক্ত উত্তর দিলেন। হৃষ্যোধনের হৃচ্চরিত্র ও পাপাচরণ সকল বুঝাইয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া হৃষ্যোধন উঠিয়া গেলেন।

তখন কৃষ্ণ, যাহা সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতির মূলমন্ত্র, তদমুসারে কার্য্য করিতে যুতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন। রাজশাসনের মূলমন্ত্র এই যে, প্রজারক্ষার্থ হৃদয়কারীকে দণ্ডিত করিবে। অর্থাৎ অনেকের হিতার্থ একের দণ্ড বিধেয়। সমাজের রক্ষার্থ হত্যাকারীর বধ বিহিত। যাহাকে বন্ধ না করিলে তাহার পাপাচরণে বহুসংস্র প্রাণীর প্রাণসংহার হইবে, তাহাকে বন্ধ করাই জ্ঞানীর উপদেশ। ইউরোপীয় সমস্ত রাজা ও রাজমন্ত্রী পরামর্শ করিয়া এই জন্ত খ্রিঃ ১৮১৫ অব্দে নপোলিয়নকে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জন্ত মহানীতিজ্ঞ কৃষ্ণ যুতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন যে, হৃষ্যোধনকে বাঁধিয়া পাণ্ডবদিগের

সহিত সন্ধি করুন। তিনি নিজে, সমস্ত যত্নবশেষের রক্ষার্থ, কংস মাতুল হইলেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সে উদাহরণও দিলেন। বলা বাহুল্য যে এ পরামর্শ গৃহীত হইল না।

এদিকে দুর্যোধন রুষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিবার জন্ত কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি, কৃতবর্মা, প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাত্যকি কৃষ্ণের নিতান্ত অনুরাগ ও প্রিয়; অত্র বিজ্ঞায় অর্জুনের শিষ্য, এবং প্রায় অর্জুনতুল্য বীর। ইন্দ্রিভজ মহাবুদ্ধিমান সাত্যকি এই মন্তব্য জানিতে পারিলেন। তিনি অশ্রুতর যাদববীর কৃতবর্মাকে সসৈন্তে পুরদ্বারে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া কৃষ্ণকে এই মন্তব্য জানাইলেন। এবং সভামধ্যে প্রকাশ্যে ইহা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে জানাইলেন। শুনিয়া বিহ্বল ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,

“যেমন পতঙ্গগণ পাবকে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদের দশাও কি সেইরূপ হইবে না? সেইরূপ জনাৰ্দ্দন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধকালে সকলকেই শমনসমানে প্রেরণ করিবেন।” ইত্যাদি।

পরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা স্বার্থার্থই আদর্শ পুরুষের উক্তি। তিনি বলশালী, সুতরাং ক্রোধশূন্য এবং ক্ষমাশীল। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,

“তুনিতেছি দুর্যোধন প্রভৃতি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপূর্বক নিগৃহীত করিবেন। কিন্তু আপনি অহমতি করিয়া দেখুন, আমি ইহাদিগকে আক্রমণ করি কি ইহারা আমাকে আক্রমণ করেন। আমার এরূপ সামর্থ্য আছে, যে আমি একাকী ইহাদিগকে সকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি কোন প্রকারেই নিমিত্ত পাপজনক কর্ষ করিব না। আপনার পুত্রেরাই পাণ্ডবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া স্বার্থভ্রষ্ট হইবেন। বস্তুতঃ ইহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কৃতকার্য করিতেছেন। আমি অতাই ইহাদিগকে ও ইহাদিগের অহুচরগণকে নিগ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণকে প্রাধান্য করিতে পারি। তাহাতে আমাকে পাপভাগী হইতেও হয় না। কিন্তু আপনার সমিধানে দৈবশ্রী ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজনিত গর্হিত কার্যে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অহুজ্ঞা করিতেছি যে, দুর্নীতিপরায়ণগণ দুর্যোধনের ইচ্ছানুসারে কার্য করুক।” *

* কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অনুবাদ প্রশংসিত, এ জন্ত সচরাচর আমি মূল্যের সহিত অনুবাদ না মিলাইয়াই অনুবাদ উদ্ধৃত করিরাছি। কিন্তু কৃষ্ণের এই উক্তিতে কিছু অসঙ্গতি ঐ অনুবাদে দেখা যায়, যথা, যে কার্যের জন্ত পাপভাগী হইতে হয় না এক হানে বলিয়াছেন, সেই কার্যকে কর হুজ্ঞ পরে পাপবুদ্ধিজনিত বলিতেছেন। একজন্ত মূল্যের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম। মূল্যে ভত অসঙ্গতি দেখা যায় না। মূল উদ্ধৃত করিতেছি—

রাজস্নেহে যদি কুন্ডা নাং নিগৃহীয়ায়াজনা।

এতে বা বায়হং বৈদানমুজানীহি পার্শ্বিৎ ।

এই কথার পর, দ্বুতরাষ্ট্র দুর্ধ্যোধনকে ডাকাইয়া আনাইলেন, এবং তাঁহাকে অতিশয় কষ্টক্লান্ত করিয়া ভৎসনা করিলেন। বলিলেন,

“তুমি অতি নৃশংস, পাশাখ্যা ও নীচাশয় ; এই নিমিত্তই অসাম্য, অযশস্কর, সাধুবিগর্হিত, পাশাচরণে সম্মুখ হইয়াছ। কুলপাণ্ডুল মৃত্যুর দ্বারা দুর্ভাগ্যদ্বিগেয় সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত দুর্দুর্ভ জনাঙ্গিনকে নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন বালক চন্দ্রমাকে গ্রহণ করিতে উৎসুক হয়, তুমিও সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবগণের দুর্ভাগ্য কেশবকে গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও উরগগণ দ্বাধার সংগ্রাম সহ করিতে সমর্থ হয় না ; তুমি কি, সেই কেশবের পরিচয় পাও নাই ? বৎস ! হস্তদ্বারা কখন বায়ু গ্রহণ করা যায় না ; পাণিতল দ্বারা কখন পানবক স্পর্শ করা যায় না ; মন্তক দ্বারা কখন যেদিনী ধারণ করা যায় না ; এবং বলদ্বারাও কখন কেশবকে গ্রহণ করা যায় না।”

তার পর বিদ্বরও দুর্ধ্যোধনকে ঐরূপ ভৎসনা করিলেন। বিদ্বরের বাক্যাবসানে, বাসুদেব উচ্চহাস্য করিলেন, পরে সাত্যকি ও কুতবর্মান হস্ত ধারণপূর্ব্বক কুরুসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এই পর্য্যন্ত মহাভারতে আখ্যাত ভগবদ্ব্যন বৃত্তান্ত, সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক ; কোন গোলযোগ নাই। অতিপ্রকৃত কিছুই নাই, ও অবিশ্বাসের কারণও কিছু নাই। কিন্তু অঙ্গুলিকণ্ডুয়ননিপীড়িত প্রক্ষিপ্তকারীর জাতি গোষ্ঠী, ইহা কদাচ সহ্য করিতে পারে না।

এতান হি সর্কান্ সংরক্ষারিগুপ্তবহুংসহে ।

ন চাহং নিলিতং কর্ণ কুর্বাং পাণং কথঞ্চন ।

পাণ্ডবার্হে হি দুঃখস্তঃ বার্বান্ হস্তস্তি তে হস্তাঃ ।

এতে চেদেবমিচ্ছন্তি কৃতকার্যো বৃধিষ্টিঃ ।

অনৈব হুহমেনাশ্চ যে চৈনাননু ভারত ।

নিগূহ্য রাজান্ পার্বেভ্যো দত্তাঃ কিং দুকৃতং ভবেৎ ।

ইদন্ত ন এবস্তৈরং নিলিতং কর্ণ ভারত ।

সদ্বিধো তে মহারাজ জোহজং পাণবুদ্ধিজন্ম ।

এব দুর্ধ্যোধনো রাজান্ ঘবেচ্ছতি তথাস্ত ভৎ ।

অহস্ত সর্কাত্তনয়াননুজ্ঞানামি তে নৃপ ।

“কিং দুকৃতং ভবেৎ” ইতি বাক্যের অর্থ টিক “পাণভাগী হইতে হয় না,” এমন নহে। কথার ভাব ইহাই বুঝা বাইতেছে যে, “দুর্ধ্যোধন আমাকে বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমি যদি তাহাকে এখন বাঁধিয়া লইয়া বাই, তাহা হইলে কি এমন সমস্ত কাজ হয়?” দুর্ধ্যোধনকে বন্ধ করা সম্ভব কাজ হয় না, কেন না অনেকের হিঁস্তের জন্ত এক জনকে পরিত্যাগ করা শ্রেয় বলিয়া কৃষ্ণ ঋষিই দ্বুতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, ইহাকে বন্ধ কর। তবে কৃষ্ণ এক্ষণে যদ্যং এ কাজ করিলে জ্যোৎস্নাভঃই তিনি ইহা করিতেছেন, ইহা বুঝাইবে। কেন না এক্ষণে তিনি নিজে তাহাকে বন্ধ করিবার অভিপ্রায় করেন নাই। জ্যোৎস্না বাহাতে প্রবলিত করে, তাহা পাণবুদ্ধিজনিত, হস্তরাং আদর্শ পুরুষের পক্ষে নিলিত ও পরিহায্য কর্ণ।

এমন একটা মহত্বাপারের ভিত্তর একটা অনৈসর্গিক অদ্ভুত কাণ্ড না প্রবর্তিত করাইলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব রক্ষা হয় কৈ? বোধ করি এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার কৃষ্ণের হস্ত ও নিজাক্তির মধ্যে একটা বিশ্বরূপপ্রকাশ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ভগবদগীতা-পর্বোধ্যায়ে (তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক) আর একবার বিশ্বরূপপ্রদর্শন বর্ণিত আছে। সেই বিশ্বরূপবর্ণনায় আর এই বর্ণনায় কি বিস্ময়কর প্রভেদ! গীতার একাদশের বিশ্বরূপবর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা; সাহিত্য-জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইলে তেমন আর কিছু পাওয়া ছলভ। আর ভগবদ্যান-পর্বোধ্যায়ে এই বিশ্বরূপ-বর্ণনা ষাঁহার রচিত, কাব্যরচনা তাঁহার পক্ষে বিভ্রম না। ভগবদগীতার একাদশে পড়ি যে, ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন, “তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূর্বে নিরীক্ষণ করে নাই।” কিন্তু তৎপূর্বেই এখানে দুর্যোধনাদি কৌরবসভাস্থ সকল লোকেই বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ করিল। ভগবান্ গীতার একাদশে, আরও বলিতেছেন, “তোমা ব্যতিরেকে মহুশ্যলোকে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ, লয় ও অতি কঠোর তপস্তা দ্বারা আমার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না।” কিন্তু কুকবির হাতে পড়িয়া, এখানে বিশ্বরূপ যার তার প্রত্যক্ষীভূত হইল। গীতায় আরও কথিত হইয়াছে, “অনন্ত-সাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই আমারে এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে, এবং আমারে দর্শন ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।” কিন্তু এখানে হৃকৃতকারী পাপাত্মা ভক্তিশূন্য শক্রগণও তাহা নিরীক্ষণ করিল।

নিম্প্রয়োজনে কোন কর্ম্ম মূর্খেও করে না, যিনি বিশ্বরূপী তাঁহার ত কথাই নাই। এখানে বিশ্বরূপ প্রকাশের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। দুর্যোধনাদি বলপ্রয়োগের পরামর্শ করিতেছিল, বলপ্রয়োগের কোন উত্তম করে নাই। পিতা ও পিতৃব্য কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দুর্যোধন নিরুত্তর হইয়াছিল। বলপ্রকাশের কোন উত্তম করিলেও, সে বল নিশ্চিত ব্যর্থ হইত, ইহা কৃষ্ণের অগোচর ছিল না। তিনি স্বয়ং এতাদৃশ বলশালী যে, বলের দ্বারা কেহ তাঁহার নিগ্রহ করিতে পারে না। ধৃতরাষ্ট্র ইহা বলিলেন, বিহুর বলিলেন, এবং কৃষ্ণ নিজেও বলিলেন। কৃষ্ণের নিজের বল আত্মরক্ষায় প্রচুর না হইলেও কোন শঙ্কা ছিল না, কেন না সাত্যকি কৃতবর্মা প্রকৃতি মহাবল পরাক্রান্ত দুঃশিষ্যশীয়েরা তাঁহার সাহায্য জন্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের সৈন্যও রাজদ্বারে যোজিত ছিল। দুর্যোধনের সৈন্য উপস্থিত থাকার কথা কিছু দেখা যায় না। অতএব বলদ্বারা নিগ্রহের চেষ্টা কলবতী হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভাবনার অভাবেও ভীত হন, কৃষ্ণ এরূপ

কাপুরুষ নহেন। যিনি বিশ্বরূপ, তাঁহার এরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই। অতএব বিশ্বরূপ প্রকাশের কোন কারণ ছিল না। এ অবস্থায় ক্রুদ্ধ বা দাস্তিক ব্যক্তি ভিন্ন শত্রুকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করে না। যিনি বিশ্বরূপ, তিনি ক্রোধশূন্য এবং দম্ভশূন্য।

অতএব, এখানে বিশ্বরূপের কথাটা কৃকবির প্রণীত অলৌক উপস্থাস বলিয়া ভ্যাগ করাই বিধেয়। আজি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি, মাহুবা শক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ কৰ্ম্ম করেন, ঐশী শক্তি দ্বারা নহে। এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই।

কুরুসভা হইতে কৃষ্ণ কুন্তীসম্ভাষণে গেলেন। সেখান হইতে তিনি উপগ্রব্য নগরে, যেখানে পাণ্ডবেরা অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া লইলেন।

যাঁহার। কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিবার জন্ত পরামর্শ করিতেছিল, কর্ণ তাহার মধ্যে। তবে কর্ণকে কৃষ্ণ স্বরথে আরোহণ করাইয়া চলিলেন কেন, তাহা পরপরিচ্ছেদে বলিব। সে কথায় কৃষ্ণচরিত্র পরিষ্কৃত হয়। সাম ও দণ্ডনীতিতে কৃষ্ণের নীতিজ্ঞতা দেখিয়াছি। এক্ষণে ভেদনীতিতে তাঁহার পারদর্শিতা দেখিব। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিব যে, কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ বটে, কেন না তাঁহার দয়া, জীবের হিতকামনা, এবং বুদ্ধি, সকলই লোকাভীত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণকর্ণসংবাদ

কৃষ্ণ সর্বভূতে দয়াময়। এই মহাযুদ্ধজনিত যে অসংখ্য প্রাণিক্রয় হইবে, তাহাতে আর কোন ক্ষত্রিয় ব্যাধিত নহে, কেবল কৃষ্ণই ব্যাধিত। যখন প্রথম বিরাট নগরে যুদ্ধের প্রস্তাব হয়, তখন, কৃষ্ণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। অর্জুন তাঁহাকে যুদ্ধে বরণ করিতে গেলে, কৃষ্ণ এ যুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন না ও যুদ্ধ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও যুদ্ধ বন্ধ হইল না। অতএব উপায়ান্তর না দেখিয়া ভরসাশূন্য হইয়াও, সন্ধি স্থাপনের জন্ত দ্বতরাষ্ট্র-সভায় গেলেন। তাহাতেও কিছু হইল না, প্রাণিহত্যা নিবারণ হয় না। তখন রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ জনসমূহের রক্ষার্থ উপায়ান্তর উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কর্ণ মহাবীরপুরুষ। তিনি অর্জুনের সমকক্ষ রথী। তাঁহার বাহুবলেই হৃষ্যোধন আপনাকে বলবান্ মনে করেন। তাঁহার বলের উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানতঃ তিনি পাণ্ডবদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। কর্ণের সাহায্য না পাইলে তিনি কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। কর্ণকে তাঁহার শত্রুপক্ষের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিলে অবশ্যই তিনি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন। যাহাতে তাহা ঘটে, তাহা করিবার জন্য কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া লইলেন। বিরলে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন আবশ্যক।

কৃষ্ণের এই অভিপ্রায় সিদ্ধির উপযোগী অস্ত্রের অজ্ঞাত সহজ উপায়ও ছিল।

কর্ণ অধিরথনামা সূতের পুত্র বলিয়া পরিচিত। বস্তুতঃ তিনি অধিরথের পুত্র নহেন—পালিতপুত্র মাত্র। তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার নিজ জন্মবৃত্তান্ত তিনি অবগত ছিলেন না। তিনি সূতপত্নী রাধার গর্ভজাত না হইয়া, কুন্তীর গর্ভজাত, সূর্যের ঔরসে তাঁহার জন্ম। তবে কুন্তীর কন্যাকালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কুন্তী, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের সহোদর ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এ কথা কুন্তী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। আর কৃষ্ণ জানিতেন; তাঁহার অলৌকিক বুদ্ধির নিকটে সকল কথাই সহজে প্রতিভাত হইত। কুন্তী তাঁহার পিতৃদ্বন্দ্বা; ভোজরাজগৃহে এ ঘটনা হয়, অতএব কৃষ্ণ মহুয়াবুদ্ধিতেই ইহা জানিতে পারা অসম্ভব নহে।

কৃষ্ণ এই কথা এক্ষণে রথারূঢ় কর্ণকে শুনাইলেন। বলিলেন,

“শাস্ত্রজ্ঞেরা কহেন, যিনি যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনিই সেই কন্যার সহোদর ও কানীনপুত্রের পিতা। হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননীর কন্যাকালাবস্থায় সমুৎপন্ন হইয়াছ, উন্নিমিত্ত তুমি ধর্ম্মতঃ পুত্র; অতএব চল, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও* তুমি রাজ্যোখর হইবে।” তিনি কর্ণকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি জ্যেষ্ঠ, এজন্য তিনিই রাজা হইবেন, অপর পক্ষ পাণ্ডব তাঁহার আজ্ঞামুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে।

কৃষ্ণের এই পরামর্শ, সর্ব্বজনের ধর্ম্মবুদ্ধিকর ও হিতকর। প্রথমতঃ কর্ণের পক্ষে হিতকর, কেন না তিনি রাজ্যোখর হইবেন, এবং তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মানুমত, কেন না ভ্রাতৃগণের প্রতি শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রভাব অবলম্বন করিবেন। ইহা

* “বিরুদ্ধেও” এই পদটি কালীপ্রদয় সিংহে। অমুবাণে আছে, কিন্তু ইহা এখানে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আমার কাছে দুই মহাভারত বাঁধা আছে, তাহাতে দেখিলাম, নিগ্রহার্ধনাপ্রাপ্ত আছে। বোধ হয় নিগ্রহার্ধনাপ্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে অর্থ সঙ্গত হয়।

হৃষ্যোধনাদির পক্ষেও পরম হিতকর, কেন না যুদ্ধ হইলে তাঁহারা কেবল রাজ্যভ্রষ্ট নহে, সম্বংশে নিপাতপ্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। যুদ্ধ না হইলে তাঁহাদের প্রাণও বজার থাকিবে, রাজ্যও বজার থাকিবে, কেবল পাণ্ডবের ভাগ কিরাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে পাণ্ডবদিগেরও হিত ও ধর্ম, কেন না যুদ্ধরূপ নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি বধ না করিয়াও, স্বরাজ্য কর্ণের সহিত ভোগ করিবেন। আর এ পরামর্শের পরম ধর্ম্যতা ও হিতকারিতা এই যে, ইহা দ্বারা অসংখ্য মহাশয়গণের প্রাণ রক্ষা হইতে পারিবে।

কর্ণও কৃষ্ণের কথার উপযোগিতা স্বীকার করিলেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে এ যুদ্ধে হৃষ্যোধনাদির রক্ষা নাই। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলে তাঁহাকে কোন কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। অধিরথ ও রাধা তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছে। তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি সূতবংশে বিবাহ করিয়াছেন, এবং সেই ভার্য্যা হইতে তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি জন্মিয়াছে। তাঁহাদিগকে কোন মতেই কর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আর তিনি ত্রয়োদশ বৎসর হৃষ্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছেন; হৃষ্যোধন তাঁহাকে ভরসা করেন; এখন হৃষ্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবপক্ষে গেলে লোকে তাঁহাকে কৃতঘ্ন, পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্যালোলুপ, বা তাহাদের ভয়ে ভীত কাপুরুষ বলিবে। এই জন্য কর্ণ কোন মতেই কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলেন না।

কৃষ্ণ বলিলেন, “যখন আমার কথা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই বন্ধুরার সংহারদশা সমুপস্থিত হইয়াছে।”

কর্ণ উপযুক্ত উত্তর দিয়া, কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিষমভাবে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণচরিত্র বুঝিবার জন্য কর্ণচরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন নাই; এজন্য আমি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর।

নবম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরে ফিরিয়া আসিলে, যুধিষ্ঠিরাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হস্তিনাপুরে কি করিয়াছিলে বল।

কৃষ্ণ, নিজে যাহা বলিয়াছিলেন, এবং অশ্বে যাহা বলিয়াছিল, তাই বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সকল বক্তৃতার পূর্ব-পূর্ব অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণনা দেখিয়াছি, এখানে তাহার সহিত মিল নাই। কিছুই সঙ্গে কিছু মিলে না। মিলিলে দীর্ঘ পুনরাবৃত্তি ঘটিত। তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কোন মহাপুরুষ কিছু নূতন রকম বসাইয়া দিয়াছেন বোধ হয়।

এইখানে ভগবদ্গান-পর্বাধ্যায় সমাপ্ত। তার পর সৈন্যনির্ধাণ-পর্বাধ্যায়। ইহাতে বিশেষ কথা কিছু নাই। কতকগুলো মৌলিক কথা আছে; কতকগুলো কথা অমৌলিক বলিয়া বোধ হয়; কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কথা বড় অল্প। কৃষ্ণের ও অর্জুনের পরামর্শালাপসারে, পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন, এবং বলরাম মদ খাইয়া আসিয়া, কৃষ্ণকে কিছু মিষ্ট ভৎসনা করিলেন, কেন না তিনি কুরুপাণ্ডবকে সমান জ্ঞান করেন না। কুরু-সভায় যাহা ঘটিয়াছিল, সে কথাও কিছু হইল। ইহা ভিন্ন আরও কিছু নাই।

তাহার পর উলূকদূতাগমন-পর্বাধ্যায়। এটি নিতান্ত অকিঞ্চিংকর। ইহাতে আর কিছুই নাই, কেবল উভয় পক্ষের গালিগালাজ। দুর্যোধন, শকুনি প্রভৃতির পরামর্শে উলূককে পাণ্ডবদিগের নিকট পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল পাণ্ডবদিগকে ও কৃষ্ণকে খুব গালিগালাজ করা। উলূক আসিয়া ছয় জনকেই খুব গালিগালাজ করিল। পাণ্ডবেরা উত্তরে খুবই গালিগালাজ করিলেন। কৃষ্ণ বড় কিছু বলিলেন না, তাহার দ্বারা রোষামর্ষশূন্য ব্যক্তি গালিগালাজ করে না, বরং একটা রাগারাগি বাড়াবাড়ি যাহাতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে পাণ্ডবেরা উত্তর করিবার আগেই তিনি উলূককে বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, “তুমি শীঘ্র গমন করিয়া দুর্যোধনকে কহিবে—পাণ্ডবেরা তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হইবে।” অথচ গালিগালাজটা কৃষ্ণাৰ্জুনের ভাগেই বেশী রকম হইয়াছিল।

কিন্তু উলূকের দুর্বুদ্ধি, উলূক ছাড়ে না। আবার গালিগালাজ আরম্ভ করিল। না হইবে কেন? ইনি দুর্যোধনের সহোদর। তখন পাণ্ডবেরা একে একে উলূকের উত্তর দিলেন। উলূককে সুদ সমেত আসল ফিরাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও একটা কথা বলিলেন, “আমি অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছি বলিয়া যুদ্ধ করিব না, ইহা মনে স্থির করিয়া ভীত হইতেছ না; কিন্তু যেমন হুতাশনে তৃণ সকল ভস্মসাৎ করে; তদ্রূপ আমিও চরম কালে ক্রোধভরে সমস্ত পার্থিবগণকে সংহার করিব সন্দেহ নাই।”

উলূকদূতাগমন-পর্বাধ্যায়ে মহাভারতের কার্যের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইহাতে রচনার নৈপুণ্য বা কবিত্ব নাই। এবং কোন কোন স্থান মহাভারতের অস্বাভাবিকতার

সহিত বিলম্বসমাপন। অতীতকালিকায়ো নতর এবং কালের মৌজোর কথা আছে, কিন্তু উৎকৃষ্টের কথা নাই। এই সকল কারণে ইহাকে আদিত্যদ্রাক্ষর্গত বিবেচনা করি না।

ইহার পর অধাতিরথসংখ্যান, একা তৎপরে অসোণাখ্যান-পর্বোধ্যায়। এ সকলে কৃত্যুভাঙা কিছুই নাই। এইখানে উল্লেখগণক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ খণ্ড

কুরুক্ষেত্র

যো নিষন্ধো ভবেদ্রাক্রৌ দিবা ভবতি বিজিতঃ ।

ইষ্টানিষ্টস্ত চ দ্রষ্টা তস্মৈ দ্রষ্টাঙ্গনে নমঃ ॥

শান্তিপর্ক, ৩৭ অধ্যায়ঃ ।

100

100

100

100

100

100

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভীষ্মের যুদ্ধ

এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। মহাভারতে চারিটি পর্বের ইহা বর্ণিত হইয়াছে। দুর্যোধনের সেনাপতিগণের নামক্রমে ক্রমান্বয়ে এই চারিটি পর্বের নাম হইয়াছে ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব ও শল্যপর্ব।

এই যুদ্ধপর্বগুলি মহাভারতের নিকৃষ্ট অংশ মধ্যে গণ্য করা উচিত। পুনরুজ্জী, অকারণ এবং অরুচিকর বর্ণনাবাহুল্য, অনৈসর্গিকতা, অত্যাক্তি এবং অসঙ্গতি দোষ এইগুলিতে বড় বেশী। ইহার অল্প ভাগই আদিমস্তরভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কোন্ অংশ মৌলিক, আর কোন্ অংশ অমৌলিক, স্থির করা বড় দুষ্কর। যেখানে সবই কাঁটাবন, সেখানে পুষ্পচয়ন বড় হুঃসাধ্য। তবে যেখানে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায়, সেই স্থান আমরা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ভীষ্মপর্বের প্রথম জম্বুখণ্ড-বিনির্মাণ-পর্বাদ্যায়। তাহার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ নাই—মহাভারতেরও বড় অল্প। কৃষ্ণচরিত্রের কোন কথাই নাই। তার পর ভগবদ্গীতা-পর্বাদ্যায়। ইহার প্রথম চব্বিশ অধ্যায়ের পর গীতারম্ভ। এই চব্বিশ অধ্যায় মধ্যে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কথা নাই। কৃষ্ণ যুদ্ধের পূর্বে দুর্গাস্তব করিতে অর্জুনকে পরামর্শ দিলে, অর্জুন যুদ্ধারম্ভ কালে দুর্গাস্তব পাঠ করিলেন। কোন গুরুতর কার্য আরম্ভ করিবার সময়ে আপন আপন বিশ্বাসানুযায়ী দেবতার আরাধনা করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য। তাহা হইলে ঈশ্বরের আরাধনা হইল। যাহা বলিয়া ডাকি না কেন, এক ভিন্ন ঈশ্বর নাই।

তার পর গীতা। ইহাই কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান অংশ। এই গীতান্তে অনুপম পবিত্র ধর্ম প্রচারই কৃষ্ণের আদর্শ মহুগ্ধের বা দেবত্বের এক প্রধান পরিচয়।

কিন্তু এখানে আমি গীতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। তাহার কারণ এই যে এই গীতান্তে ধর্ম একখানি পৃথক্ গ্রন্থে* কিছু কিছু বুঝাইয়াছি, পরে আর একখানি†

* ধর্মতত্ত্ব।

† ঐশ্বর্যবলীতার বাহালা টীকা।

লিখিতে নিযুক্ত আছি। গীতা সম্বন্ধে আমার মত এই দুই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এখানে পুনরুজ্জ্বল প্রয়োজন নাই।

ভগবদগীতা-পর্ক্যাধ্যায়ের পর ভীষ্মবধ-পর্ক্যাধ্যায়। এইখানেই যুদ্ধারম্ভ। যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি মাত্র। সারথিদিগের অদৃষ্ট রত্ন মন্ডল ছিল। মহাভারতে যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, তাহা কতকগুলি ঐশ্বর্য্যযুদ্ধ মাত্র। রথিগণ যুদ্ধ করিবার সময়ে পরস্পরের অস্ত্র ও নারথিকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাহার কারণ, অথ বা সারথি নষ্ট হইলে, আর রথ চলিবে না। রথ না চলিলে রথী বিপর্য্য হইতেন। সারথিরা যোদ্ধা নহে— বিনা দোষে বিনা যুদ্ধে নিহত হইত। কৃষ্ণকেও সে সুখের ভাগী হইতে হইয়াছিল। তিনি হত হইতেন নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবস মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বহু সংখ্যক বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইতেন। অস্ত্রাস্ত্র সারথিগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহারা বৈশ্র, জাতিতে ক্ষত্রিয় নহে। কৃষ্ণ, আত্মরক্ষায় অভিশয় সক্ষম, তথাচ কর্তব্যাহুরোধে বসিয়া মার খাইতেন।

মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়াছি। কিন্তু এক দিন তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু প্রয়োগ করেন নাই। সে ঘটনাটা এইরূপ ;—

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধে একরূপ নিপুণ যে, পাণ্ডবসেনার মধ্যে অর্জুন ভিন্ন আর কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু অর্জুন তাঁহার সঙ্গে ভাল করিয়া স্বশক্তি অনুসারে যুদ্ধ করেন না। তাহার কারণ এই যে, ভীষ্ম সম্বন্ধে অর্জুনের পিতামহ, এবং বাল্যকালে পিতৃহীন, পাণ্ডবগণকে ভীষ্মই পিতৃব্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ভীষ্ম এখন দুর্য্যোধনের অনুরোধে নিরপরাধী পাণ্ডবদিগের শত্রু হইয়া তাহাদের অনিষ্টার্থ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া, যদিও ভীষ্ম ধর্ম্মতঃ অর্জুনের বধ্য, তথাপি অর্জুন পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া কোন মতেই ভীষ্মের বধ সাধনে সম্মত নহে। এজন্য ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যুদ্ধযুদ্ধ করেন, পাছে ভীষ্ম নিপতিত হন, এজন্য সর্ব্বদা সঙ্কুচিত। তাহাতে ভীষ্ম, অপ্রতিহত বীর্য্যে বহুসংখ্যক পাণ্ডবসেনা বিনষ্ট করিতেন। ইহা দেখিয়া এক দিবস ভীষ্মকে বধ করিবার মানসে কৃষ্ণ স্বয়ং চক্রহস্তে অর্জুনের রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি পদব্রজে ধাবমান হইলেন।

দেখিয়া, কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম পরমাচ্ছাদিত হইয়া বলিলেন,

এহেহি দেবেশ জগন্নিবাস ! নমোহস্ত তে শার্ঙ্গগদাসিপাণে ।

প্রসহ মাং পাতয় লোকনাথ ! রথোক্তমাং ভূতশরণ্য সংযবে ॥

“এসো এসো যোষণ করিয়াবাসি ! হে শাক্ষগদাধক্ষধারিনু ! তোমাকে নমস্কার ! হে লোকনাথ ভূতশরণ্য ! যুদ্ধে আমাকে অবিলম্বে রথোত্তম হইতে পাতিত কর ।”

অর্জুনও কৃষ্ণের পশ্চাদভ্যুত্থান করিয়া, কৃষ্ণকে অঙ্কনয় করিয়া, স্বয়ং সাধ্যাঙ্গুসারে যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, কিরাইয়া আনিলেন ।

এই ঘটনা দুইবার বর্ণিত হইয়াছে, একবার তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে, আর একবার নবম দিবসের যুদ্ধে । শ্লোকগুলি একই, সুতরাং এক দিবসেরই ঘটনা লিপিকারেব্র অম প্রমাণ বা ইচ্ছাবশতঃ দুইবার লিখিত হইয়া থাকিবে । সংস্কৃত গ্রন্থে সচরাচর এরূপ ঘটনা থাকে ।

রচনা দেখিয়া বিচার করিলে, এই বিবরণকে মহাভারতের প্রথমস্তরভুক্ত বিবেচনা করা যাইতে পারে । কবিক প্রথম শ্রেণীর, ভাব ও ভাষা উদার এবং জটিলতাপূর্ণ । প্রথম স্তরের যতটুকু মৌলিকতা স্বীকার করা যাইতে পারে, এই ঘটনারও ততটুকু মৌলিকতা স্বীকার করা যাইতে পারে ।

এই ঘটনা লইয়া কৃষ্ণভক্তেরা, কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে একটা তর্ক তুলিয়া থাকেন । কাশীদাস ও কথকেরা এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । তাঁহারা বলেন যে, ভীষ্ম যুদ্ধারম্ভকালে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে—তুমি যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে এ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না, আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমাকে অস্ত্র ধারণ করাইব ।

অতএব এক্ষণে ভক্তবৎসল কৃষ্ণ, আপনাব প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত করিয়া, ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন ।

এ সুবুদ্ধিরচনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না ! ভীষ্মের অবস্থিতি প্রতিজ্ঞাও মূল মহাভারতে দেখা যায় না । কৃষ্ণেরও কোন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হয় নাই । তাঁহার প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম এই যে—যুদ্ধ করিব না । হৃষ্যোধন ও অর্জুন উভয়ে তাঁহাকে এককালে বরণাভিলাষী হইলে, তিনি উভয়ের সঙ্গে তুল্য ব্যবহার করিবেন—জ্ঞপ্ত বলিলেন, “আমার তুল্য বলশালী আমার নারায়ণী সেনা এক জন গ্রহণ কর ; আর এক জন আমাকে লও ।” “অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে স্তম্ভশস্ত্রোহহমেকতঃ” এই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা । সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছিল । কৃষ্ণ যুদ্ধ করেন নাই । ভীষ্ম সম্বন্ধীয় এই ঘটনাটির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে ; কেবল সাধ্যাঙ্গুসারে যুদ্ধে পরাভূত অর্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা । ইহা সারথিরা করিতেন । উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল ।

অভিমহা জাগ্রজ্জবেই বীরগণের অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমহা ক্রি শত্রু সংহার করিয়া পুণ্যজনিত সর্বকামপ্রাপ্ত অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ, তপস্বী ব্রহ্মচারী শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার হৃদয়ের সেইরূপ গতিলাভ হইয়াছে। হে ভূভদ্রে! তুমি বীরজননী, বীরশ্রী, বীরদক্ষিনী ও বীরবাঙ্কবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত তোমার শোকাতুল হওয়া উচিত নহে।”

এ সকলে মাতার শোক নিবারণ হয় না জানি। কিন্তু এ হৃদভাগ্য দেশে একরূপ কথাজ্ঞানী স্ত্রী ও শুনাই, ইহা ইচ্ছা করে।

এ দিকে পুত্রশোকাক্ত অর্জুন অতিশয় রোবপনবশ হইয়া এক নিদারুণ প্রতিজ্ঞায় আপনাকে আবদ্ধ করিলেন। তিনি যাহা কনিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে অভিমহ্যের বৃত্তার প্রধান কারণ জয়তথ। তিনি অতি কঠিন শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়তথকে বধ করিবেন ন না পারেন, আপনি অগ্নিপ্রবেশপূর্বক প্রাণত্যাগ করিবেন।

এই প্রতিজ্ঞায় উভয় শিবিরে বড় ছলছল পড়িয়া গেল। পাণ্ডবসৈন্য অতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল, এবং বাদিত্রবাদকগণ ভারি বাজানা বাজাইতে লাগিল। কৌরবেরা চমকিত হইয়া অহুসঙ্কান দ্বারা প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিয়া জয়তথরক্ষার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

কৃষ্ণ দেখিলেন, একটা বিবম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। অর্জুন বিবেচনা না করিয়া যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া সুসাধ্য নহে। জয়তথ নিজে মহারথী, সিদ্ধসৌবীর দেশের অধিপতি, বৃহৎসেনার নায়ক, এবং চূর্যোধনের ভগিনীপতি। কৌরব পক্ষীয় অপরাজেয় যোদ্ধৃগণ তাঁহাকে সাধ্যানুসারে রক্ষা করিবেন। এ দিকে পাণ্ডবপক্ষের প্রধান পুরুষেরা সকলেই অভিমহ্যশোকে বিহ্বল—মন্ত্রণায় বিমূঢ়। অতএব কৃষ্ণ নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কণ্ঠে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৌরবশিবিরে গুপ্তচর পাঠাইলেন। চর আসিয়া সেখানকার বৃত্তান্ত সব বলিল। কৌরবেরা প্রতিজ্ঞার কথা সব জানিয়াছে। দ্রোণাচার্য্য ব্যহরচনা করিবেন; তৎপশ্চাৎ কর্ণাদি সমস্ত কৌরব-পক্ষীয় বীরগণ একত্রিত হইয়া জয়তথকে রক্ষা করিবেন। এই চূর্ত্তে ব্যহভেদ করিয়া, সকল বীরগণকে একত্র পরাজিত করিয়া, মহাবীর জয়তথকে নিহত করা অর্জুনেরও অসাধ্য হইতে পারে। অসাধ্য হয়, তবে অর্জুনের আত্মহত্যা নিশ্চিত।

অতএব কৃষ্ণ আপনার অহুষ্ঠেয় চিন্তা করিয়া, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আপনার সারথি দারুণকে ডাকিয়া, কৃষ্ণের নিজের রথ, উত্তম অশ্বে যোজিত করিয়া, অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ

করিয়া প্রভাতে প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে যদি অর্জুন এক দিনে যুদ্ধপার হইয়া সকল বীরগণকে পরাজয় করিতে না পারেন, তবে তিনি নিজেই যুদ্ধ করিয়া কৌরবনেতৃগণকে বধ করিয়া জয়দ্রথবধের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন।

কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, অর্জুন স্বীয় বাহুবলেই কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যদি কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হইত, তাহা হইলে “অব্ধ্যমানঃ সংগ্রামে স্তম্ভশত্রোহহমেকতঃ” ইতি সত্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিত না। কারণ, যে যুদ্ধ সম্বন্ধে এ প্রতিজ্ঞা ঘটিয়াছিল, সে যুদ্ধ এ নহে। কুরুপাণ্ডবের রাজ্য লইয়া যে যুদ্ধ, এ সে যুদ্ধ নহে। আত্মিকার এ অর্জুনপ্রতিজ্ঞা-জনিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য ভিন্ন; এক দিকে জয়দ্রথের জীবন, অল্প দিকে অর্জুনের জীবন লইয়া যুদ্ধ। যুদ্ধে অর্জুনের পরাভব হইলে, তাঁহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করিতে হইবে। এ যুদ্ধ পূর্বে উপস্থিত হয় নাই—সুতরাং “অব্ধ্যমানঃ সংগ্রামে” ইতি প্রতিজ্ঞা ইহার পক্ষে বৰ্ত্তে না। অর্জুন কৃষ্ণের সখা, শিষ্য এবং ভগিনীপতি; তাঁহার আত্মহত্যানিবারণ কৃষ্ণের অমুঠেয় কর্ম।

ইহার পর কৃষ্ণ ও অপর সকলে নিজা গেলেন। এইখানে একটা আঘাটে রকম স্বপ্নের গল্প আছে। স্বপ্নে আবার কৃষ্ণ অর্জুনের কাছে আসিলেন, উভয়ে সেই রায়ে হিমালয় গেলেন, মহাদেবের উপাসনা করিলেন, পাণ্ডপত অস্ত্র পূর্বেই (বনবাস কালে) অর্জুন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আবার চাহিলেন, ও পাইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল সমালোচনার নিতান্ত অযোগ্য।

পরদিন সূর্যাস্তের প্রাকালে অর্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিলেন। তৎক্ষণ কৃষ্ণের কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি কথিত হইয়াছে কৃষ্ণ অপরাহ্নে যোগমায়ার দ্বারা সূর্যাকে আচ্ছন্ন করিলেন; জয়দ্রথ নিহত হইলে পরে সূর্যাকে পুনঃপ্রকাশিত করিলেন। কেন? সূর্যাস্ত হইয়াছে ভ্রমে, জয়দ্রথ অর্জুনের সম্মুখে আসিবেন এইরূপ ভ্রান্তির সৃষ্টির জন্য? এইরূপ ভ্রান্তিতে পড়িয়া জয়দ্রথ এবং তাঁহার রক্ষকগণ, উল্লাসিত এবং অনবহিত হইবেন, ইহাই কি অভিপ্রায়? এইখানে কাথের এক স্তরের উপর আর এক স্তর নিহিত হইয়াছে স্পষ্ট দেখা যায়। এক দিকে দেখা যায় যে এরূপ ভ্রান্তিজননের কোন প্রয়োজন ছিল না। যোগমায়াবিকাশের পূর্বেও অর্জুন জয়দ্রথকে দেখিতে পাইতেছিলেন, এবং তিনি জয়দ্রথকে প্রহার করিতেছিলেন, জয়দ্রথও তাঁহাকে প্রহার করিতেছিল। সূর্য্যাবরণের পরেও ঠিক তাহাই হইতে লাগিল। সূর্য্যাবরণের পূর্বেও অর্জুনকে যেরূপ করিতে হইতেছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ হইতে লাগিল। সমস্ত কৌরববীরগণকে পরাস্ত না

করিয়। অসহন ক্রমবশতঃ বিহত করিতে পারিলেন না। আর এক দিকে এই সকল উদ্ভিন্ন
 নিমেষী, সুখাবলম্বকারিণী বোলাধারার বিকাশ। এ আন্তঃস্থতির আরোহণ, পরপরিস্ফেদে
 বুঝাইতেছি।

তৃতীয় পারচ্ছেদ

দ্বিতীয় স্তরের কবি

আমরা এত দূর পর্য্যন্ত সোজা পথে, সুবিধামত চলিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু
 এখন হইতে ঘোরতর গোলযোগ। মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, কিন্তু এতক্ষণ আমরা, তাহার
 স্থির বারিরাশি মধ্যে মধুর মুহুগন্তীর শব্দ শুনিতে শুনিতে সুখে নৌযাত্রা করিতেছিলাম।
 এক্ষণে সহসা আমরা ঘোরবাত্যায় পড়িয়া, তরঙ্গাভিঘাতে পুনঃ পুনঃ উৎক্লিষ্ট নিক্লিষ্ট
 হইব। কেন না, এখন আমরা বিশেষ প্রকারে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে
 পড়িলাম। তাঁহার হস্তে কৃষ্ণচরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। যাহা উদার ছিল, তাহা
 এক্ষণে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে; যাহা সরল তাহা এক্ষণে কৌশলময়। যাহা
 সত্যময় ছিল, তাহা এক্ষণে অসত্য ও প্রবঞ্চনার আকর; যাহা শ্রায় ও ধর্ম্মের অমুমোদিত
 ছিল, তাহা এক্ষণে অশ্রায় ও অধর্ম্মে কল্পিত। দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে কৃষ্ণচরিত্র
 এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু কেন ইহা হইল? দ্বিতীয় স্তরের কবি নিতাস্ত ক্ষুদ্র কবি নহেন; তাঁহার
 সৃষ্টিকৌশল জাজ্বল্যমান। তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য নহেন। তবে তিনি কৃষ্ণের এরূপ
 দশা ঘটাইয়াছেন কেন? তাহার অতি নিগূঢ় তাৎপর্য্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি ও দেখিব যে, কৃষ্ণ প্রথম স্তরের কবির হাতে
 ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিস্ফুট নহেন। তিনি নিজের ত সে কথা মুখেও আনেন না; পুনঃ পুনঃ
 আপনার মানবী প্রকৃতিই প্রবাদিত ও পরিচিত করেন; এবং মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া
 কার্য্য করেন। কবিও প্রায় সেই ভাবেই তাঁহাকে স্থাপিত করিয়াছেন। প্রথম স্তরে
 এমন সন্দেহও হয় যে, যখন ইহা প্রণীত হইয়াছিল তখন হয়ত কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া
 সর্ব্বজনস্বীকৃত নহেন। তাঁহার নিজের মনেও সে ভাব সকল সময়ে বিরাজমান নহে।
 স্থূল কথা মহাভারতের প্রথম স্তর কতকগুলি প্রাচীন কিম্বদন্তীর সংগ্রহ মাত্র এবং
 কাব্যালঙ্কারে কবিকর্তৃক রঞ্জিত; এক আখ্যায়িকার সূত্রে যথার্থ সন্নিবেশপ্রাপ্ত। কিন্তু

কোন দ্বিতীয় স্তর মহাকারণকে প্রসিদ্ধি হইল, তখন যোগ হয় ত্রীকোণের ঈশ্বরকে সর্বত্র স্বীকৃত। অতএব দ্বিতীয় স্তরের কবি তাঁহাকে ঈশ্বরামতার স্বরূপই স্থিত ও নিখুঁত করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় কৃষ্ণ ও অনেকবার আপনার ঈশ্বরত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং ঐশী শক্তি দ্বারা কার্য্য নির্বাহ করেন। কিন্তু ঈশ্বর পুণ্যময়, কবি তাহাও জানেন। তবে, একটা তত্ত্ব পরিশুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে বড় ব্যস্ত দেখি। ইউরোপীয়েরাও সেই তত্ত্ব লইয়া বড় ব্যস্ত। তাঁহারা বলেন, ভগবান্ দয়াময়, করুণাক্রমেই জীবনষ্টি করিয়াছেন; জীবের মঙ্গলই তাঁহার কামনা। তবে পৃথিবীতে ছুঃখ কেন? তিনি পুণ্যময়, পুণ্যই তাঁহার অভিপ্রেত। তবে আবার পৃথিবীতে পাপ আসিল কোথা হইতে? খ্রিষ্টানের পক্ষে এ তত্ত্বের মীমাংসা বড় কষ্টকর, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে তাহা সহজ। হিন্দুর মতে ঈশ্বরই জগৎ। তিনি নিজে সুখদুঃখ, পাপপুণ্যের অতীত। আমরা যাহাকে সুখদুঃখ বলি, তাহা তাঁহার কাছে সুখদুঃখ নহে, আমরা যাহাকে পাপপুণ্য বলি, তাহা তাঁহার কাছে পাপপুণ্য নহে। তিনি লীলার ক্ষুদ্র এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—তাঁহারই অংশ। তিনি আপনার সত্তাকে অবিভায আবৃত করাতাই উহা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের আধার হইয়াছে। অতএব সুখদুঃখ পাপপুণ্য তাঁহারই মায়াজনিত। তাঁহা হইতেই সুখদুঃখ ও পাপপুণ্য। দুঃখ যে পাই, তাঁহার মায়া; পাপ যে করি, তাঁহার মায়া। বিষ্ণুপুণ্যে কবি কৃষ্ণপীড়িত কালিয় সর্পের মুখে এই কথা দিয়াছেন,—

যথাং ভবতা সৃষ্টো জাত্যা রূপেণ চেশ্বর।

স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথেষং চেষ্টিতং মম ॥

অর্থাৎ “তুমি, আমাকে সর্পজাতীয় করিয়াছ, তাই আমি হিংসা করি।” প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তব করিবার সময় বলিতেছেন,

বিজ্ঞাবিদ্ধে ভবান্ সত্যমসত্যং স্বং বিষমুদে।*

তুমি বিজ্ঞা, তুমিই অবিজ্ঞা, তুমি সত্য, তুমিই অসত্য, তুমি বিষ, তুমিই অমৃত। তিনি ভিন্ন জগতে কিছু নাই। স্বর্ষ্য, অধর্ষ্য, জ্ঞান, অজ্ঞান, সত্য, অসত্য, শ্রায়, অশ্রায়, বুদ্ধি, হ্রস্ববুদ্ধি সব তাঁহা হইতে।

তিনি গীতায় স্বয়ং বলিতেছেন,

যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাত্ত্বমাসাচ্চ যে।

মত্ত এবোতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বং তেষু তে ময়ি ॥ ৭।১২

“বাহ্য সাম্বিকভান, বা রাজস বা তামস, সকলই আমা হইতে জানিবে।” আমি তাহার বশ নহি, সে সকল আমার অধীন।” শাস্তিপূর্বে ভীষ্ম যোদ্ধা কৃষ্ণকে “সত্যায়নো নমঃ” “ধর্মায়নো নমঃ” বলিয়া স্তব করিতেছেন, সেইখানেই “কামায়নো নমঃ” “বোরায়ানো নমঃ” “ক্রোধায়নো নমঃ” “দৃগ্যায়নো নমঃ” ইত্যাদি শব্দে নমস্কার করিতেছেন; এবং উপসংহারে বলিতেছেন, “সর্বায়নো নমঃ।” প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র হইতে এরূপ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বহু শত পৃষ্ঠা পূরণ করা হইতে পারে।

যদি তাই, তবে মানুষকে একটা গুরুতর কথা বুঝাইতে পারি। হুঃখ জগদীশ্বর-প্রেরিত, তিনি ভিন্ন ইহার অশ্রু কারণ নাই। যে পাপিষ্ঠ এজন্ত নিন্দিত এবং দণ্ডনীয়, তাহার সম্বন্ধে লোককে বুঝাইতে পারি, ইহার পাপবুদ্ধি জগদীশ্বরপ্রবর্তিত, ইহার বিচারের তিনি কর্তা, তোমরা কে ?

এই তত্ত্বের অবতারণায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, ভিতরে ভিতরে প্রবৃত্ত। শ্রেষ্ঠ কবিগণ, কখনই আধুনিক লেখকদিগের মত ভূমিকা করিয়া, ভূমিকায় সকল কথা বলিয়া দিয়া, কাব্যের অবতারণা করেন না। যত্নপূর্বক তাঁহাদিগের মর্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে হয়। সেন্দ্বীপের এক একখানি নাটকের মর্মার্থ গ্রহণ করিবার জন্ত কত সহস্র কৃতবিজ্ঞ প্রতিভাশালী ব্যক্তি কত ভাবিলেন, কত লিখিলেন, আমরা তাহা বুঝিবার জন্ত কত মাথা ঘামাইলাম; কিন্তু আমাদের এই অপূর্ব মহাভারত গ্রন্থের একটা অধ্যায়ের প্রকৃত মর্ম-গ্রহণ করিবার জন্ত আমরা কখন এক দণ্ডের জন্ত কোন চেষ্টা করিলাম না। যেমন হরিসংকীর্্তন কালে এক দিকে বৈষ্ণবেরা, খোলে ঘা পড়িতেই কাঁদিয়া পড়িয়া মাটিতে গড়াগড়ি দেন, আর এক দিকে নব্য শিক্ষিতেরা “Nuisance!” বলিয়া চাঁৎকার করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন, তেমনি প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থের নাম মাত্রে এক দল মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দেন; মকল কাবল ভূমি শুনিয়া ভক্তিরসে দেশ আপ্ত করেন, আর এক দল সকলই মিথ্যা, উপধর্ম, অজ্ঞাব্য, পরিহার্য, উপহাস্যাম্পদ বিবেচনা করেন। বুঝিবার চেষ্টা কাহারও নাই। শকার্থবোধ হইলেই তাঁহারা যথেষ্ট বুঝিলেন মনে করেন। হুঃখের উপর হুঃখ এই, কেহ বুঝাইলেও বুঝিতে ইচ্ছা করেন না।

ঈশ্বরই সব—ঈশ্বর হইতেই সমস্ত। তাঁহা হইতে জ্ঞান, তাঁহা হইতে জ্ঞানের অভাব বা ভ্রান্তি, তাঁহা হইতে বুদ্ধি, তাঁহা হইতে দুর্বুদ্ধি। তাঁহা হইতে সত্য, আবার তাঁহা হইতে অসত্য। তাঁহা হইতে জ্ঞায়, এবং তাঁহা হইতেই অজ্ঞায়। মনুষ্যজীবনের প্রধান উপাদান এই জ্ঞান ও বুদ্ধি, সত্য ও জ্ঞায়, এবং তদভাবে ভ্রান্তি, দুর্বুদ্ধি, অসত্য বা অজ্ঞায়।

সবই ঈশ্বরপ্রেরিত। কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি, সত্য এবং আয় তাঁহা হইতে, ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই; হিন্দুর কাছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তবে ভ্রান্তি হ্রস্ববুদ্ধি প্রভৃতিও যে তাঁহা হইতে, তাহা মনুষ্যের হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন আছে। অন্ততঃ মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবি, এমন বিবেচনা করেন। আধুনিক জ্যোতির্বিদদেরা বলিয়া থাকেন, আমরা চন্দ্ৰের এক পিঠই চিরকাল দেখি, অপর পৃষ্ঠ কখন দেখিতে পাই না। এই কবি সেই অদৃষ্টপূর্ব জগৎরহস্যের অপর পৃষ্ঠ আমাদের কাছে দেখাইতে চাহেন। তিনি জয়ত্রথবধে দেখাইতেছেন, ভ্রান্তি ঈশ্বরপ্রেরিত, ঘটোৎকচবধে দেখাইবেন, হ্রস্ববুদ্ধিও তাঁহার প্রেরিত, জ্যোথবধে দেখাইবেন, অসত্যও ঈশ্বর হইতে, চুর্যোধনবধে দেখাইবেন, অজ্ঞায়ও তাঁহা হইতে। আরও একটা কথা বাকি আছে। জ্ঞানবল, বুদ্ধিবল, সত্যবল, আয়বল, বাহুবলের কাছে কেহ নহে। বিশেষতঃ রাজনীতিতে বাহুবলের প্রাধান্য। মহাভারত বিশিষ্ট প্রকারে রাজনৈতিক কাব্য অর্থাৎ ঐতিহাসিক কাব্য; ইতিহাসের উপর নির্মিত কাব্য। অতএব এ কাব্যে বাহুবলের স্থান, জ্ঞান বুদ্ধাদির উপরে। দ্বিতীয় স্তরের কবি দেখিতে পান যে, কেবল জ্ঞান ভ্রান্তি, বুদ্ধি হ্রস্ববুদ্ধি, সত্যাসত্য, এবং আয়াসায় ঐশিক নিয়োগাধীন, ইহা বলিলেই রাজনৈতিক তত্ত্বটা সম্পূর্ণ হইল না, বাহুবল ও বাহুবলের অভাবও তাই। তিনি ইহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্ত মোসলপর্ব প্রণীত করিয়াছেন। তথায় কৃষ্ণের অভাবে স্বয়ং অর্জুন লগুড়ধারী কৃষকগণের নিকট পরাভূত হইলেন।

আমি যাহাকে ঐশিক নিয়োগ বলিতেছি, অথবা দ্বিতীয় স্তরের কবি যাহা ঈশ্বর-প্রেরণা বলিয়া বুঝেন, ইউরোপীয়েরা তাহার স্থানে “Law” সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই মহাভারতীয় কবিগণের বুদ্ধিতে “Law” কোন স্থান পাইয়াছিল কি না, আমি বলিতে পারি না। তবে ইহা বলিতে পারি যাহা “লর” উপরে, যাহা হইতে “Law,” তাহা তাঁহার ভালরূপে বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার বুঝিয়াছিলেন, সকলই ঈশ্বরেচ্ছা। কৃষ্ণকে কর্মক্ষেত্রে অবতরিত করিয়া, এই কবি সেই ঈশ্বরেচ্ছা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঘটোৎকচবধ

জয়দ্রথবধে আর একটা কৃষ্ণ সহজে অনৈসর্গিক কথা আছে। অর্জুন জয়দ্রথের শিরশ্ছেদে উত্তত হইলে, কৃষ্ণ বলিলেন, একটা উপদেশ দিই শুন। ইহার পিতা পুত্রের জন্ত তপস্শ্রা করিয়া এই বর পাইয়াছে যে, যে জয়দ্রথের মাথা মাটিতে ফেলিবে, তাহারও মস্তক বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইবে। অতএব তুমি উহার মাথা মাটিতে ফেলিও না। উহার মস্তক বাণে বাণে সঞ্চালিত করিয়া, যেখানে উহার পিতা সন্ধাবন্দনাদি করিতেছে, সেইখানে লইয়া গিয়া তাহার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত কর। অর্জুন তাহাই করিলেন। বৃড়া সন্ধ্যা করিয়া উঠিবার সময় ছিন্নমস্তক তাঁহার কোল হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। অমনি বৃড়ার মাথা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইল।

অনৈসর্গিক বলিয়া কথাটা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি। তৎপরে ঘটোৎকচবধ-ঘটিত বীভৎস কাণ্ড বর্ণিত করিতে আমি বাধ্য।

হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ছিল, হিড়িম্বা নামে রাক্ষসী তাহার ভগিনী। ভীম কদাচিৎ রাক্ষসটাকে মারিয়া রাক্ষসীটাকে বিবাহ করিলেন। বরকন্যা যে পরস্পরের অনুরূপযোগী, এমন কথা বলা যায় না। তার পর সেই রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের এক পুত্র জন্মিল। তাহার নাম ঘটোৎকচ। সেটাও রাক্ষস। সে বড় বলবান। এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পিতৃপিতৃব্যের সাহায্যার্থ দল বল লইয়া আসিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। আমি তাহার কিছু বুদ্ধিবিপর্যয় দেখিতে পাই—সে প্রতियোদ্ধগণকে ভোজন না করিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে বাণাদির দ্বারা মাছুষযুদ্ধ করিতেছিল। তাহার ছুর্ভাগ্যবশতঃ দুর্যোধনের সেনার মধ্যে একটা রাক্ষসও ছিল। ছুইটা রাক্ষসে খুব যুদ্ধ কবে।

এখন, এই দিন, একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। অশ্রু দিন কেবল দিনেই যুদ্ধ হয়, আজ রাত্রেও আলো জ্বালিয়া যুদ্ধ। রাত্রে নিশাচরের বল বাড়ে; অতএব ঘটোৎকচ ছনিবার্য্য হইল। কৌরববীর কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। কৌরবদিগের রাক্ষসটাও মারা গেল। কেবল কর্ণই একাকী ঘটোৎকচের সমকক্ষ হইয়া, রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষ কর্ণও আর সামলাইতে পারেন না। তাঁহার নিকট ইস্রদত্তা একপুরুষঘাতিনী এক শক্তি ছিল। এই শক্তি সহজে অদ্ভুতের অপেক্ষাও অদ্ভুত এক গল্প আছে—পাঠককে তৎপঠনে পীড়িত করিতে আমি অনিচ্ছুক। ইহা বলিলেই

যেহেঁ হইবে যে, এই শক্তি কেহ কোন মতেই ব্যর্থ করিতে পারে না, এক জনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে সে মরিতে, কিন্তু শক্তি আর কিরিতে না; তাই একপুরুষযাত্রী। কর এই অমোঘ শক্তি অর্জুনবধার্থ তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আল ঘটোংকচের যুদ্ধে বিপর হইয়া তাহারই প্রতি শক্তি প্রযুক্ত করিলেন। ঘটোংকচ মরিল। যুদ্ধকালে বিদ্যাচলের একপাদপরিমিত শরীর ধারণ করিল, এবং তাহার চাপে এক অকোহিনী সেনা মরিল ॥

এ সকল অপরাধে প্রাচীন হিন্দু কবিকে মার্জনা করা যায়, কেন না বালক ও অনিশ্চিত জীলোকের পক্ষে এ রকম গল্প বড় মনোহর। কিন্তু তিনি তার পর বাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কেবল তাঁহার নিজেরই মনোহর। তিনি বলেন, ঘটোংকচ মরিলে পাণ্ডবেরা শোককাতর হইয়া কাদিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ রথের উপর নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আর গোপবালক নহেন, পৌত্র হইয়াছে; এবং হঠাৎ বায়ুরোগাক্রান্ত হওয়ার কথাও প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু তবু রথের উপর নাচ। কেবল নাচ নহে, সিংহনাদ ও বাজুর আক্ষেপন। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? এত নাচ-কাচ কেন? কৃষ্ণ বলিলেন, “কর্ণের নিকট যে অমোঘ শক্তি ছিল, যা তোমার বধের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ঘটোংকচের জন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার আর ভয় নাই; তুমি এক্ষণে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে।” জয়দ্রথবধ উপলক্ষে দেখিয়াছি, কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইয়াছে, এবং কর্ণ পরাভূত হইয়াছেন। তখন সেই ঐশ্রী শক্তির কোন কথাই কাহারও মনে হয় নাই; কবিরও নহে। কিন্তু তখন মনে করিলে জয়দ্রথবধ হয় না; কর্ণ জয়দ্রথের রক্ষক। সুতরাং তখন চুপে চাপে গেল। যাক—এই শক্তিঘটিত বৃত্তান্তটা অনৈসর্গিক, সুতরাং তাহা আমাদের আলোচনার অযোগ্য। যে কথাটা বলিবার জন্য, ঘটোংকচবধের কথা তুলিলাম, তাহা এই। কৃষ্ণ, অর্জুনের প্রেমের উত্তর দিয়া বলিতেছেন,

“বাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমি তোমার হিতার্থ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন পূর্বক ক্রমে ক্রমে মহাবল-পরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিবাদ একলব্য, হিড়িম্ব, কিশ্বীর, বক, অলায়ুধ, উগ্রকর্থা, ঘটোংকচ প্রভৃতি রাক্ষসের বধ সাধন করিয়াছি।”

কথাটা সত্য নহে। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অর্জুনের হিতার্থ নহে, শিশুপাল তাঁহাকে সভা মধ্যে অপমানিত ও যুদ্ধে আহূত করিয়াছিল, এই জন্য, বা যজ্ঞের রক্ষার্থ। জরাসন্ধবধেরও কৃষ্ণ কর্তা না হউন, প্রবর্তক, কিন্তু সে অর্জুনের হিতার্থ নহে, কারারুদ্ধ রাজগণের মুক্তিজন্য। কিন্তু বক হিড়িম্ব কিশ্বীর প্রভৃতি রাক্ষসদিগের

বধের, এবং একলব্যের অদ্বুতক্ষেত্রের সঙ্গে কৃষ্ণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না। তিনি তাঁহার কিছুই জানিতেন না, এবং ঘটনাকালে উপস্থিতও ছিলেন না। মহাভারতে এক স্থানে পাই য়ে কৃষ্ণ একলব্যকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ অদ্বুতক্ষেত্রের কথা তাঁহার বিরোধী ঘটনাক্রমে, অর্থাৎ একলব্যের অদ্বুতক্ষেত্র এবং রাক্ষসগণের বধ, প্রকৃত ঘটনাও নহে।

তবে, এ মিথ্যা বাক্য কৃষ্ণমুখে সাজাইবার উদ্দেশ্য কি ?

এ সম্বন্ধে কেবল আর একটা কথা বলিব। ভক্তে বলিতে পারিবেন, কৃষ্ণ ইচ্ছার দ্বারা সকলই করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই হিড়িম্বাদি বধ, এবং ঘটোৎকচের প্রভি কর্ণের শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল। এ কথা সঙ্গত নহে। কৃষ্ণই বলিতেছেন যে, তিনি বিবিধ “উপায় উদ্ধাবন” করিয়া ইহা করিয়াছেন। আর যদি ইচ্ছাময় সর্বকর্তা ইচ্ছাদ্বারা এ সকল কার্য সাধন করিবেন, তবে মনুষ্যশরীর লইয়া অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি ছিল ? আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি যে কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কোন কর্ম করেন না; পুরুষকার অবলম্বন করেন। তিনি নিজেও তাহা বলিয়াছেন; সে কথা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। দেখা গিয়াছে যে তিনি ইচ্ছা করিয়াও যত্ন করিয়া সন্ধিসংস্থাপন করিতে পারেন নাই, বা কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে আনিতে পারেন নাই। আর যদি ইচ্ছার দ্বারা কর্ম সম্পন্ন করিবেন, তবে ছাই ভস্ম জড়পদার্থ একটা শক্তি-অস্ত্রের জন্ত ইচ্ছাময়ের এত ভাবনা কেন ?

ইহার ভিতরে আসল কথাটা, যাহা পূর্বপরিচ্ছেদে বলিয়াছি। বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, হর্ব্বুজিও ঈশ্বরপ্রেরিত, কবি এই কথা বলিতে চাহেন। কর্ণ অর্জুনের জন্ত ঐশ্রী শক্তি তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন যে ঘটোৎকচের উপর তাহা পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কর্ণের হর্ব্বুজি। কৃষ্ণ বলিতেছেন, সে আমি করাইয়াছি; অর্থাৎ হর্ব্বুজি ঈশ্বরপ্রেরিত। শিশুপাল হর্ব্বুজিক্রমে সভাতলে কৃষ্ণের অসহ্য অপমান করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ, সৈন্য-সাহায্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অজ্ঞেয়; পাণ্ডবের কথা দূরে থাক, কৃষ্ণসনাথ যাদবেরাও তাঁহাকে জয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু শারীরিক বলে ভীম তাঁহার অপেক্ষা বলবান্; একাকী ভীমের সঙ্গে মল্লের মত বাহ্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া, তাদৃশ রাজরাজেশ্বর সম্রাটের পক্ষে হর্ব্বুজি। কৃষ্ণোক্তির মর্ম্ম এই যে, সে হর্ব্বুজিও আমার প্রেরিত। দ্রোণাচার্য্য অনাৰ্য্য একলব্যের নিকট গুরুদক্ষিণারূপে তাহার দক্ষিণ হস্তের অদ্বুত চাহিয়াছিলেন। ঐ অদ্বুত গেলে বহুকষ্টলব্ধ একলব্যের ধনুবিহীন নিফল হয়। কিন্তু একলব্য সে প্রার্থিত গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন। ইহা একলব্যের দারুণ হর্ব্বুজি। কৃষ্ণের কথার মর্ম্ম এই যে, সে হর্ব্বুজি তাঁহার প্রেরিত—ঈশ্বরপ্রেরিত। রাক্ষসবধ সম্বন্ধেও ঐরূপ। এ সমস্তই দ্বিতীয় স্তর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দ্রোণবধ

প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবল কত্রিরেয়াই যুদ্ধ করিতেন, এমন নহে। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য যোদ্ধার কথা মহাভারতেই আছে। দ্রুপ্যোধনের সেনানায়কদিগের মধ্যে তিন জন প্রধান বীর ব্রাহ্মণ;—দ্রোণ, তাঁহার শ্যালক কৃপ, এবং তাঁহার পুত্র অশ্বথামা। অন্ত্যস্ত বিজ্ঞান জ্ঞান, ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধবিজ্ঞানও আচার্য্য ছিলেন। দ্রোণ ও কৃপ, এইরূপ যুদ্ধাচার্য্য। এই জ্ঞাত ইহাদিগকে দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য বলিত।

এদিকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদও বেশী। কেন না রণেও ব্রাহ্মণকে বধ করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাতক ঘটে। অন্ততঃ মহাভারতকার এই কারণ ব্রাহ্মণ যোদ্ধাগণকে লইয়া বড় বিপদ, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। এই জ্ঞাত কৃপ ও অশ্বথামা যুদ্ধে মরিল না। কৌরব-পক্ষীয় সকলেই মরিল, কেবল তাঁহারা দুই জনে মরিলেন না; তাঁহারা অমর বলিয়া গ্রন্থকার নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু দ্রোণাচার্য্যকে না মারিলে চলে না; ভীষ্মের পর তিনি সর্বপ্রধান যোদ্ধা; তিনি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবেরা বিজয়লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু এ কথাও গ্রন্থকার বলিতে অনিচ্ছুক যে, ধার্মিক রাজগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে মারিয়া ব্রহ্মহত্যার ভাগী হইল। বিশেষতঃ, দ্রোণাচার্য্যকে দ্বৈরথ্যযুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে, পাণ্ডবপক্ষে এমন বীর অর্জুন ভিন্ন আর কেহই নাই; কিন্তু দ্রোণাচার্য্য অর্জুনের গুরু, এজন্য অর্জুনের পক্ষে বিশেষরূপে অবধ্য। তাই গ্রন্থকার একটা কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পাণ্ডবভার্য্যা দ্রোণদৌর পিতা দ্রুপদ রাজার সঙ্গে পূর্বকালে বড় বিবাদ হইয়াছিল। দ্রুপদ, দ্রোণের বিক্রমের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই—অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি দ্রোণবধার্থ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞকুণ্ড হইতে দ্রোণবধকারী পুত্র উদ্ধৃত হয়—নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধৃষ্টদ্যুম্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সেনাপতি। তিনি দ্রোণবধ করিষেন, পাণ্ডবদিগের এই ভরসা। যিনি ব্রহ্মবধার্থ দৈবকর্ম্মজাত, ব্রহ্মবধ তাঁহার পক্ষে পাপ নয়।

কিন্তু মহাভারত এক হাতের নয়, নানা রচয়িতা নানা দিকে ঘটনাবলী যথেষ্ট লইয়া গিয়াছেন। পনের দিবস যুদ্ধ হইল, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের কিছু করিতে পারিলেন না।

তঁাহার নিকট পরাকৃত হইলেন। অতএব জ্ঞোণ সরার ভরসা নাই—প্রত্যাহ পাণ্ডবদিগের সৈন্যস্বরূপ হইতে লাগিল। তখন জ্ঞোণবধার্থ একটা ঘোরতর পাপাচারের পরামর্শ পাণ্ডব পক্ষে ছিন্ন হইল। এই মহাপাপমন্ত্রণার কলঙ্কটা কৃষ্ণের স্বকে অপিত হইয়াছে। তিনিই ইহার প্রবর্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,

“হে পাণ্ডবগণ, অস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইঙ্গ জ্ঞোণাচার্য্যকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু উনি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মহাশত্রুও তঁাহার বিনাশ করিতে পারে, অতএব তোমরা ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক উহারে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর।”

আর পাতা দশ বার পূর্বের বাঁহার মুখে কবি এই বাক্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন,

“আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম, ত্রি, লজ্জা, ক্ষমা, ধৈর্য্য অবস্থান করে, আমি সেইখানেই অবস্থান করি।” *

যিনি ভগবদগীতা-পর্কধাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ধর্মসংরক্ষণের জন্তই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই; বাঁহার চরিত্র, এ পর্য্যন্ত আদর্শ ধার্মিকের চরিত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে, বাঁহার ধর্মে দাঢ়্য শত্রুগণ কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, † তিনি কিনা ডাকিয়া বলিতেছেন, “তোমরা ধর্ম পরিত্যাগ কর।” তাই, বলিতেছিলাম, মহাভারত নানা হাতের রচনা; বাঁহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি সেইরূপ গড়িয়াছেন।

কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,

“আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে অশ্বখামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে জ্ঞোণ আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি উহার নিকট গমন পূর্বক বলুন, যে অশ্বখামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন।”

অর্জুন মিথ্যা বলিতে অস্বীকৃত হইলেন, যুধিষ্ঠির কষ্টে তাহাতে সন্মত হইলেন। ভীম বিনাবাক্যব্যয়ে অশ্বখামা নামক একটা হস্তিকে মারিয়া আসিয়া জ্ঞোণাচার্য্যকে বলিলেন, “অশ্বখামা মরিয়াছেন।” ‡ জ্ঞোণ জানিতেন, তঁাহার পুত্র “অমিতবলবিক্রমশালী, এবং শত্রুর অসহ”—অতএব ভীমের কথা বিশ্বাস করিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত করিবার চেষ্টায় মনোবোগী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনশ্চ আবার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অশ্বখামার মৃত্যুর কথা সত্য কি না? যুধিষ্ঠির কখনও অধর্ম করেন না, এবং

* ঘটোৎকচবধ-পর্কধাধ্যায়, ১৮২ অধ্যায়।

† ধৃতরাষ্ট্রবাক্য দেখ।

‡ খোপালগাড এইরূপ “কৃক পাইয়াছিল।”

অসত্য বলেন না, একজন তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, অশ্বখামা কুঞ্জর মরিয়াছে—কিন্তু কুঞ্জর শব্দটা অব্যাক্ত রহিল।*

তাহাতেই বা কি হইল? জোণ প্রথমে বিমনারমান হইলেন বটে, কিন্তু তৎপরে অতি ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুরূপ ঘুট্টছায়া তাঁহার আপনার সাধের অতীত যুদ্ধ করিয়া, নিরস্ত্র ও বিরথ হইয়া জোণহস্তে মরণাপন্ন হইলেন। তখন ভীম গিয়া ঘুট্টছায়ায় রক্ষা করিলেন, এবং জোণাচার্য্যের রথ ধারণ করিয়া কতকগুলি কথা বলিলেন, তাহাই জোণকে যুদ্ধে পরাভূত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ভীম বলিলেন,

“হে ব্রহ্মন! যদি স্বধর্ম্মে অসমুদ্র শিকিতান্ত্র অধম ব্রাহ্মণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতেরা প্রাণিগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করেন। সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য; আপনিই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; কিন্তু চণ্ডালের দ্বারা অজ্ঞান্য হইয়া পুত্র ও কলত্রের উপকারার্থ অর্থলালসা নিবন্ধন বিবিধ রোদ্ধজাতি ও অন্ত্য প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকারার্থ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না?”

কথাগুলি সকলই সত্য। ইহার পর আর তিরস্কার কি আছে? ইহাতেও ছুর্য্যোধনের দ্বারা হুরাছার মত ফিরিতে না পারে বটে, কিন্তু জোণাচার্য্য ধর্ম্মাশ্রয়; ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার পর অশ্বখামার মৃত্যুর কথাটা আর না তুলিলেও চলিত। কিন্তু তাহাও এখানে আবার পুনরুক্ত হইয়াছে।

এ কথার পর জোণাচার্য্য অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিলেন। তখন ঘুট্টছায়া তাঁহার মাথা কাটিয়া আনিলেন।

এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। যে কার্য্যটা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যদি স্বার্থ ঘটয়া থাকে, তবে যিনি যিনি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন তিনি তিনি মহাপাপে লিপ্ত। গ্রন্থকারও তাহা বুঝেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মাশ্রয় বুদ্ধিষ্টির রথ ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর উপর চারি অঙ্গুলি উর্দ্ধে চলিত, এখন ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিল। এই অপরাধে তাঁহার নরক দর্শন হইয়াছিল, ইহাও বলিয়াছেন। আমাদের মতে, এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা এবং

* “অশ্বখামা হত ইতি শব্দঃ”—এ কথাটা মহাভারতের নহে। বোধ হয় কথকেরা তৈয়ার করিয়া থাকিবেন। মূল মহাভারতে ইহা নাই। মহাভারতে আছে,

তবন্তপ্তভরে মগ্নো জয়ে সন্তো বুদ্ধিষ্টিঃ।

অব্যক্তমব্রবীষাক্য হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত। ১১১।

মিথ্যা প্রবন্ধনার দ্বারা গুরুহত্যার উপযুক্ত দণ্ড, নরকদর্শন মাত্র নহে;—অনন্তনরকই ইহার উপযুক্ত।

কৃষ্ণ এই মহাপাপের প্রবর্তক, এজন্ত কৃষ্ণকে সেইরূপ অপরাধী ধরিতে হয়। কিন্তু ইহার উত্তর এই প্রচলিত আছে যে, যিনি ঈশ্বর, স্বয়ং পাপ পুণ্যের কর্তা ও বিধাতা, পাপ-পুণ্যই বাহার সৃষ্টি, তাহার আবার পাপপুণ্য কি? পাপপুণ্য তাঁহাকে স্পর্শিতে পারে না। এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি, মনুষ্যদেহ ধারণকালে পাপ তাঁহার আচরণীয়? তিনি নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ধর্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ—পাপাচরণের দ্বারা কি ধর্মসংস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য? তিনি স্বয়ং ত একরূপ বলেন না। তিনি গীতায় বলিয়াছেন,

“জনকাদি কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। জনগণকে স্বধর্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্ত (দৃষ্টান্তের দ্বারা) তুমি কর্মকর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ করিয়া থাকে, ইতর লোকেও তাই করে; শ্রেষ্ঠ বাহা মানেন, লোকে তাহারই অনুবর্তিত হয়। হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কর্তব্য কিছুই নাই; আমার প্রাপ্তব্য বা অপ্ৰাপ্তব্য কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্ম করি। (কেন না) আমি যদি কদাচিত্ অন্তর্মিত হইয়া কর্মানুবর্তন না করি, তবে মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথে অনুবর্তী হইবে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৩ অঃ, ২০-২৩।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, মানবাবতারে, স্বকাৰ্য্যের দৃষ্টান্তের দ্বারা ধর্ম-সংস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্যের মধ্যে। অতএব স্বকর্মে মহাপাপের দৃষ্টান্ত তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না।

তবে, এ কাণ্ডটা কি? তাহার মীমাংসা স্থির না করিয়া আমি কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই নাই। কেন না, বৃন্দাবনের গোপী ও “অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” ইহাই কৃষ্ণের প্রধান অপবাদ।

কাণ্ডটা কি? তাহার উত্তর, কাণ্ডটা সমস্তই অমৌলিক। যদি পাঠক মনোযোগ-পূর্বক আমার এই গ্রন্থখানি পড়িয়া থাকেন, তবে বুঝিয়া থাকিবেন যে, সমস্ত মহাভারত, অর্থাৎ এক্ষণে যে গ্রন্থ মহাভারত নামে প্রচলিত, তাহা এক হাতের নহে। তাহার কিয়দংশ মৌলিক, আদিম মহাভারত, বা “প্রথম স্তর।” অপরাংশ অমৌলিক ও পরবর্তী কবিগণকর্তৃক মূলগ্রন্থে প্রসিক্ত। কোন্ অংশ মৌলিক, আর কোন্ অংশ অমৌলিক, ইহা নিরূপণ করা কঠিন। নিরূপণ জন্ত আমি কয়েকটি সঙ্কেত পাঠককে বলিয়া দিয়াছি। সেইগুলি এখন পাঠককে স্মরণ করিতে হইবে।

(১) তাহার মধ্যে, একটি এই,—

“শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্বসত্ত্ব হয়। যদি কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে।”

উদাহরণ দিবার জন্ত বলিয়াছিলাম যে, যদি কোথাও ভীষ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীষ্মের ভীষণতা দেখি, তবে জানিব ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত। এখানে ঠিক তাই; এক মাত্রায় নহে, তিন মাত্রায় কেবল তাই। পরম ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে এই নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা প্রবন্ধনের দ্বারা গুরুনিপাত যাদৃশ অসঙ্গত, তত অসঙ্গত আর কোন দুই বস্তুই হইতে পারে না। তার পর মহাতেজস্বী, বলগর্বশালী, ভয়শূন্য ভীষ্মের চরিত্রের সঙ্গেও ইহা তজ্রপ অসঙ্গত। ভীষ্ম বাহুবল ভিন্ন আর কিছু মানেন না—শত্রুর বিরুদ্ধে আর কিছু প্রয়োগ করেন না; রাজ্যার্থেও নহে, প্রাণরক্ষার্থেও নহে। স্থানান্তরে কথিত আছে, অশ্বখামা নারায়ণাজ্ঞ নামে অনিবার্য্য দৈবাজ্ঞ প্রয়োগ করিয়াছিলেন—তাহাতে সমস্ত পৃথিবী নষ্ট হইতে পারে। দিব্যজ্ঞবিৎ অর্জুনও তাহার নিবারণে অক্ষম; সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটি উপায় ছিল—এই দৈবাজ্ঞ সমরবিমুখ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। অতএব প্রাণরক্ষার্থ কৃষ্ণের আজ্ঞামুসারে সমস্ত পাণ্ডব সেনা ও সেনাপতিগণ, রথ ও বাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমুখ হইয়া বসিলেন; কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জুনকেও তাহা করিতে হইল। কেবল, ভীষ্ম কিছুতেই তাহা করিলেন না,—বলিলেন, “আমি শরনিকর নিপাতে অশ্বখামার অস্ত্র নিবারণ করিতেছি। আমি এই সুবর্ণময়ী গুর্ঝা গদা সমুত্তত করিয়া জ্যোৎস্নার নারায়ণাজ্ঞ বিমর্দিত করত অস্ত্রকের স্থায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যেমন কোন জ্যোতিঃ পদার্থই সূর্য্যের সদৃশ নহে, তজ্রপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে ঐরাবতশৃঙ্গসদৃশ সুদৃঢ় ভূজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহা হিমালয় পর্ব্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি শ্রুতনাগতুল্য বলশালী; দেবলোকে পুন্ডর যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোকে আমিও তজ্রপ। আজি আমি জ্যোৎস্নার অস্ত্রনিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বাহুবীৰ্য্য অবলোকন করুন। যদি কেহ এই নারায়ণাজ্ঞের প্রতিদ্বন্দ্বী বিচরমান না থাকে তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডবসমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইব।” স্বীকার করি, বড়াই বড় বেশী, গল্পটাও নিতান্ত আশাঢ়ে। তা হোক—সত্য বলিয়া কাহাকেও ইহা গ্রহণ করিতে হইতেছে না। কবিপ্রণীত চরিত্রচিত্রের সুসঙ্গতি লইয়া কথা কহিতেছি। নারায়ণাজ্ঞমোক্ষ মৌলিক না

হইতে পারে, কিন্তু এই হাঁচি মৌলিক মহাভারতে সর্বত্রই ভীমের চরিত্র ঢালা। ইহার সঙ্গে ভীমের সেই শৃগালাধার জ্ঞাপককনা কতটা সুসঙ্গত? এই ভীম কি জ্ঞাপককর ও সুপাশ্চর যে লক্ষ্যধোপার, তাহা অবলম্বন করিতে পারে? জ্ঞাপককরের অপেক্ষা নারায়ণের সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর; যে নারায়ণের লক্ষ্যে সিংহের জ্ঞার দৃষ্ট, তাহাকে বলপ্রয়োগ কৃতীতঃ ও নারায়ণের লক্ষ্যে হইতে কেহ বিমুগ্ধ করিতে পারিল না, তাহাকে অন্ধনের প্রতিযোদ্ধা মাত্র জ্ঞাপকের ভয়ে শৃগালাধমের জ্ঞার কার্য প্রবৃত্ত বলিয়া যে কবি বর্ণনা করিয়াছেন, সে কবির কবিত্ব কোথায়? মহাভারত প্রণয়ন কি তাহার সাধ্য?

তবে নিহত অশ্বখামাগজের এই গল্প, ভীমের চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গত; যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গেও অসঙ্গত, ইহা দেখিয়াছি। কিন্তু ভীমের চরিত্রের সঙ্গে ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে ইহার যতটা অসঙ্গতি, তদপেক্ষা কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গেও ইহার অসঙ্গতি আরও বেশী। যদি আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা পাঠক বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই এই অসঙ্গতির পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। আলোকে অন্ধকারে যত অসঙ্গতি; কৃষ্ণে শ্বেতে; তাপে শৈত্যে; মধুরে কৰ্কশে; রোগে স্বাস্থ্যে; ভাবে অভাবে যতটা অসঙ্গতি, ইহাও তত। যখন মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে একটি নয়, তিনটি মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে এ গল্পের এত অসঙ্গতি, তখন ইহা অমৌলিক ও প্রাক্কিণ্ড, এবং অশ্লকবিপ্রণীত বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি।

(২) আমার কথা শেষ হয় নাই। কোন্ অংশ মৌলিক, কোন্ অংশ অমৌলিক, ইহার নির্বাচন জন্ত যে কয়েকটি লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়াছি, তাহার একটির দ্বারা পরীক্ষা করায় এই হতগজবৃত্তান্তটী অমৌলিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। আর একটির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। আর একটি সূত্র এই যে, দুইটি বিবরণ পরস্পরবিরোধী হইলে, তাহার একটি প্রাক্কিণ্ড। এখন মহাভারতে, ঐ অশ্বখামাগজের গল্পের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞাপককরের আর একটি বৃত্তান্ত পাই। একটিই যথেষ্ট কারণ, কিন্তু দুইটি একত্র জড়ান হইয়াছে। আমরা সেই স্বতন্ত্র বিবরণটি পৃথক্ করিয়া মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা বুঝাইবার জন্ত, অগ্রে আমার বলা উচিত যে, জ্ঞাপক অশ্বখামাগজ করিতেছিলেন। মহাভারতে কথিত অশ্বখামাগজের মধ্যে, ব্রহ্মাঙ্গ একটি। আজি এ দেশের লোকে, যে উপায় যে কার্যসাধনে অব্যর্থ, তাহাকে সেই কার্যের “ব্রহ্মাঙ্গ” বলে। এই ব্রহ্মাঙ্গ

অজ্ঞানভিদ্ধ ব্যক্তিরিণের প্রতি এরোপ নিবিড় ও অধর্ম, ইহাই অবিধিগের মন্ত। দ্রোণ ব্রহ্মাত্মের ধার। অজ্ঞানভিদ্ধ নৈজগৎগকে বিনষ্ট করিতেছিলেন। এমন সময়ে,—

“নিখামিত, অমহারি, ভয়বাহ, দৌত্য, বশিত, অন্ধি, ভূত, অন্ধিরা, সিকত, প্রসি, গর্গ, বাসধিলা, মরীচিণ ও অজ্ঞাত ক্রুরতর নারিক অধিগণ আচাৰ্য্যকে নিঃকন্ডের করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহারে ব্রহ্মলোকে নীত করিবার বাসনার সকলে শীঘ্র সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে দ্রোণ! তুমি অধর্ম যুদ্ধ করিতেছ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আত্ম পরিত্যাগ করিয়া একবার আমাদের নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এরূপ কার্যের অহুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে। তুমি বেনবেদ্যকবেদ্য এবং সত্যধর্মপরায়ণ; অতএব এরূপ কার্য করা তোমার নিতান্ত অহচিত; তুমি অবিমুগ্ধ হইয়া আত্ম পরিত্যাগ পূর্বক শাস্ততপথে অবস্থান কর। অস্ত তোমার মর্ত্যলোক নিবাসের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! অজ্ঞানভিদ্ধ ব্যক্তিগিকে ব্রহ্মাত্মে বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসংকার্যের অহুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব আত্ম অবলম্বে পরিত্যাগ কর; আর ক্রুরকার্যের অহুষ্ঠান করা তোমার কর্তব্য নহে।”

ইহাতেই দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের নিকট অশ্বখামার মৃত্যু শুনিয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই, পূর্বক বলিয়াছি। তার পরেও তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিলে, যদুবংশীয় সাত্যকি আসিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষা সম্পাদন করিলেন। সাত্যকির সঙ্গে কেহই যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। দ্রোণও নিবারণিত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় বীরগণকে বলিলেন,—

“হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্নসহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অস্ত সময়ক্ষেত্রে ঋগদনন্দনের কার্য সন্দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধারম্ভ কর।”

এই কথার পর, পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাভারত হইতে পুনশ্চ উদ্ধৃত করিতেছি,—

“মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সত্যসঙ্গ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে যেদিনীমণ্ডল কম্পিত, ও প্রচণ্ড বায়ু সেনাগণকে ভীত করত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উদ্ধা সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক প্রকাশ পূর্বক সকলকে শঙ্কিত করিল। দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র সকল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিশ্বন ও অশ্বগণের অজ্ঞপাত হইতে লাগিল। তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিভেজ হইলেন। তাঁহার বামনয়ন ও বামবাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত উন্নয়ন হইলেন, এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মযুদ্ধ অবলম্বন পূর্বক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন।”

পাঠক দেখিবেন যে, এখানে জ্ঞোণের প্রাণত্যাগের অভিলাষের কারণপরম্পরার মধ্যে অশ্বখামার মৃত্যুসংবাদ পরিগণিত হয় নাই। বিচারকের পক্ষে এই এক প্রমাণ যথেষ্ট।

জ্ঞোণ তথাপি যুদ্ধ ছাড়িলেন না। মহাভারতকার দশ হাজার সৈন্যধ্বংসের কম কথা কন না, তিনি বলেন তার পরেও জ্ঞোণাচার্য্য ত্রিশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট করিলেন, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনর্ব্বার পরাভূত করিলেন। এবার ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিলেন, এবং জ্ঞোণাচার্য্যের রথ ধরিয়া (ভীমের অভ্যাস রথগুলো ধরিয়া আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন*) সেই পূর্ব্বোক্ত তীব্র তিরস্কার করিলেন। সেই তিরস্কারে জ্ঞোণ যথার্থ আত্ম-ত্যাগ করিলেন,—

“এবং তৎপরে রথোপরি সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত জীবকে অভয়প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রক্ত প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ সশরশরাসন অবস্থান পূর্ব্বক করবারি ধারণ পূর্ব্বক জ্ঞোণাতিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে জ্ঞোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের বশীভূত হইলে সময়ানুগে মহান হাচাকারশব্দ সমুথিত হইল। এদিকে জ্ঞোণাতিমুখ মহাতপা জ্ঞোণাচার্য্য অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগসহকারে অনাদিপুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন। এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টম্ভিত ও নেত্রদ্বয় নিম্নীলিত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্ছা পরিত্যাগ ও সাংঘিকভাব অবলম্বন পূর্ব্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র ওঁকার ও পরাংপর দেবদেবেশ বাহুদেবকে স্মরণ করত সাধুজনেরও চন্দ্রভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।”

তার পর ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিয়া মৃতদেহের মস্তক কাটিয়া লইয়া গেলেন।

অতএব, জ্ঞোণের মৃত্যুর মহাভারতে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। দুইটি সম্পূর্ণরূপে যে পরস্পরের বিরোধী তাহা নহে; একত্রে গাঁথা যায়। একত্রে গাঁথাও আছে—ভাল জোড় লাগে নাই, মোটা রকম রিপূক্কর্ষ, স্থানে স্থানে কাঁক পড়িয়াছে। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি বিবরণের মধ্যে একটিই জ্ঞোণের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট, দুইটির প্রয়োজন নাই। এক জন কবি এইরূপ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ জোড়া দিবার চেষ্টা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের দুই জন কবির প্রণীত বলিয়া কাজেই স্বীকার করিতে হয়। কোন্টি প্রাক্কিপ্ত? জ্ঞোণের প্রাণত্যাগেচ্ছার যে সকল কারণ মহাভারত হইতে উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, অশ্বখামার মৃত্যুসংবাদ তাহাতে ধরা হয় নাই। অতএব অশ্বখামার মৃত্যুঘটিত বৃত্তান্তটি প্রকৃত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যে সকল সূত্রে পূর্ব্ব সংস্থাপিত করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলেই ইহার মীমাংসা হইবে।

* রথগুলো যদি “একার” মত হয়, তবে এখনকার লোকেও ইহা পারে।

আমরা বলিয়াছি যে, যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বা পরস্পরবিরোধী বিষয়ের মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্থির হইবে, তখন কোনটি প্রক্ষিপ্ত তাহা মীমাংসার জন্ত দেখিতে হইবে, কোনটি অশ্ল লক্ষণের দ্বারা পরস্পরবিরোধী বলিয়া বোধ হয়। যেটি অশ্ল লক্ষণেও ধরা পড়িবে, সেইটিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিবে।* আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, অশ্বখামাবধসংবাদ বৃত্তান্ত, কৃষ্ণ, ভীম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে অভ্যস্ত অসঙ্গত। আমরা পূর্বে এই একটি লক্ষণ স্থির করিয়াছি যে, এরূপ অসঙ্গতি থাকিলে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিতে হইবে।† অতএব এই অশ্বখামাবধসংবাদ বৃত্তান্ত প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩) আরও একটা কথা আছে। দেখিয়াছি যে, অশ্বখামার মৃত্যুসংবাদে জ্ঞোণ যুদ্ধে কিছুমাত্র শৈথিল্য করেন নাই। তবে কৃষ্ণ এ কথা বলাইলেন কেন? জ্ঞোণের যুদ্ধে নিবৃত্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া? সম্ভাবনা কোথা? জ্ঞোণ জানেন, অশ্বখামা অমর। সে কথা অনৈসর্গিক বলিয়া না হয় ছাড়িয়া দিলাম। সামান্য মানুষের, তোমার আমার অথবা একটা কুলি মজুরের যে বুদ্ধি, ততটুকু বুদ্ধিও কৃষ্ণের ছিল, যদি এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, কৃষ্ণ এরূপ পরামর্শ দিবার সম্ভাবনা ছিল না। জ্ঞোণই হউক, আর যেই হউক, এরূপ সংবাদ শুনিয়া আশ্চর্য্যহত্যা উদ্ভত হইবার আগে, একবার স্বপক্ষীয় কাহাকেও কি জিজ্ঞাসা করিবে না যে, অশ্বখামা মরিয়াছে কি? অশ্বখামার অনুসন্ধান পাঠাইবেন না? তাহাই নিতান্ত সম্ভব। তাহা ঘটিলে জুয়াচুরি তখনই সমস্ত কাঁসিয়া যাইবে।

অতএব উপস্থাসটি প্রথমতঃ প্রক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়তঃ মিথ্যা। আমি এমত বলি না যে, ঋষিবাক্যে জ্ঞোণ অস্ত্র পরিত্যাগ করাই সত্য। ঋষিদের সেই রণক্ষেত্রে আগমন অনৈসর্গিক ব্যাপার, সুতরাং তাহাও অপ্ৰকৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য। ইহার মধ্যে প্রকৃত বা বিশ্বাসযোগ্য কথা এই হইতে পারে যে, জ্ঞোণ অশ্বখামাচরণ করিতেছিলেন—ভীমের তীব্র তিরস্কারে তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। যুদ্ধে বিমুখ হওয়া তাঁহার সাধ্য নহে—অপটুতা এবং হৃর্ঘ্যোদনকে বিপৎকালে পরিত্যাগ এই উভয় দোষেই দূষিত হইতে হইবে। অতএব মৃত্যুই স্থির করিলেন। বোধ হয় এতটুকু একটু কিংবদন্তী ছিল—তাহারই উপর মহাভারতের প্রথম স্তর নির্মিত হইয়াছিল। হয়ত, তাহাও যথার্থ ঘটনা নহে। বোধ হয়, যথার্থ ঘটনা এই পর্য্যন্ত যে জ্ঞোণ যুদ্ধে ক্ষুণ্ণপন্থ

* ৪৪ পৃষ্ঠা (৩) সূত্র দেখ।

† ৪৩ পৃষ্ঠা (৪) সূত্র দেখ।

কৰ্ণক নিহত হইয়াছিলেন ; পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে তাই বুঝায় ; তার পর প্রবল-প্রোথাপ পাঞ্চালবংশকে ব্রাহ্মহত্যাকলঙ্ক হইতে উদ্ধৃত করিবার জন্য নানাবিধ উপস্থাপন প্রস্তুত হইয়াছে ।

(৪) এখন দেখা যাউক, অনুক্রমগণিকাধ্যায়ে, এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে কি আছে । অনুক্রমগণিকাধ্যায়ে হুতরাষ্ট্রবিলাপে এই মাত্র আছে যে—

“ব্রাহ্মজ্যৈষ্ঠং দ্রোণদ্যাবাচার্য্যমেকং ধৃষ্টদ্যুম্নেনাভ্যতিক্রম্য ধর্ম্মম্ ।

রথোপস্থে প্রায়গতং বিশন্তং তদা নাপশংসে বিজয়ার সঙ্কম ॥”

অর্থ । হে সঙ্কম ! যখন শুনিলাম যে এক আচার্য্য দ্রোণকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্ম্মাতিক্রমপূর্বক প্রায়োগপরিষ্ট অবস্থায় রথোপস্থে বধ করিয়াছে, তখন আর জয়ে সন্দেহ করি নাই ।

অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে, দ্রোণবধে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভিন্ন আর কেহ অধর্ম্মাচরণ করে নাই । ধৃষ্টদ্যুম্নেরও পাপ এই যে, প্রায়োগপরিষ্ট বৃদ্ধকে তিনি নিহত করিয়াছিলেন । দ্রোণের প্রায়োগবেশনের কারণ এখানে কিছু কথিত হয় নাই । যুধিষ্ঠিরবাক্যে, বা ঋষি-গণের বাক্যে, বা ভীমের তিরস্কারে, তাহা কিছু কথিত হয় নাই । পশ্চাৎ দেখিব, তিনি পরে প্রাস্ত হইয়াই নিহত হইলেন । আসন্নমৃত্যু ব্রাহ্মণের প্রায়োগবেশনের সেও উপযুক্ত কারণ ।

(৫) পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে কোন কথাই নাই—“দ্রোণে যুধি নিপাতিতে,” এ ছাড়া আর কিছুই নাই । হতগজের কথাটা সত্য হইলে, তাহার প্রসঙ্গ অবশ্যই থাকিত । অভিন্নমূর্য অধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুর কথা আছে—দ্রোণেরও অবশ্য থাকিত । গল্পটা তখন তৈয়ার হয় নাই, এজ্জ নাহি ।

(৬) তার পর, দ্রোণপর্বের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে দ্রোণযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে । তাহাতেও এই জুয়াচুরির কোন প্রসঙ্গ নাই । কেবল আছে যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে নিপাতিত করিলেন । এই অধ্যায়গুলি যখন প্রণীত হয়, তখনও গল্পটা তৈয়ার হয় নাই ।

(৭) আশ্বমেধিক পর্বে আছে যে, কৃষ্ণও দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলে, বন্সুদেব কৃষ্ণের নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন । কৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ধবৃত্তান্ত সংক্ষেপে শুনাইলেন । দ্রোণযুদ্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণ ইহাই বলিলেন যে, দ্রোণাচার্য্য ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঁচ দিন যুদ্ধ হয় । পরিশেষে দ্রোণ সমরশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নহস্তে নিহত হইলেন । বোধ হয়, এইটুকুই সত্য ; এবং যুবার সহিত যুদ্ধে যুদ্ধের শ্রান্তিই দ্রোণের যুদ্ধবিরতির যথার্থ কারণ । আর সকলই কবিকল্পনা, বা উপস্থাপন । নিতান্তই যে উপস্থাপন, তাহার সাত রকম প্রমাণ দিলাম ।

কিন্তু সেই উপজ্ঞাস মধ্যে, কৃষ্ণকে মিথ্যা প্রবঞ্চনার প্রবর্তক বলিয়া স্থাপিত করিবার কারণ কি ? কারণ পূর্বের বুঝাইয়াছি। বুঝাইয়াছি যে যেমন জ্ঞান ঈশ্বরদত্ত, অজ্ঞান বা ভ্রান্তিও তাই। জয়দ্রথবধে কবি তাহা দেখাইয়াছেন। ভ্রান্তিও ঈশ্বরপ্রেরিত। ঘটোৎকচ-বধে কবি দেখাইয়াছেন যে, যেমন বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, দুর্বুদ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত। আরও বুঝাইয়াছি যে, যেমন সত্যও ঈশ্বরের, অসত্যও তেমনই ঈশ্বরের। এই দ্রোণবধে কবি তাহাই দেখাইলেন।

ইহার পর, নারায়ণাত্মমোক্ষ-পর্বাধ্যায়। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বিস্তারিতের প্রয়োজন নাই, কেন না নারায়ণাত্ম বৃত্তান্তটা অনৈসর্গিক, স্মরণ্য পরিভাষ্য। তবে এই পর্বাধ্যায়ে একটা রহস্যের কথা আছে।

দ্রোণ নিহত হইলে, অর্জুন গুরুর জন্ত শোকে অত্যন্ত কাতর। মিথ্যা কথা বলিয়া গুরুবধসাধনজন্ত তিনি যুধিষ্ঠিরকে খুব তিরস্কার করিলেন, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের নিন্দা করিলেন। যুধিষ্ঠির ভাল মানুষ, কিছু উত্তর করিলেন না, কিন্তু ভীম অর্জুনকে কড়া রকম কিছু শুনাইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনকে আরও কড়া রকম শুনাইলেন। তখন অর্জুনশিষ্য যত্ববংশীয় সাত্যকি, অর্জুনের পক্ষ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভারি রকম গালিগালাজ দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সুদ সমেত কিরাইয়া দিলেন। তখন দুই জনে পরস্পরের বধে উত্তত। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম ও সহদেব থামাইয়া দিলেন। বিবাদটা এই যে, মিথ্যা কথা বলিয়া দ্রোণের মৃত্যুসাধন করা কর্তব্য ও অকর্তব্য কি না, এই তত্ত্ব লইয়া দুই দল দুই পক্ষে যত কথা আছে, সব বলিলেন, কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। কেহই বলিলেন না যে, কৃষ্ণের কথায় এরূপ হইয়াছে। কৃষ্ণের নামও কেহ করিলেন না। পাঁচ হাতের কাজ না হইলে এমন ঘটে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণকথিত ধর্মতত্ত্ব

যিনি অশ্বখামাবধসংবাদ বৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন, তিনি অর্জুনকে বড় উচ্চ স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীমের অপেক্ষা তাঁহার ধার্মিকতা অনেক বেশী এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। শাহার প্রজ্ঞাবকর্তা কৃষ্ণ, এবং যাহা পরিশেষে ভীম ও যুধিষ্ঠির সম্পাদিত করিলেন, সে মিথ্যা কথা বলিয়া অর্জুন তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না ;

বরণে তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠিরকে বধেই ভৎসনা করিলেন। কিন্তু এক্ষণে যে বিবরণে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, তাহাতে অর্জুন অতি মৃঢ় ও পাষণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। এবং কৃষ্ণের নিকট ধর্মোপদেশ পাঠিয়াই সংপথ অবলম্বন করিতেছেন। বৃত্তান্তটা এই :—

দ্রোণের পর কর্ণ দুর্যোধনের সেনাপতি। তাঁহার যুদ্ধে পাণ্ডবসেনা অস্থির। যুধিষ্ঠির নিজ দুর্যোগ্যবশতঃ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কর্ণ তাঁহাকে এরূপ সম্ভাড়িত করিলেন যে, যুধিষ্ঠির ভয়ে রণক্ষেত্রে হইতে পলাইয়া গিয়া শিবিরে লুকায়িত হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। এদিকে অর্জুন যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া তাঁহার অন্বেষণে শিবিরে গেলেন। তখনও কর্ণ নিহত হয়েন নাই। যুধিষ্ঠির যখন শুনিলেন যে, অর্জুন এখনও কর্ণবধ করেন নাই, তখন রাগিয়া বড় গরম হইলেন। কাপুরুষের স্বভাবই এই যে, আপনি যাহা না পারে, পরে তাহা করিয়া না দিলে বড় চটিয়া উঠে। সুতরাং যুধিষ্ঠির অর্জুনকে খুব কঠিন গালিগালাজ করিলেন। শেষ বলিলেন যে, তুমি নিজে যখন যুদ্ধে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছ, তখন তুমি কৃষ্ণকে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর।

সুনিয়া অর্জুন তরবারি লইয়া যুধিষ্ঠিরকে কাটিতে উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তরবারি দিয়া কাহাকে বধ করিবে? অর্জুন বলিলেন, “তুমি অস্ত্রকে গাণ্ডীব * শরাসন সমর্পণ কর, এই কথা যিনি আমারে কহিবেন, আমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিব, এই আমার উপাংশুভ্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে এই কথা কহিয়াছেন, অতএব আমি এই ধর্মভীরু নরপতির নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনুগ্য লাভ করত নিশ্চিন্ত হইব।”

কথাটা মৃঢ় ও পাষণ্ডের মত হইল—অর্জুনের মত নহে। একে ত, গাণ্ডীব অস্ত্রকে দাও বলিলে কোন ব্যক্তিকে খুন করিতে হইবে, এ প্রতিজ্ঞাই মৃত্যুর কাজ। তার পর পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠাশ্রম উত্তেজনার জন্ত এরূপ কথা বলিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া অতিশয় পাষণ্ডের কাজ। তবে ইহার ভিতর গুরুতর কথা আছে; তাহার বিস্তারিত মীমাংসা কৃষ্ণ কর্তৃক হইয়াছিল, এই জন্ত এ কথার অবতারণায় আমি বাধ্য।

কথাটা এই। সত্য পরম ধর্ম। যদি অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ না করেন, তবে তাঁহাকে সত্যচ্যুত হইতে হয়। অর্জুনের প্রাঙ্গ এই যে, সত্যরক্ষার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা তাঁহার

* পাঠকে বোধ করি বলিতে হইবে না, গাণ্ডীব অর্জুনের ধনুকের নাম। উহা দেবদত্ত, অবিদ্যবর এবং শরাসন মধ্যে তরবার।

কর্তব্য কি না। অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্তব্য?”

কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন, তাহা বুঝাইবার পূর্বে, আমরা পাঠকে অহরোধ করি যে, আপনিই ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করুন। বোধ করি সকল পাঠকই একমত হইয়া উত্তর দিবেন যে, এরূপ সত্যের জন্ত যুধিষ্ঠিরকে বধ করা অর্জুনের কর্তব্য নহে। কৃষ্ণও সেই উত্তর দিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য নীতিপণ্ডিত আধুনিক পাঠক যে কারণে এই উত্তর দিবেন, কৃষ্ণ সেই কারণে এ সকল উত্তর দিলেন না। তিনি প্রাচ্যনীতির বশবর্তী হইয়াই এই উত্তর দিলেন। তাহার কারণ বুঝাইতে হইবে না—বুঝাইতে হইবে না যে, শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষে অবতীর্ণ, ইংলণ্ডে নহে। তিনি ভারতবর্ষের নীতিতে সুপণ্ডিত, ইউরোপীয় নীতি তখন হয়ও নাই; এবং কৃষ্ণ তর্মাগাবলম্বী হইলে অর্জুনও তাহার কিছুই বুঝিতেন না।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝাইবার জন্ত যে সকল তত্ত্বের অবতারণা করিলেন, এক্ষণে তাহার স্থূলমর্ম বলিতেছি—অন্ততঃ যে অংশ বিবাদের স্থল হইতে পারে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

তাহার প্রথম কথা “অহিংসা পরম ধর্ম।” ইহাতে প্রথম আপত্তি হইতে পারে যে, সকল স্থানে অহিংসা ধর্ম নহে। দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং গীতাপর্ব্বাধ্যায় অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, এ উক্তি তাহার বিপরীত।

যিনি অহিংসাতত্ত্বের যথার্থ মর্ম না বুঝেন, তিনিই এরূপ আপত্তি করিবেন। অহিংসা পরম ধর্ম, এ কথায় এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণিহিংসা করিলে অধর্ম হয়। প্রাণিহিংসা ব্যতীত আমরা ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারি না, ইহা ঐশিক নিয়ম। যে জল পান করি তাহার সঙ্গে সহস্র সহস্র অণুবীক্ষণদৃশ্য জীব উদরস্থ করি; প্রতি নিশ্বাসে বহু সংখ্যক তাদৃক জীব নাসাপথে প্রেরিত করি, প্রতি পদাঙ্গণে সহস্র সহস্রকে দলিত করি। একটি শাকের পাতা, বা একটি বেগুনের সঙ্গে অনেকগুলিকে রাখিয়া খাই। যদি বল এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংসা, তাহাতে পাপ নাই, আমি তাহার উত্তরে বলি যে জ্ঞানকৃত প্রাণিহিংসা ব্যতীতও আমাদের প্রাণরক্ষা নাই। যে বিষধর সর্প বা বৃশ্চিক, আমার গৃহে বা কামার শয্যাতে আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে ব্যাজ আমাকে গ্রহণ করিবার জন্ত লক্ষনোদ্ধত, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে শত্রু আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয়, ও উত্ততামুখ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে

বিনাশ করিবে। যে দস্যু হুতাত্র হইয়া নিনীথে আমার গৃহ প্রবেশপূর্বক সর্বত্র গ্রহণ করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাকে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ করাই আমার পক্ষে ধর্ম্যমত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারিত হত্যা প্রমাণিত হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগসম্মত হয়, তবে তিনি তাহার বধাঙ্ক প্রচার করিতে ধর্ম্যতঃ বাধ্য। এবং যে রাজপুরুষের উপর বধাহের বধের ক্ষার আছে, সেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য। সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ, আভিলা বা জলেক, তৈমুর বা নাদের, দ্বিতীয় ফ্রেডিক্ বা নপোলিয়ন্ পরস্ব ও পররাষ্ট্রাপহরণ জন্ত যে অগণিত শিক্ষিত তত্ত্ব লইয়া পররাজ্যপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধর্ম্যতঃ বধ্য। এখানে হিংসাই ধর্ম্য।

পক্ষান্তরে, যে পাখিটি আকাশে উড়িয়া যাইতেছে, ভোজন জন্তই হউক বা খেলার জন্তই হউক তাহার নিপাত অধর্ম্য। যে মাছিটি মিঠাবিন্দুর অধেষণে উড়িয়া বেড়াইতেছে, ক্রৌড়াশীল বালক যে তাহাকে ধরিয়া টিপিয়া মারিল, তাহা অধর্ম্য। যে মৃগ, বা যে কুকুট তোমার আমার ছায় জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত জগতে আসিয়াছে, উদরন্তরী যে তাহাকে বধ করিয়া খায় সে অধর্ম্য। আমরা বায়ুপ্রবাহের তলচারী জীব; মৎস্য, জলপ্রবাহের উপরিচর জীব; আমরা যে তাহাদের ধরিয়া খাই, সে অধর্ম্য।

তবে অহিংসা পরম ধর্ম্য, এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতই পরম ধর্ম্য। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্ত হিংসা অধর্ম্য নহে; বরং পরম ধর্ম্য। এই কথা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলাকের ইতিহাস শুনাইলেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, বলাক নামে ব্যাধ, প্রাণিগণের বিশেষবিনাশহেতু এক ষাপদকে বিনাশ করিয়াছিল, করিবামাত্র তাহার উপর “আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল, অঙ্গরোদিগের অতি মনোরম গীত বাজ আরম্ভ হইল, এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল।” ব্যাধের পুণ্য এই যে, সে হিংসাকারীর হিংসা করিয়াছিল।

অহিংসা পরম ধর্ম্য, এই অর্থে বৃষ্টিতে হইবে। তবে, ধর্ম্য প্রয়োজন ভিন্ন হিংসা করিবে না, এ কথায় একটা ভারি গোলযোগ হয়, এবং জগতে চিরকাল হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্য প্রয়োজন কি? ধর্ম্য কি? Inquisition কর্তৃক মনুষ্যবধে ধর্ম্য প্রয়োজন আছে বলিয়া কোটি কোটি মনুষ্য যমপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। ধর্ম্যার্থই St. Bartholomew হত্যাকাণ্ড। ধর্ম্যচরণ বিবেচনাতেই জুসেদওয়ালাদিগের দ্বারা পৃথিবী নরশোণিতপ্রবাহে

পড়িল হইয়াছিল। বর্ণিতকারের অতঃ সুসন্দর্ভানেরা লক্ষ লক্ষ মনুষ্যহত্যা করিয়াছিল। বোধ হয়, বর্ণিতকারের লক্ষ্যে আন্তিতে পড়িয়া মনুষ্য বস্তু মনুষ্য নষ্ট করিয়াছে, তত মনুষ্য আর কোন কারণেই নষ্ট হয় নাই।

অর্জুনেরও এখন সেই আন্তি উপস্থিত। তিনি মনে করিয়াছেন যে, মনুষ্যকর্ম্মার্থে মৃত্তিকাকে বধ করা কর্তব্য। অতএব কেবল অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ কথা বলিলে তাঁহার আন্তির সূত্রীকরণ হয় না। এই অতঃ কৃষ্ণের দ্বিতীয় কথা।

সে দ্বিতীয় কথা এই যে, বস্তু মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু কখনই প্রাণিহিংসা করা কর্তব্য নহে। * ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে অহিংসা ও সত্য, এই দুইয়ের মধ্যে অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহার অর্থ এই :—নানাবিধ পুণ্য কর্ম্মকে কর বলিয়া গণনা করা যায়; যথা—দান, তপ, দেবভক্তি, সত্য, শৌচ, অহিংসা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে সকলগুলি সমান নহে; ইতর বিশেষ হওয়াই সম্ভব। শৌচের মাছাখ্য, বা দানের মাছাখ্য কি সত্যের সঙ্গে বা অহিংসার সঙ্গে এক? যদি তাহা না হয়, যদি তারতম্য থাকে, তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? কৃষ্ণ বলেন, অহিংসা। সত্যের স্থান তাহার নীচে।

আমরা পাশ্চাত্যের শিশু। অনেক পাঠক এই কথায় শিহরিয়া উঠিবেন। পাশ্চাত্যেরা নাকি বলিয়া থাকেন, কোনও অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। তা না হয় হইল; সে কথা এখন উঠিতেছে না। এমন কেহই বলিবেন না যে, পাশ্চাত্য-দিগের মতে এক জন মিথ্যাবাদী এক জন হত্যাকারীর অপেক্ষা গুরুতর পাপী, অথবা মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারী তুল্য পাপী। তাঁহারা যে তাহা বলেন না, সমস্ত ইউরোপীয় দণ্ডবিধিষাত্র তাহার প্রমাণ। যদি তাই হইল, তবে এখন কৃষ্ণের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিশুগণের মতভেদের এখানে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এখানে কেবল পাপের তারতম্যের কথা হইতেছে। কোন অধর্ম্মই কোন সময়ে করিতে নাই। নরহত্যাও করিতে নাই, মিথ্যা কথাও বলিতে নাই। কৃষ্ণের কথার ফল এই যে যদি এমন অবস্থা কাহারও ঘটে যে, হয় তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে, নয় নরহত্যা করিতে হইবে, তবে সে

* যে বচনের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণকবিত্ত এই ধর্ম্মতত্ত্ব সংস্থাপিত হইতেছে, তাহার মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করা কর্তব্য।

প্রাণিমানববধাত সর্ব্বজ্ঞানায়ত্তো মম।

অন্ত্যং বা বদেৎচাং ন তু হিংসাং কথং ন।

পাঠক দেখিবেন, অহিংসা পরমধর্ম্ম, এটা কৃষ্ণাকার ঠিক অনুবাদ নহে। ঠিক অনুবাদ “আমার মতে প্রাণিগণের অহিংসা সর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ।” অর্থাৎ বিশেষ প্রভেদ নাই বলিয়া “অহিংসা পরমধর্ম্ম” ইতিপরিচিত বাক্য ব্যবহার করিয়াছি।

বক্তাব্যক্তি কখন বলিবে, কখনই নরহত্যা করিবে না। যদি এরূপ বক্তাব্যক্তি মিত্তিক কেহ থাকেন যে, বলেন যে, বরং নরহত্যা করিবে তথাপি মিথ্যা কথা বলিবে না, তবে আমাদের উত্তর এই যে, তাঁহার ধর্ম তাঁহাতেই থাক, এ নারকী ধর্ম যেন ভারতবর্ষে বিরলপ্রচার হয়। কৃষ্ণের এই মত। যদি অর্জুন ইহার অহুবর্তী হইবেন, তবে ভ্রাতৃবধ শাপ হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু অর্জুন বলিতে পারেন, “এত গেল তোমার মত। কিন্তু সৌকিক ও প্রচলিত ধর্ম কি? তোমার মতই যথার্থ হইতে পারে, কিন্তু ইহা যদি প্রচলিত ধর্মামুদিত না হয়, তবে আমি জনসমাজে সত্যচ্যুত পাপাত্মা বলিয়া কলঙ্কিত হইব।” এজন্ত কৃষ্ণ আপনার মত প্রকাশ করিয়া প্রচলিত ধর্ম যাহা, তাহা বুঝাইতেছেন। তিনি বলিলেন, “হে ধনঞ্জয়! কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিহ্বর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্মরহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্তন করিতেছি, অবগণ কর।” এই বলিয়া বলিলেন,

“সাদু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই।* সত্যতত্ত্ব অতি দুজ্জের। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্তব্য।

এই গেল স্থলনীতি। তার পর বর্জিত তত্ত্ব বলিতেছেন,

“কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ, ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা নোবাধ নহে।”

কিন্তু কখন কি এমন হয়? এ কথাটা আবার উঠিবে, সেই সময়ে আমরা ইহার যথাসাধ্য বিচার করিব। তার পর কৃষ্ণ বলিতেছেন,

“বিবাহ, রতিজাঁড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্বস্বাপহরণ কালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না।”

এখানে ঘোর বিবাদের স্থল, কিন্তু বিবাহ এখন থাক। কালীপ্রসন্ন সিংহের অহুবাদে উল্লিখিতরূপ আছে। উহা একটি শ্লোকের মাত্র অহুবাদ, কিন্তু মূলে ঐ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে। দুইটিই উদ্ধৃত করিতেছি;

- ১। প্রাণাত্যায়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনুতং ভবেৎ।
সর্বস্বতাপহারে চ বক্তব্যমনুতং ভবেৎ ॥
- ২। বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যায়ে সর্বদনাপহারে।
বিপ্রস্ত চার্ধে হনুতং বরেন্ড পঞ্চানুতাত্তাহরপাতকানি ॥

* “ন সত্যাবিত্তে পরম্।” ইতিপূর্বে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, “প্রাণিনামবধাত সর্বজ্ঞানায়ত্তো মম।” এই দুইটি কথা পরস্পরবিমোদী। তাহার কারণ একটি কৃষ্ণের মত, আর একটি ভীষ্মাবিকথিত প্রচলিত ধর্মনীতি।

এই দুইটি শ্লোকের একই অর্থ ; কেবল প্রথম শ্লোকটিতে আশ্রয়ের কথা নাই, এই প্রভেদ । এখন পাঠকের মনে এই প্রশ্ন আপনাই উদয় হইবে, একই অর্থবাক্য দুইটি শ্লোকের প্রয়োজন কি ?

ইহার উত্তর এই যে, এই দুইটিই অমৃত্যু হইতে উদ্ধৃত—Quotation—কৃষ্ণের নিজোক্তি নহে । সংস্কৃতগ্রন্থে এমন স্থানে স্থানে দেখা যায় যে অমৃত্যু হইতে বচন ধৃত হয়, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলা হয় না যে, এই বচন গ্রন্থান্তরের । এই মহাভারতীয় গীতা-পৰ্ব্বাধ্যায়েই তাহার উদাহরণ গ্রন্থান্তরে দিয়াছি ।

আমি আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি না, এ বচন দুইটি অমৃত্যু হইতে ধৃত । দ্বিতীয় শ্লোকটি, যথা—“বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে” ইত্যাদি—ইহা বশিষ্ঠের বচন । পাঠক বশিষ্ঠের ১৬ অধ্যায়ে, ৩৫ শ্লোকে তাহা দেখিবেন ; ইহা মহাভারতের আদিপর্বে, ৩৪১২ শ্লোকে, যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

ন নৰ্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজস্ব বিবাহকালে ।

প্রাণাত্যয়ে সৰ্ব্বধনাপহারে পঞ্চানুতাত্ত্বাহরপাতকানি ॥

চারিটি ভিন্ন পাঁচটির কথা এখানে নাই, তথাপি বশিষ্ঠের সেই “পঞ্চানুতাত্ত্বাহর-পাতকানি” আছে । প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিকৃত হইয়া যায় ।

প্রথম শ্লোকটির পূর্বগামী শ্লোকের সহিত লিখিতেছি ;

(ক) ভবেৎ সত্যমবজ্ঞব্যং বজ্ঞব্যমনৃতং ভবেৎ ।

(খ) যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যক্ৰাপানৃতং ভবেৎ ॥

(গ) প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বজ্ঞব্যমনৃতং ভবেৎ ।

(ঘ) সৰ্ব্বস্বত্বাপহারে চ বজ্ঞব্যমনৃতং ভবেৎ ॥

একশ্রেণ মহাভারতের সভাপর্ব্ব হইতে একটি (১৩৮৪) শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—
কৃষ্ণের সহিত সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই ।

(চ) প্রাণান্তিকে বিবাহে চ বজ্ঞব্যমনৃতং ভবেৎ ।

(ছ) অনুতেন ভবেৎ সত্যং সত্যো নৈবানৃতং ভবেৎ ॥

পাঠক দেখিবেন, (গ) ও (চ) আর (খ) (ছ) একই । শব্দগুলিও প্রায় একই । অতএব ইহাও প্রচলিত পুরাতন বচন ।

ইহা কৃষ্ণের মত নহে, নিজের অমুমোদিত নীতি বলিয়াও তাহা বলিতেছেন না ; ভীষ্মাদির কাছে যাছা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন ; নিজের অমুমোদিত হটক বা না

হউক, কেন তিনি ইহা অর্জুনকে শুনাইতে বাধ্য, তাহা বলিয়াছি। সুতরাং কৃষ্ণচরিত্রে এ নীতির স্বার্থার্থ্যাধার্য বিচারে কোন প্রয়োজন হইতেছে না।

কিন্তু আসল কথা বাকি আছে। আসল কথা, কৃষ্ণের নিজের মতও এই যে, অবস্থা-বিশেষে সত্য মিথ্যা হয় এবং মিথ্যা সত্য হয়; এবং সে সকল স্থানে মিথ্যাই প্রযোক্তব্য। এ কথা তিনি পরে বলিতেছেন।

প্রথমে বিচার্য, কখনও কি মিথ্যা সত্য হয়, এবং সত্য মিথ্যা হয়? ইহার স্থূল উত্তর এই যে যাহা ধর্ম্মানুমোদিত তাহাই সত্য, আর যাহা অধর্ম্মের অনুমোদিত তাহাই মিথ্যা। ধর্ম্মানুমোদিত মিথ্যা নাই; এবং অধর্ম্মানুমোদিত সত্য নাই। তবে সত্যাসত্য মীমাংসা ধর্ম্মাধর্ম্ম মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন। কথাগুলিতে গীতার উদারনীতির গভীর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বলিতেছেন,

“ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অহুমান দ্বারাও নিত্যস্থ দুর্কোষ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়।”

ইহার অপেক্ষা উদার ইউরোপেও কিছু নাই। তার পর,

“অনেকে ক্রটিতে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহাতে আমি দোষারোপ করি না; কিন্তু ক্রটিতে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই; এইজন্য অনেক স্থলে অহুমান দ্বারা ধর্ম্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।”

এই কথাটা লইয়া আজিও সভ্যজগতে বড় গোলমাল। যাহারা বলেন যে যাহা দৈবোক্তি, বেদই হউক, বাইবেলই হউক, কোরাণই হউক,—তাহাতে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম্ম—তাহার বাহিরে ধর্ম্ম কিছুই নাই—তাহারা আজিও বড় বলবান্। তাহাদের মতে ধর্ম্ম দৈবোক্তিনির্দিষ্ট, অহুমানের বিষয় নহে। এ কথা মনুষ্যজাতির উন্নতির পথে বড় হ্রস্বদীর্ঘ্য কটক। আমাদের দেশের কথা দুসে থাকুক, ইউরোপেও আজিও এই মত উন্নতির পথ রোধ করিতেছে। আমাদের দেশের অবনতির ইহা একটি প্রধান কারণ। আজিও ভারতবর্ষের ধর্ম্মজ্ঞান বেদ ও মনুস্মৃতিবাক্যাদি স্মৃতির দ্বারা নিরুদ্ধ;—অহুমানের পথ নিষিদ্ধ। অতি দূরদর্শী মনুস্মৃতিদর্শী শ্রীকৃষ্ণ লোকোন্নতির এই বিষম ব্যাঘাত সেই অতি প্রাচীনকালেও দেখিয়াছিলেন। এখন হিন্দু সমাজের ধর্ম্মজ্ঞান দেখিয়া বিষন্নমনে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু অহুমানের একটা মূল চাহি। যেমন অগ্নি ভিন্ন ধূমোৎপত্তি হয় না, এই মূলের উপর অহুমান করি যে, সম্মুখস্থ ধূমবান্ পর্বত বহিমান্ও বটে, তেমনি এমন একটা লক্ষণ

চাহি যে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, এই কর্মটা ধর্ম বটে। আত্মক তাহার লক্ষণ নির্দিষ্ট করিতেছেন।

“ধর্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যাহারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম।”

এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্মের লক্ষণনির্দেশ। কথাটায়, এখনকার Herbert Spencer, Bentham, Mill ইতি সম্প্রদায়ের শিশুগণ কোন প্রকার অমত করিবেন না জানি। কিন্তু অনেকে বলিবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ—বড় Utilitarian রকমের ধর্ম। বড় Utilitarian রকম বটে, কিন্তু আমি প্রস্তান্তরে বুঝাইয়াছি যে ধর্মতত্ত্ব হিতবাদ হইতে বিযুক্ত করা যায় না;—জগদীশ্বরের সার্বভৌতিকত্ব এবং সর্বময়তা হইতেই ইহাকে অনুমিত করিতে হয়। সর্বাঙ্গ বিশ্বধর্মের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুধর্মে বলে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, হিতবাদ সে ধর্মের প্রকৃত অংশ। এই কৃষ্ণবাক্যই যথার্থ ধর্মলক্ষণ।

পূর্বে বুঝাইয়াছি, যাহা ধর্মামুমোদিত তাহাই সত্য; যাহা ধর্মামুমোদিত নহে, তাহাই মিথ্যা। অতএব যাহা সর্বলোকহিতকর, তাহাই সত্য, যাহা লোকের অহিতকর, তাহাই মিথ্যা। এই অর্থে, যাহা লৌকিক সত্য, তাহা ধর্মতঃ মিথ্যা হইতে পারে; এবং যাহা লৌকিক মিথ্যা, তাহা ধর্মতঃ সত্য হইতে পারে। এইরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যস্বরূপ এবং সত্যও মিথ্যাস্বরূপ হয়।

উদাহরণস্বরূপ কৃষ্ণ বলিতেছেন, “যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে কাহারও নিকট তাহার অসুস্থদান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করাই উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্তব্য। এইরূপ স্থলে মিথ্যা সত্যস্বরূপ হয়।

এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার পূর্বেই, কৃষ্ণ, কৌশিকের উপাখ্যান অর্জুনকে শুনাইয়া ভূমিকা করিয়াছিলেন। সে উপাখ্যান এই,

“কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপশ্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীতীরে সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বন পূর্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দহ্মভয়ে ভীত হইয়া বনमध्ये প্রবেশ করিলে, দহ্মরাও কোথায় যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করতঃ সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে,

যদি আগনি তাহা অবগত থাকেন তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দহ্মগণকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও বৃক্ষশরিরেব হইত অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রুরকর্মা দহ্মগণ তাহাদের অহুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাক্যজনিত পাশে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।”

এ স্থলে ইহা অভিপ্রেত যে, কৌশিক অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহার দহ্মা ; পলায়িত ব্যক্তিগণের অনিষ্ট ইহাদের উদ্দেশ্য—নহিলে তাঁহার কোন পাপই নাই। যদি তাহা অবগত ছিলেন, তবে তিনি কৃষ্ণের মতে সত্যকথনের দ্বারা পাপাচরণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ঘোরতর মতভেদ। আমাদের প্রতীচ্য শিক্ষকদিগের নিকট শিখিয়াছি যে, সত্য নিত্য, কখন মিথ্যা হয় না, এবং কোন সময়ে মিথ্যা প্রযোজ্য নহে। সুতরাং কৃষ্ণের মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নিম্নিতই হইতে পারে। যাহারা ইহার নিন্দা করিবেন (আমি ইহার সমর্থনও করিতেছি না) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কৌশিকের এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল? সহজ উত্তর, মৌনাবলম্বন করা উচিত ছিল। সে কথা ত কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—সে বিষয়ে মতভেদ নাই। যদি দহ্মারা মৌনী থাকিতে না দেয়? পীড়নাদির দ্বারা উত্তর গ্রহণ করে? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পীড়ন ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াও কৌশিকের মৌনরক্ষা করা উচিত ছিল। তাহাতেও আমরা সম্পূর্ণ অমুমোদন করি। তবে জিজ্ঞাস্য এই, ঈদৃশ ধর্ম্ম পৃথিবীতে সাধারণতঃ চলিবার সম্ভাবনা আছে কি না? ইহাতে সাংখ্যপ্রবচনকারের একটি সূত্র আমাদের মনে পড়িল। মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, “নাশকোপদেশবিম্লিরূপদিষ্টেই প্যহুপদেশঃ।” * এরূপ ধর্ম্মপ্রচার চেষ্টা নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়। যদি সফল হয়, মানবজাতির পরম সৌভাগ্য।

কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয়। কথাটা এই যে, যদি একান্তই কথা কহিতে হয়

অবশ্য কুজিতব্যো বা শব্দেন বাপ্যকুজতঃ।

তাহা হইলে কি করিবে? সত্য বলিয়া জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায়তা করিবে? যিনি এইরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝেন, তাঁহার ধর্ম্মবাদ যথার্থই হউক, অযথার্থই হউক, নিতান্ত নৃশংস বটে।

প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণোক্ত এই নীতির একটি ফল এমন হয় যে হত্যাকারীর জীবনরক্ষার্থ মিথ্যা শপথ করাও ধর্ম্ম। যিনি এরূপ আপত্তি করিবেন, তিনি

এই সত্যতত্ত্ব কিছুই বুঝেন নাই। হত্যাকারীর দণ্ড মনুষ্যজীবন রক্ষার্থ নিত্যান্ত প্রয়োজনীয়, নহিলে যে বাহাকে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে। অতএব হত্যাকারীর দণ্ডই ধর্ম; এবং তাহার রক্ষার্থ যে মিথ্যা বলে, সে অধর্ম করে।

কুক্ষোক্ত এই সত্যতত্ত্ব নির্দোষ এবং মনুষ্যসাধারণের অবলম্বনীয় কি না, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে প্রস্তুত নহি। তবে কৃষ্ণচরিত্র বুঝাইবার জন্য উহা পরিস্ফুট করিতে আমি বাধ্য। কিন্তু ইহাও বলিতে আমি বাধ্য যে, পাশ্চাত্যেরা যে কারণে বলেন যে সত্য সকল সময়েই সত্য, কোন অবস্থাতেই পরিহার্য্য নহে, তাহার মূলে একটা গুরুতর কথা আছে। কথাটা এই যে, ইহাই যদি ধর্ম—সত্য যেখানে মনুষ্যের হিতকারী সেইখানেই ধর্ম, আর যেখানে মনুষ্যের হিতকারী নয় সেখানে অধর্ম, ইহাই যদি ধর্ম হয়, তাহা হইলে মনুষ্যজীবন এবং মনুষ্যসমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে,—যে লোকহিত তোমার উদ্দেশ্য, তাহা ডুবিয়া যায়। অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হইলে, সত্য অবলম্বনীয়, বা মিথ্যা অবলম্বনীয়, এ কথার মীমাংসা কে করিবে? যে সে মীমাংসা করিবে। যে সে মীমাংসা করিতে বসিলে, মীমাংসা কখন ধর্মামুসমানিত হইতে পারে না। শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি, অনেকেরই অতি সামান্য; কাহারও সম্পূর্ণ নহে। বিচারশক্তি অধিকাংশেরই আদৌ অল্প, তার উপর ইঞ্জিয়ার বেগ, স্নেহ মমতার বেগ, ভয়, লোভ, মোহ, ইত্যাদির প্রকোপ। সত্য নিত্যপালনীয়, এরূপ ধর্মব্যবস্থা না থাকিলে, মনুষ্যজাতি সত্যশূন্য হইবারই সম্ভাবনা।

প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা যে তাহা বুঝিতেন না এমত নহে। বুঝিয়াই তাঁহারা বিশেষ করিয়া বিধান করিয়া দিয়াছেন, কোন কোন সময়ে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। প্রাণাত্যায়ে ইত্যাদি সেই বিধি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। মনু, গৌতম, প্রভৃতি ঋষিদিগেরও মতও সেই প্রকার। তাঁহারা যে কয়টি বিশেষ বিধি বলিয়াছেন, তাহা ধর্মামুসমত কি না, তাহার বিচারে আমার প্রয়োজন নহে। কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব পরিস্ফুট করাই আমার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণও আধুনিক ইউরোপীয়দিগের গ্রন্থ বুঝিয়াছিলেন যে, বিশেষ বিধি ব্যতীত, এই সাধারণ বিধি কার্য্যে পরিণত করা, সাধারণ লোকের পক্ষে অতি দুষ্কর। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় প্রাণাত্যায়ে প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ অবস্থা নির্দেশ করিলেই লোককে ধর্মামুসমত সত্যচরণ বুঝান যায় না। তিনি তৎপরিবর্তে কি জন্ত, এবং কিরূপ অবস্থায় সাধারণ বিধি উল্লঙ্ঘন করা উচিত তাহাই বলিতেছেন। আমরা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতেছি।

দান, তপ, শৌচ, আর্জব, সত্য প্রভৃতি অনেকগুলি কার্যকে ধর্ম বলা যায়। ইহার সকলগুলিই সাধারণতঃ ধর্ম, আবার সকলগুলিই অবস্থা বিশেষে অধর্ম। অল্পপণ্ডিত প্রয়োগ বা ব্যবহারই অধর্ম। দান সম্বন্ধে উদাহরণ প্রয়োগ পূর্বক বলিতেছেন, “সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে ধন দান করা কদাপি কর্তব্য নহে। পাপাশ্রদিগকে ধন দান করিলে অধর্মাচরণ নিবন্ধন দাতারও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়।” সত্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। ঐকৃষ্ণ তাহার যে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন তাহার একটি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একটি এই;

“যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্য স্বরূপ হয়।”

ইহা ভিন্ন প্রচলিত ধর্মশাস্ত্র হইতে প্রাণাত্যয়ে বিবাহে ইত্যাদি কথা পুনরুক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব এইরূপ। ইহার স্থূল তাৎপর্য এইরূপ বুঝা গেল যে,

১। যাহা ধর্মামুসারিত তাহাই সত্য, যাহা ধর্মবিরুদ্ধ তাহা অসত্য।

২। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম।

৩। অতএব যাহাতে লোকের হিত তাহাই সত্য। যাহা তদ্বিরুদ্ধ তাহা অসত্য।

৪। এইরূপ সত্য সর্বদা সর্বস্থানে প্রযোজ্য।

কৃষ্ণভূক্ত বলিতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সত্যতত্ত্ব কোথাও কথিত হইয়াছে, এমন যদি দেখাইতে পার, তবে আমরা কৃষ্ণের মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। যদি তাহা না পার, তবে ইহাই আদর্শমন্ত্ৰোচিত বাক্য বলিয়া স্বীকার কর।

উপসংহারে আমরা ইহাও বক্তব্য যে, “যদ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম, আমরা যদি ভক্তি সহকারে এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দুধর্মের মূলস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহা হইলে, যে উপধর্মের ভ্রমরাশি মধ্যে, পবিত্র এবং জগতে অতুল্য হিন্দুধর্ম প্রোথিত হইয়া আছে, তাহা অনল্পকালে কোথায় উড়িয়া যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কৃত্রিয়া, অনর্থক সামর্থ্যব্যয়, ও নিষ্ফল কালাতিপাত, দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সংকর্ম ও সদমুষ্ঠানে হিন্দুসমাজ প্রভাবিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভণ্ডামি, জাতি মারামারি, পরস্পরের বিদ্বেষ ও অনিষ্টচেষ্টা আর থাকে না। আমরা মহতী কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া, শূলপাণি ও রঘুনন্দনের পদানত—লোকহিত পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ত্ব মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি

আটাইশ ত্বের কচকচিতে মন্ত্রমুগ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন জাতি অধঃপাতে যাইবে? যদি এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু একত্রিত হইয়া, নমো ভগবতে বাহুদেবায় বলিয়া কৃকপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, তত্পাদিষ্ট এই লোকহিতাত্মক ধর্ম গ্রহণ করিব।* তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধিত করিতে পারিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কর্ণবধ

অর্জুন কৃকের কথা বুঝিলেন, কিন্তু অর্জুন কত্রিয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্ত ব্যাকুল। অতএব বাহাতে হই দিক্ রক্ষা হয়, কৃককে তাহার উপায় অবধারণ করিতে বলিলেন।

কৃক বলিলেন, অপমান মাননীয় ব্যক্তির মৃত্যুরূপ। তুমি যুধিষ্ঠিরকে অপমান-সূচক একটা কথা বল, তাহা হইলেই, তাঁহাকে বধ করার তুল্য হইবে। অর্জুন তখন যুধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক বাক্যে ভৎসিত করিলেন। কিন্তু কৃককে আবার এক বিপদে ফেলিলেন। বলিলেন, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমানিত করিয়া গুরুতর পাপ করিয়াছি, অতএব আত্মহত্যা করিব। এই বলিয়া আবার অসি নিক্ষেপিত করিলেন। কৃক তাঁহারও মৃত্যুর সোজা ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন, আত্মপ্লাঘা সঙ্কনের মৃত্যুরূপ। কথাটা কিছু মাত্র অস্থায় নহে। অর্জুন তখন অনেক আত্মপ্লাঘা করিলেন। তখন সব গোল মিটিয়া গেল।

কৃক, অর্জুনের সারথি, কিন্তু যেমন অর্জুনের অশ্বের যন্তা, তেমনি এখন স্বয়ং অর্জুনেরও নিয়ন্তা। কখনও অর্জুনের আজ্ঞায় কৃক রথ চালান, কখনও কৃকের আজ্ঞায় অর্জুন চলেন। এখন কৃক, অর্জুনকে কর্ণবধে নিযুক্ত করিলেন।

এই কর্ণবধ মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা। বহুকাল হইতে ইহার সূত্রপাত হইয়া আসিতেছে। কর্ণই অর্জুনের প্রতিযোগী। ভীমার্জুন নকুল সহদেব চারি জনে যুধিষ্ঠিরের জন্ত দিবিজয় করিয়াছিলেন, কর্ণ একাই চূর্যোধনের জন্ত দিবিজয় করিয়াছিল।

* বেহামের কথা ইংলণ্ড তুলিল—কৃকের কথা ভারতবর্ষ তুলিবে না?

অর্জুন জ্যোতের শিষ্য, কর্ণ জ্যোতগুরু পরশুরামের শিষ্য। অর্জুনের যেমন গাভীৰ ধনু ছিল, কর্ণের তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিজয় ধনু ছিল। অর্জুনের কৃষ্ণ সারথি, মহাবীর লন্য কর্ণের সারথি, উভয়ে অনেক দিব্যাস্ত্রে শিক্ষিত। উভয়েই পরস্পরের বধের জন্য বহুদিন হইতে প্রতিক্ষাত। অর্জুন ভীষ্মজ্যোতবধে কিছুমাত্র যত্নশীল ছিলেন না, কর্ণবধে তাঁহার দৃঢ় বদ্ধ। কুন্তী যখন কর্ণকে কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত অবগত করিয়া, তাঁহার নিকট আর পাঁচটি পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন, তখন কর্ণ যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেবের প্রাণ ভিক্ষা মাতাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই অর্জুনের প্রাণ ভিক্ষা দিলেন না। তাঁহাকে বধ করিবেন, না হয় তাঁহার হস্তে নিহত হইবেন, ইহা নিশ্চিত জানাইলেন।

সেই মহাযুদ্ধে অস্ত্র অর্জুনকে কৃষ্ণ লইয়া যাইলেন। ইহারই জন্ম কৃষ্ণ অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে লইয়া আসিয়াছিলেন। ভীম অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের সন্ধানে যাইতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রণ শেষ না করিয়া অর্জুনের আসিতে ইচ্ছা ছিল না। কৃষ্ণ জিদ করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত যে কর্ণ ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হউন, অর্জুন ততক্ষণ বিজ্ঞান লাভ করিয়া পুনস্তেজস্বী হউন। এক্ষণে যুদ্ধে লইয়া যাইবার সময়ে আরও অর্জুনের তেজোবৃদ্ধি জন্ম অর্জুনের বীরত্বের প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহার পূর্বকৃত অতিদুর্দ্বন্দ্ব কার্য্য সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন। জ্যোতদীর অপমান, অভিমম্বার অস্থায়ীযুদ্ধে হত্যা প্রভৃতি কর্ণকৃত পাণ্ডবগীড়ন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন। এই বক্তৃতার মধ্য হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য, কৃষ্ণ বলিতেছেন, “পূর্বের বিষ্ণু যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন,” “পূর্বের দানবগণ বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইলে” ইত্যাদি বাক্যে বুঝিতে পারি যে, কৃষ্ণ এখনও আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিচয় দেন না। দেবদেব কোন অধিকার প্রকাশ করেন না, ইহা প্রথম স্তরের একটি লক্ষণ। দ্বিতীয় স্তরে, অস্ত্র ভাব।

পরে কর্ণাৰ্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহার বর্ণনায় আমার প্রয়োজন নাই। কথিত হইয়াছে যে, কর্ণের সর্পবাণ হইতে কৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অর্জুন উহার নিবারণ করিতে পারেন নাই, অতএব কৃষ্ণ পদাঘাতে অর্জুনের রথ ভূমিতে কিঞ্চিৎ বসাইয়া দিলেন, অশ্বগণ জাহ্নু পাতিয়া পড়িয়া গেল। অর্জুনের মস্তক বাঁচিয়া গেল; কেবল কিরীট কাটা পড়িল। অর্জুন নিজে মস্তক অবনত করিলেও সেই কল হইত। কথাটা সমালোচনার যোগ্য নহে। তবে কৃষ্ণের সারথ্যের প্রশংসা মহাভারতে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়।

যুদ্ধের শেষভাগে কর্ণের রথচক্র মাটিতে বসিয়া গেল। কর্ণ তাহা তুলিবার জন্য মাটিতে নামিলেন। যতক্ষণ রথচক্রের উদ্ধার না করেন, ততক্ষণ জন্তু অর্জুনের কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অর্জুনও ক্ষমা করিয়াছিলেন দেখা যাইতেছে, কেন না কর্ণ তাহার পর আবার রথে উঠিয়া পূর্ববৎ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণের দুর্ভাগ্য যে ক্ষমা প্রার্থনা কালে তিনি অর্জুনকে এমন কথা বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মত: তিনি ঐ সময়ের জন্ত কর্ণকে ক্ষমা করিতে বাধ্য; কৃষ্ণ অধর্ম্মের শাস্ত। তিনি কর্ণকে তখন বলিলেন,

“হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে; আপনাদিগের দুর্ভিক্ষের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, দুর্ঘোষন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতাম্বলারে একবস্ত্রা জ্যোপদীয়ে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন দুই শকুনি দুর্বভিসন্ধি পরতন্ত্র হইয়া তোমার অহমোদনে অন্ধকৌড়ায় নিত্য অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্ঘোষন তোমার মতাম্বলারী হইয়া ভীমসেনকে বিষায় ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহ মধ্যে প্রস্থপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নিপ্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বলীভূতা বজ্রশলা জ্যোপদীয়ে, হে কৃষ্ণ! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাখত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অস্ত্র পতিয়ে বরণ কর, এই কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনাধ্য ব্যক্তির ঠাহারে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয় পূর্বক পাণ্ডবগণকে দ্যুতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণ সমবেত হইয়া বালক অভিমুখ্যারে পরিবেষ্টন পূর্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকালে অধর্ম্মাহুষ্ঠান করিয়াছ, তখন আর এ সময় ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া তালুদেশ শুদ্ধ করিলে কি হইবে? তুমি যে এখন ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও জীবন সত্ত্বে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্বে নিষধ দেশাধিপতি নল যেমন পুরুষ দ্বারা দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও তুচ্ছবেলোমদিগের সহিত শক্রগণকে বিনাশ করত রাজ্যলাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রজনয়গণ অবশ্যই ধর্ম্মসংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে।”

কৃষ্ণের কথা শুনিয়া কর্ণ লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। তার পর পূর্বমত যুদ্ধ করিয়া, অর্জুনবাণে নিহত হইলেন।



অষ্টম পরিচ্ছেদ

হুঘোদনবধ

কর্ণ মরিলে, হুঘোদন শল্যকে সেনাপতি করিলেন। পূর্বদিনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়া কাপুরুষতা-কলঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ কলঙ্ক অপনীত করা নিতান্ত আবশ্যক। সর্বদর্শী কৃষ্ণ আভিকার প্রধান যুদ্ধে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও সাহস করিয়া শল্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন।

সেই দিন সমস্ত কৌরবদৈত্য পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিহত হইল। হুই জন ব্রাহ্মণ, কৃপ ও অশ্বখামা, যজ্ঞবল্কীর কৃতবর্ষা এবং অমর হুঘোদন, এই চারি জন মাত্র জীবিত রহিলেন। হুঘোদন পলাইয়া গিয়া বৈশ্যপান হ্রদে ডুবিয়া রহিল। পাণ্ডবগণ খুঁজিয়া সেখানে তাঁহাকে ধরিল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে তাঁহাকে মারিল না।

যুধিষ্ঠিরের চিরকাল স্থূলবুদ্ধি, সেই স্থূলবুদ্ধির জন্তই পাণ্ডবদিগের এত কষ্ট। তিনি এই সময়ে সেই অপূর্ব বুদ্ধির বিকাশ করিলেন। তিনি হুঘোদনকে বলিলেন, “তুমি অতীষ্ট আয়ুধ গ্রহণপূর্বক আমাদের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থানপূর্বক যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি যে, তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমুদায় রাজ্য তোমার হইবে।” হুঘোদন বলিলেন, আমি গদাযুদ্ধ করিব। কৃষ্ণ জানিতেন, গদাযুদ্ধে ভীম ব্যতীত কোন পাণ্ডবই হুঘোদনের সমকক্ষ নহে। হুঘোদন অশ্রু কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধে আহূত করিলে, পাণ্ডবদিগের আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কিছু বলিলেন না, সকলেই বলদৃষ্ট; যুধিষ্ঠিরকে ভৎসনার ভার কৃষ্ণই গ্রহণ করিলেন। সেই কার্য্য তিনি বিশিষ্ট প্রকারে নির্বাহ করিলেন।

হুঘোদনও অতিশয় বলদৃষ্ট, সেই দর্পে যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধির দোষ সংশোধন হইল। হুঘোদন বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সকলকেই বধ করিব। তখন ভীমই গদা লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

এখানে আবার মহাভারতের সুর বদল। আঠার দিন যুদ্ধ হইয়াছে, ভীম হুঘোদনই সর্বদাই যুদ্ধ হইয়াছে, গদাযুদ্ধও অনেকবার হইয়াছে, এবং বরাবরই হুঘোদনই গদাযুদ্ধে ভীমের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ সুর উঠিল যে, ভীম গদাযুদ্ধে

হৃষ্যোদনের তুল্য নহে। আজ ভীম পরাক্রান্তপ্রায়। আসল কথাটা ভীমের সেই দারুণ প্রতিজ্ঞা। সভাপার্বের যখন দ্যুতজ্বীভার পর, হৃষ্যোদন জ্যোপদীকে জিভিয়া লইল তখন হুঃশাসন একবজ্রা রজঃখলা জ্যোপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে আনিয়া বিবজ্রা করিতেছিলেন, তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি হুঃশাসনকে বধ করিয়া তাহার বুক চিরিয়া রক্ত খাইব। ভীম মহাশাসনতুল্য বিকট রণস্থলে হুঃশাসনকে নিহত করিয়া রাক্ষসের মত তাহার তণ্ডুশোণিত পান করিয়া, সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, আমি অমৃত পান করিলাম। হৃষ্যোদন সেই সভামধ্যে “হাসিতে হাসিতে জ্যোপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ বসন উত্তোলন পূর্বক সর্বলক্ষণ সম্পন্ন বজ্রতুল্য দৃঢ় কমলীমণ্ড ও করিকণ্ডের ভ্রামরীয় মধ্য উরু তাঁহাকে দেখাইলেন।” তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে এই উরু যদি ভগ্ন না করি, তবে আমি যেন নরকে যাই।

আজি সেই উরু গদাঘাতে ভাঙিতে হইবে। কিন্তু একটা তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধক—গদাযুদ্ধের নিয়ম এই যে নাভির অধঃ গদাঘাত করিতে নাই—তাহা হইলে অস্ত্রায় বৃদ্ধ করা হয়। শ্রায়যুদ্ধে ভীম হৃষ্যোদনকে মারিতে পারিলেও, প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে না।

যে জ্যেষ্ঠতাতপুত্রের হৃদয়কবির পান করিয়া নৃত্য করিয়াছে, সে রাক্ষসের কাছে মাথায় গদাঘাত ও উরুতে গদাঘাতে তকাৎ কি? যে বৃকোদর জ্যোপভয়ে মিথ্যাপ্রবন্ধনার সময়ে প্রধান উত্তোঙ্গী বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন, তিনি উরুতে গদাঘাতের ক্ষমতা অস্ত্রের উপদেশসাপেক্ষ হইতে পারেন না। কিন্তু সেরূপ কিছু হইল না। ভীম উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন। বলিয়াছি দ্বিতীয় স্তরের কবি (এখানে তাঁহারই হাত দেখা যায়) চরিত্রের সুসঙ্গতি রক্ষণে সম্পূর্ণ অমনোযোগী। তিনি এখানে ভীমের চরিত্রের কিছুমাত্র সুসঙ্গতি রাখিলেন না; অর্জুনেরও নহে। ভীম ভুলিয়া গেলেন যে, উরুভঙ্গ করিতে হইবে; আর যে পরমধার্মিক অর্জুন, জ্যোপবধের সময়, তাঁহার অস্ত্রগুরু, ধর্মের আচার্য্য, সখা, এবং পরমশ্রদ্ধার পাত্র কৃষ্ণের কথাতেও মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, তিনি এক্ষণে স্বেচ্ছাক্রমে অস্ত্রায়যুদ্ধে ভীমকে প্রবর্তিত করিলেন। কিন্তু কথাটা কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন না হইলে, কবির উদ্দেশ্য সফল হয় না। অতএব কথাটা এই প্রকারে উঠিল—

অর্জুন ভীম-হৃষ্যোদনের যুদ্ধ দেখিয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহাদিগের মধ্যে গদাযুদ্ধে কে জ্যেষ্ঠ। কৃষ্ণ বলিলেন, ভীমের বল বেশী, কিন্তু হৃষ্যোদনের গদাযুদ্ধে যন্ত্র ও নৈপুণ্য অধিক। বিশেষ যাহারা প্রথমতঃ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায় সমরে শত্রুগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে জীবিতনিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে

হইবে। জীবিতাশানিরপেক্ষ হইয়া সাহসসহকারে বুদ্ধ করিলে, সংগ্রামে সে বীরকে কেহই পরাস্তব করিতে পারে না। অতএব যদি ভীম হৃষ্যোধনকে অস্ত্রায়ুদ্ধে সংহার না করেন, তবে হৃষ্যোধন জয়ী হইয়া যুধিষ্ঠিরের কথামত পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিবে।

কৃষ্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া অর্জুন “স্বীয় বামজামু আঘাত করতঃ ভীমকে সঙ্কেত করিলেন।” তার পর ভীম হৃষ্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন।

যেমন জ্ঞান ঈশ্বরপ্রেরিত, অস্ত্রায়ও তেমনি ঈশ্বরপ্রেরিত। ইহাই এখানে দ্বিতীয় স্তরের কবির উদ্দেশ্য।

বুদ্ধকালে দর্শকমধ্যে, বলরাম উপস্থিত ছিলেন। ভীম ও হৃষ্যোধন উভয়েই গদাযুদ্ধে তাঁহার শিষ্য। কিন্তু হৃষ্যোধনই প্রিয়তর। রেবতীবল্লভ সর্ব্বদাই হৃষ্যোধনের পক্ষপাতী। এক্ষণে হৃষ্যোধন, ভীম কর্তৃক অস্ত্রায়ুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, লাজল উঠাইয়া তিনি ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। বলা বাহুল্য যে, বলরামের স্বন্ধে সর্ব্বদাই লাজল, এই জন্ত তাঁহার নাম হলধর। কেন তাঁহার এ বিড়ম্বনা যদি কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিব না। যাই হউক, কৃষ্ণ বলরামকে অমুনয় বিনয় করিয়া কোনরূপে শাস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। বলরাম কৃষ্ণের কথায় সন্তুষ্ট হইলেন না। রাগ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তার পর একটা বীড়ৎস ব্যাপার উপস্থিত হইল। ভীম, নিপাতিত হৃষ্যোধনের মাথায় পদাঘাত করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠির নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীম তাহা শুনে নাই। কৃষ্ণ তাঁহাকে এই কর্ণাঘাত আচরণে নিবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ না করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিলেন। এদিকে, পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ হৃষ্যোধনের নিপাত জন্ত ভীমের বিস্তর প্রশংসা ও হৃষ্যোধনের প্রতি কটুক্তি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন,

“মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাণ্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।”

কৃষ্ণের এই সকল কথা কৃষ্ণের জ্ঞান আদর্শ পুরুষের উচিত। কিন্তু ইহার পর যাহা গ্রহণযোগ্য পাই তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার।

প্রথম আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ অস্ত্রকে বলিলেন, “মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাণ্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।” কিন্তু ইহা বলিয়াই নিজে হৃষ্যোধনকে কটুক্তি করিতে লাগিলেন।

হৃষ্যোধনের উত্তর দ্বিতীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার। হৃষ্যোধন তখনও মরেন নাই, তদ্ব্যতীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের কটুক্তি শুনিয়া কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন,

“হে কংসদাসতনয়! ধনতর তোমার বাক্যাহ্বানে বুকোদয়কে আমার উরু ভর করিতে লক্ষিত করাত্তে ভীষণেন অধর্ম যুদ্ধে আমারে নিপাতিত করিয়াছে, ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না। তোমার অন্তর উপায় বারাই প্রতিদিন ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র নরপতি নিহত হইয়াছেন।* তুমি শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া পিতামহকে নিপাতিত করিয়াছ।† অশ্বখামা নামে গজ নিহত হইলে তুমি কৌশলেই আচার্য্যকে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে দুরাশ্বা বৃষ্টদ্বয় তোমার সমক্ষে আচার্য্যকে নিহত করিতে উত্তত হইলে তাহার নিবেদন কর নাই।‡ কর্ণ অর্জুনের বিনাশার্থ বহুদিন অতি যত্নসহকারে যে শক্তি রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশল ক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া, বার্ষ্য করাইয়াছ।§ সাত্যকি তোমারই প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া হিরণ্য প্রায়োগবিষ্ট কুরিঞ্জবাসে নিহত করিয়াছিলেন।¶ মহাবীর কর্ণ অর্জুনবধে সমুত্তত হইলে, তুমি কৌশলক্রমে তাহার সর্পবাণ বার্ষ্য করিয়াছ।’ এবং পরিশেষে সূতপুত্রের রথচক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধাবের নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইলে তুমি কৌশলক্রমে অর্জুন বারা তাহার বিনাশ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছ।’ অতএব তোমার তুল্য পাশায়া, নির্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে? দেখ তোমরা যদি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত স্ত্রায়যুদ্ধ করিতে তাহা হইলে কদাপি জয়লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার অনার্য্য উপায় প্রভাবেই আমরা অধর্মানুগত পাণ্ডিগণের সহিত নিহত হইলাম।”

এই বাক্যপরম্পরা সম্বন্ধে আমি যে কয়েকটি ফুটনোট দিলাম, পাঠকের তৎপ্রতি মনোযোগ করিতে হইবে। বাক্যগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ সম্পূর্ণ মিথ্যা তিরস্কার মহাত্মারতে আর কোথাও নাই। তাহাই বলিতেছিলাম যে হর্ষোদ্বোধনের উত্তর আশ্চর্য্য।

তৃতীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ ইহার উত্তর করিলেন। পূর্বে দেখিয়াছি তিনি গম্ভীরপ্রকৃতি ও ক্ষমাশীল, কাহারও কৃত তিরস্কারের উত্তর করেন না। সভামধ্যে শিশুপালকৃত অসহ্য নিন্দাবাদ বিনাবাক্যব্যয়ে সহ্য করিয়াছিলেন। বিশেষ, হর্ষোদ্বোধন এখন সুস্বর্ণ, তাহার কথার উত্তরের কোন প্রয়োজনই নাই; তাহাকে কোন প্রকারে কষ্টক্ৰি

* এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ মহাত্মারতে কোথাও নাই। কোন ভুলেই না।

† কৃষ্ণ ইহার বিন্দুবিসর্গেও ছিলেন না। মহাত্মারতে কোথাও এমন কথা নাই।

‡ শত্রুকে বধ করিতে কেন নিবেদন করিলেন?

§ কৃষ্ণ তৎক্ষণে কোন বধ বা কৌশল করেন নাই। মহাত্মারতে ইহাই আছে যে, কৌরবগণের অনুরোধানুসারেই কর্ণ ঘটোৎকচের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করিলেন।

¶ কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এমন কথা মহাত্মারতে কোথাও নাই। সাত্যকি, কুরিঞ্জবাসে নিহত করিয়াছিলেন বটে। কৃষ্ণ যখন হিরণ্য কুরিঞ্জবাসে নিহত করিতে নিবেদন করিয়াছিলেন।

১ সে কৌশল, নির্গণ্যবলে রথচক্র ভূপ্রোথিত করা। এ উপায় অতি ভাব্য, এবং সারথির ধর্ম, সখীর রক্ষা।

২ কি কৌশল? মহাত্মারতে এ সম্বন্ধে কৃষ্ণকৃত কোন কৌশলের কথা নাই। যুদ্ধে অর্জুন কর্ণকে নিহত করিয়াছিলেন, ইহাই আছে।

করা কৃষ্ণ নিজেই নিলবীর বিবেচনা করেন। তথাপি কৃষ্ণ হৃষ্যোদনকৃত তিরস্কারের উত্তরও করিলেন, এবং কট্টক্ৰিও করিলেন। উত্তরে হৃষ্যোদনকৃত পাপাচার সকল বিবৃত করিয়া উপলংহায়ে বলিলেন, “বিস্তর অকাব্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তাহার কলতোণ কর।”

উত্তরে হৃষ্যোদন বলিলেন, “আমি অধ্যয়ন, বিধিপূর্বক মান, সঙ্গাগরা বনুজরার শাসন, বিপক্ষগণের মন্তকোপরি অবস্থান, অস্ত্র ভূপালের হুল্লভ দেবভোগ্য স্তম্ভসত্তোগ, ও অত্যন্তকষ্ট ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছি, পরিশেষে ধর্মপরায়ণ কত্রিয়গণের প্রার্থনীয় সমরযুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে হইবে? এক্ষণে আমি আত্মবর্গ ও বক্রবাক্যবগণের সহিত অর্গে চলিলাম, তোমরা শোকাকুলিতচিত্তে মৃতকল্প হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।”

এই উত্তর আশ্চর্য্য নহে। যে সর্বস্বপণ করিয়া হারিয়াছে, সে যদি হৃষ্যোদনের মত দাস্তিক হয়, তবে সে যে জয়ী শত্রুকে বলিবে আমিই জিতিয়াছি, তোমরা হারিয়াছ, ইহা আশ্চর্য্য নহে। হৃষ্যোদন এইরূপ কথা হৃদে থাকিয়াও বলিয়াছিল। যুদ্ধে মরিলে যে স্বর্গ লাভ হয়, সকল কত্রিয়ই বলিত। উত্তর আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু উত্তরের কল সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। এই কথা বলিবা মাত্র “আকাশ হইতে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সিন্ধবর্গগণ স্তম্ভুর বাদিভবাদন ও অঙ্গরা সকল রাজা হৃষ্যোদনের যশোগান করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধগণ তাঁহারে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্ধসম্পন্ন স্তম্ভস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দিগ্‌মণ্ডল ও নভোমণ্ডল স্তম্ভমূল হইল। তখন বান্দেবপ্রমুখ পাণ্ডবগণ সেই হৃষ্যোদনের সম্মানমুচক অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন। এবং তাঁহারা ভীষ্ম জ্যেষ্ঠ কর্ণ ভুরিষ্রবারে অধর্ম্ম যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন এই কথা শ্রবণ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।”

যিনি মহাভারতের সর্ব পাপাত্মার অধম পাপাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহার এরূপ অদ্ভুত সম্মান ও সাধুবাদ, আর বাঁহারা সকল ধর্ম্মাত্মার জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের এই অধর্ম্মাচরণ জন্ত লজ্জা, মহাভারতে আশ্চর্য্য। সিদ্ধগণ, অঙ্গরোগণ, দেবগণ মিলিয়া প্রকটিত করিতেছেন, হুরাছা হৃষ্যোদন ধর্ম্মাত্মা, আর কৃষ্ণপাণ্ডব মহাপাপিষ্ঠ। ইহা মহাভারতে আশ্চর্য্য, কেন না ইহা সমস্ত মহাভারতের বিরোধী। সিদ্ধগণাদি দূরে থাক, কোন মনুষ্য দ্বারা এরূপ সাধুবাদ মহাভারতে আশ্চর্য্য বলিয়া বিবেচ্য, কেন না মহাভারতের উদ্দেশ্যই হৃষ্যোদনের অধর্ম্ম ও কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের ধর্ম্ম কীর্তন।

মসের উপর মসের কথা, তাহার হৃষ্যোদন-মুখে শুনিলেন যে, তাহার ভীষ্ম, জোশ, কৰ্ণ ও ভূরিজ্ঞবাকে অধর্মবুদ্ধে বধ করিয়াছেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এত কাল তাহার কিছু জানিতেন না, এখন পরম শত্রুর মুখে জানিয়া, ভক্তলোকের মত, শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার জানিতেন যে, ভীষ্ম বা কৰ্ণকে তাহার কোন প্রকার অধর্ম করিয়া মারেন নাই, কিন্তু পরম শত্রু হৃষ্যোদন বলিতেছে, তোমরা অধর্ম করিয়া মারিয়াছ, কাজেই তাহাতে অবশ্য বিশ্বাস করিলেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার জানিতেন যে ভূরিজ্ঞবাকে তাহার কেহই বধ করেন নাই—সত্যকি করিয়াছিলেন, সাত্যকিকে বরং কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীম নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি বধন পরমশত্রু হৃষ্যোদন বলিতেছে, তোমরাই মারিয়াছ, আর তোমরাই অধর্মাচরণ করিয়াছ, তখন গোবেচার পাণ্ডবেরা অবশ্য বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে তাহারাই মারিয়াছেন, এবং তাহারাই অধর্ম করিয়াছেন; কাজেই তাহার ভক্তলোকের মত কাদিতে আরম্ভ করিলেন। এ ছাি ভ্রম মাথামুণ্ডের সমালোচনা বিভূষণা মাত্র। তবে এ হতভাগ্য দেশের লোকের বিশ্বাস যে বাহা কিছু পুঁথির ভিতর পাওয়া যায়, তাহাই ঋষিবাণ্য, অশ্রান্ত, শিরোধার্য। কাজেই এ বিভূষণা স্বেচ্ছাপূর্বক আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

আশ্চর্য্য কথাগুলো এখনও শেষ হয় নাই। কৃষ্ণ ত বড় অধর্মাচরণ জন্ত লজ্জিত হইলেন, আবার সেই সময়ে অত্যন্ত নিলজ্জ ভাবে পাণ্ডবদিগের কাছে সেই পাপাচরণ জন্ত আত্মদ্বা করিতে লাগিলেন।*

বলা বাহুল্য যে হৃষ্যোদনকৃত তিরস্কারাদি বৃদ্ধান্ত সমস্তই অমৌলিক। জোশবধাদি যে অমৌলিক, তাহা আমি পূর্বে প্রমাণীকৃত করিয়াছি। বাহা অমৌলিক, তাহার প্রসঙ্গ যে অংশে আছে তাহাও অবশ্য অমৌলিক। কেবল এতটুকু বলা আবশ্যক যে এখানে

* যথা, "ভীষ্মপ্রবৃৎ মহারথশল ও রাজা হৃষ্যোদন অনাধারন সমর বিশারদ ছিলেন, তোমরা কখন তাহাদিগকে ধর্মবুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। আমি কেবল তোমাদের হিতাহুতানপরতর হইরা অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মারামল প্রকাশ পূর্বক তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। আমি যদি ঐরূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম তাহা হইলে তোমাদিগের অসংখ্য রাজ্যলাভ ও অর্ঘলাভ কখনই হইত না। দেখ, ভীষ্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা কুমন্ত্রণে অতিরিক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। লোক-পালন সময়েই হইয়াও তাহাদিগকে ধর্ম বুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ সময়ে অপরিজ্ঞাত গদাধারী এই হৃষ্যোদনকে গদাধারী কৃতান্তও ধর্ম বুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন না; অতএব ভীম যে উহারে অসং উপায় অবলম্বন পূর্বক নিপাতিত করিয়াছেন, সে কথা আর আলোচন করিবার আবশ্যক নাই। এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে কুট বুদ্ধে বিনাশ করিবে। মহাত্মা সরগণ কুট বুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াই অস্ত্ররণকে নিহত করিয়াছিলেন; তাহাদের অনুকরণ করা সকলেরই কর্তব্য।" এমন নিলজ্জ অধর্ম আর কোথাও শুনা যায় না।

বিভিন্ন ভরের কবিরও লেখনী ছিল দেখা যায় না। এ ভূতীয় ভরের বলিয়া দেখি করা যায়। বিভিন্ন ভরের কবি কৃষ্ণভক্ত, এই লেখক কৃষ্ণদেবক। শৈবানি অবৈক্য বা বৈক্যবৈবিক্যও স্থানে স্থানে মহাভারতের কলেবর বাড়াইয়াছেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তাহারই কেহ এখানে প্রকাশ, ইহাই সম্ভব। আবার এ কাজ কৃষ্ণভক্তের, ইহাও অসম্ভব নহে। নিন্দাক্ষরে প্রতি করা ভারতবর্ষীয় কবিদের একটা বিচার মধ্যে।* এ জাতি হইতে পারে।

সে যাই হউক, ইহার পরেই আবার দেখিতে পাই যে, হর্ষোদন অশ্বখামার নিকট বলিতেছেন, “আমি অনিত্যতেনা বাহুদেবের সাহায্য বিলক্ষণ অবগত আছি। তিনি আমাকে ক্রিয় ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করেন নাই। অতএব আমার জন্ত শোক করিবার প্রয়োজন কি?”

এমন বারোইয়ারি কাণ্ডের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা নয়?

নবম পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধশেষ

অজ্ঞায় যুদ্ধে হর্ষোদন হত হইয়াছে বলিয়া যুধিষ্ঠিরের ভয় হইল যে, তপঃপ্রভাব-শালিনী গান্ধারী স্ত্রিয়া পাণ্ডবদিগকে ভয় করিয়া ফেলিবেন। এ জন্ত তিনি কৃষ্ণকে অমুরোধ করিলেন যে, তিনি হস্তিনায় গমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শাস্ত করিয়া আসুন।

কথাটা প্রথম স্তরের নয়, কেন না এখানে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন, “তুমি অব্যয়, এবং লোকের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা।” ইহার কিছু পূর্বেই অর্জুনের রথ হইতে

* একটা উদাহরণ না দিলে, অনেক পাঠক বুঝিতে পারিবেন না, মর ভরীভূত হওয়ার পর বিলাপকালে রত্নের মূখে ভারতচন্দ্র বলিতেছেন,

“একের কপালে রহে,

আরের কপালে রহে

আঙনের কপালে আঙন।”

ইহা আঙনকে গালি বটে, কিন্তু একটু ভাবান্তর করিলেই জ্ঞতি, বধা—

“হে অঙ্গে। তুমি শুল্লালটিবিহারী লোকলসকারী, তোমার শিখা আলাবিশিষ্ট হউক।” পাঠক ভারতচন্দ্রপ্রণীত অরবাসমলে দৃষ্টান্ত শিখিন্দ্র দেখিবেন। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধিতে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

কৃষ্ণ অবতরণ করায় যে রথ আসিয়া গিয়াছিল। অর্জুনের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণ বলিলেন, “ব্রহ্মাঙ্গ প্রভাবে পূর্বেই এই রথে আসি সন্দের হইয়াছিল। কেবল আমি উহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া এ কাল পর্যন্ত বন্ধ হয় নাই।” অর্থাৎ আমি দেবতা বা বিষ্ণু। ইহা দ্বিতীয়, বা তৃতীয় স্তর।

কৃষ্ণ হস্তিনার গিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডারীক কিছু বুঝাইলেন। উদ্ধৃত করা বা সমালোচনার যোগ্য কোন কথা নাই।

তার পর, দুর্যোধন অশ্বখামাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু তখন সেনার মধ্যে সেই অশ্বখামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্মা। এইখানে শল্যপর্ব শেষ।

তাহার পর, সৌপ্তিক পর্ব। সৌপ্তিক পর্ব, অতি ভীষণ ব্যাপারে পরিপূর্ণ। প্রথমার্শে অশ্বখামা চোরের মত নিশীথ কালে পাণ্ডবসিবিরে প্রবেষ্ট হইয়া নিজাভিহৃত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, এবং সমস্ত পাকালগণকে, সেনা ও সেনাপতিগণকে বধ করিলেন। পঞ্চ পাণ্ডব ও কৃষ্ণ ভিন্ন পাণ্ডবপক্ষে আর কেহ রহিল না।

বস্তুতঃ এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কুরুপাকালের যুদ্ধ। পাকালের নির্বংশ হইলে যুদ্ধ শেষ হইল।

তাহার পরে, সৌপ্তিক পর্বের একটা ঐষীক পর্বাধ্যায় আছে। অশ্বখামা এই চোরোচিত কার্য্য করিয়া পাণ্ডবদিগের ভয়ে বনে গিয়া লুকায়িত হইলেন। পাণ্ডবেরা পরদিন তাঁহার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। অশ্বখামা ধরা পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ অতি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশিরা অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অর্জুনও তন্নিসারণার্থ ব্রহ্মশিরা অস্ত্রের প্রতিপ্রয়োগ করিলেন। দুই অস্ত্রের তেজে ব্রহ্মাণ্ডধ্বংসের সম্ভাবনা দেখিয়া ঋষিরা মিটমাট করিয়া দিলেন। অশ্বখামা শিরস্থিত সহজমণি কাটিয়া দ্রৌপদীকে উপহার দিলেন। এ দিকে ব্রহ্মশিরা অস্ত্র পাণ্ডববধু উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিল।

এই সকল অনৈসর্গিক ব্যাপার আমরণ ছাড়িয়া দিতে পারি। আমাদের সমালোচনার যোগ্য কৃষ্ণচরিত্র-বচীত কোন কথাই সৌপ্তিক পর্বের নাই।

তার পর জ্ঞীপর্ব। জ্ঞীপর্ব আরও ভীষণ। নিহত বীরবর্গের জ্ঞীগণের ইহাতে আর্দ্রনাদ। এমন ভীষণ আর্দ্রনাদ আর কখন শুনা যায় নাই। কিন্তু কৃষ্ণসদ্বক্ষীয় হইটি কথা মাত্র আছে।

১। ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গন কালে ভীমকে চূর্ণ করিবেন, কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহার জন্ত লৌহভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্ধরাজা তাহাই চূর্ণ করিলেন। অনৈসর্গিক বৃত্তান্ত আমাদের পরিহার্য্য। একজন্ত এ সবক্কে আর কিছু বলিবার নাই।

২। গোমারী কুকের নিকট অনেক বিলাপ করিয়া শেষ কক্ষকেই অভিশপণ করিলেন। বলিলেন :—

“জানিন! যখন কোরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর দণ্ড হই তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত ভবিষ্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিক্ষমণ আছে; তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ব্যাক্যবিদ্যার ও অসাধারণ বলবীৰ্য্যশালী, তথাপি তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক কোরবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব তোমাতে অবশ্যই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। আমি পতিভ্রষ্টা যাবা যে কিছু তপঃসকল করিয়াছি, সেই নিত্যক দুর্লভতপঃপ্রভাবে তোমাতে অভিশাপ প্রদান করিতেছি, যে, তুমি যেমন কোরব ও পাণ্ডবগণের জাতি বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আগনার জাতিবর্গও তোমাকর্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর যষ্টিক্লিষ্ট * বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জাতি ও পুত্রহীন ও বনচারী হইয়া অতি কুংসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরক্ষীগণও ভয়ভংগী মহিলাগণের দ্বারা পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া বিলাপ ও পரிভাণ করিবে।”

কৃষ্ণ, হাসিয়া উত্তর করিলেন, “দেবি! আমা ব্যতিরেকে যজুবংশীয়দিগের বিনাশ করে, এখন আর কেহ নাই। আমি যে যজুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা অনেক দিন অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্যকর্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। যাদবেদা মনুষ্য বা দেবদানবগণেরও বধ্য নহে। সূতরাং তাঁহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন।”

এইরূপে দ্বিতীয় স্তরের কবি মৌসল পর্বের পূর্বসূচনা করিয়া রাখিলেন। মৌসল পর্ব যে দ্বিতীয় স্তরের তাহারও পূর্বসূচনা আমরাও করিয়া রাখিয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ

বিধি সংস্থাপন

এক্ষণে আমরা অতি দ্রুত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধবিবরণ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। কৃষ্ণচরিত্র পুনর্ব্বার সুবিমল প্রভাভাসিত হইতে চলিল। কিন্তু শান্তি ও অমুশাসন পর্বের কৃষ্ণ দৈব বলিয়া স্পষ্টতঃ স্বীকৃত।

যুদ্ধাদির অবশেষে, অগাধবুদ্ধি যুধিষ্ঠির, আবার এক অগাধবুদ্ধির খেলা খেলিলেন। তিনি অর্জুনকে বলিলেন, এত জ্ঞাতি প্রভৃতি বধ করিয়া আমার মনে কোন সুখ নাই—

আমি বনে বাইব, জিকা করিয়া বাইব। অতঃপর বড় রাগ করিলেন—যুধিষ্ঠিরকে অনেক বুঝাইলেন। তখন অতঃপর যুধিষ্ঠিরে বড় ভারি বাদাম্বাদ উপস্থিত হইল। শেষ, ভীষ্ম, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও অরুণ কৃষ্ণ অনেক বুঝাইলেন। হৃৎকলচিত্ত যুধিষ্ঠির কিছুতেই বুঝেন না। দ্রাক্ষ, মারু প্রভৃতি বুঝাইলেন। কিছুতেই না। শেষ কৃষ্ণের কথার মহালমারোহের সহিত হস্তিনা প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণ তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিলেন। সে স্তব জগদীশ্বরের। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিয়া নমস্কার করিলেন। কৃষ্ণ বরকনিষ্ঠ; যুধিষ্ঠির আর কখন তাঁহাকে স্তব বা নমস্কার করেন নাই।

এদিকে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, শরশযায় শয়ান, ভীষ্ম যন্ত্রণায় কাতর, উত্তরাশ্রমের প্রতীক্ষায় শরীর রক্ষা করিতেছেন। তিনি অবিগণ পরিবৃত্ত হইয়া, সর্বময়, সর্বাধার, পরমপুরুষ কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ততিবাক্যে চঞ্চলচিত্ত হইয়া কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদি সঙ্গে লইয়া ভীষ্মকে দর্শন দিতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে যুধিষ্ঠির উপযাচক হইয়া পরশুরামের উপাখ্যান কৃষ্ণের নিকট শ্রবণ করিলেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ অমুমতি করিয়াছিলেন যে, ভীষ্মের নিকট জ্ঞানলাভ কর। ভীষ্ম সর্বধর্মবেত্তা; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্ঞান তাঁহার সঙ্গে যাইবে; তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে সেই জ্ঞান জগতে প্রচারিত হয়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা। এই জন্ত তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভাদিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভীষ্মকেও যুধিষ্ঠিরাদিকে ধর্মোপদেশ দিয়া অমুগৃহীত করিতে আদেশ করিলেন।

ভীষ্ম স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, ধর্ম কর্ম সবই তোমা হইতে; তুমিই সব জ্ঞান; তুমিই যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান কর। আমি আপনি শরশয্যে হইয়া যুযুৎসু ও অত্যন্ত ক্লিষ্ট, আমার বুদ্ধিব্রংশ হইতেছে; আমি পারিয়া উঠিব না। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, আমার বরে তোমার শরাঘাতনিবন্ধন সমস্ত ক্লেশ বিমূরিত হইবে, তোমার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইবে, বুদ্ধি অব্যতিক্রান্ত থাকিবে; তোমার মন কেবল সমুৎপাদ্য করিবে। তুমি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে ভূতভবিষ্যৎ সমস্ত দেখিবে।

কৃষ্ণের কৃপায় সেইরূপই হইল। কিন্তু তথাপি ভীষ্ম আপত্তি করিলেন। কৃষ্ণকে বলিলেন, “তুমি স্বয়ং কেন যুধিষ্ঠিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না?”

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, সমস্ত হিতাহিত কর্ম আমি হইতে সম্ভূত। চন্দ্রের শীর্ষাংশ ঘোষণাও যেরূপ, আমার যশোলাভ সেইরূপ। আমার এখন ইচ্ছা আপনাকে

সমসিক বশবী করি। আমার সবুদায় বুদ্ধি সেই জন্ত আপনাকে অর্পণ করিয়াছি ইত্যাদি।

তখন ভীষ্ম প্রকৃষ্টচিত্তে বৃথিত্তিরকে ধর্মতত্ত্ব শুনাইতে প্রস্তুত হইলেন। রাজধর্ম, আপদধর্ম, এবং যোদ্ধধর্ম অতি সবিস্তারে শুনাইলেন। যোদ্ধধর্মের পর শান্তিপর্ব সমাপ্ত।

এই শান্তিপর্বের তিন স্তরই দেখা যায়। প্রথম স্তরই ইহার কঙ্কাল, ও তার পর যিনি যেমন ধর্ম বুঝিয়াছেন, তিনিই তাহা শান্তিপর্বভূক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমাদের সমালোচনার যোগ্য একটা গুরুতর কথা আছে। কেবল ধার্মিককে রাজ্য করিলেই ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল না। আজ ধার্মিক বৃথিত্তির রাজ্য ধর্মাত্মা; কাল তাঁহার উত্তরাধিকারী পাশাপাশী হইতে পারেন। এই জন্ত ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া, তাহার রক্ষার জন্ত ধর্মাত্মমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাও চাই। রণজয়, রাজ্য স্থাপনের প্রথম কার্য্য মাত্র; তাহার শাসন জন্ত বিধি ব্যবস্থাই (Legislation) প্রধান কার্য্য। কৃষ্ণ সেই কার্য্যে ভীষ্মকে নিযুক্ত করিলেন। ভীষ্মকে নিযুক্ত করিলেন তাহার বিশেষ কারণ ছিল; আদর্শ নীতিজ্ঞই তাহা লক্ষিত করিতে পারেন। কৃষ্ণ সেই সকল কারণ নিজেই ভীষ্মকে বুঝাইতেছেন।

“আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান এবং শুদ্ধাচারসম্পন্ন। রাজধর্ম ও অশরাপর ধর্ম কিছুই আপনার অবিস্মৃত নাই। জন্মাবধি আপনার কোনও দোষই লক্ষিত হয় নাই, নবপতিগণ আপনাকে সর্বধর্মবেত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতার স্থায় আপনি এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান করুন। আপনি প্রতিনিয়ত ধর্ম ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার নিকট ধর্মবৃত্তান্ত শ্রবণোৎসুক হইয়াছেন। অতএব আপনাকে অবশ্যই বিশেষরূপে সমস্ত ধর্মকীর্ত্তন করিতে হইবে। পণ্ডিতদিগের মতে ধর্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।

তার পর অমুশাসন পর্ব। এখানেও হিতোপদেশ; বৃথিত্তির শ্রোতা, ভীষ্ম বক্তা। কতকগুলো বাজে কথা লইয়া, এই অমুশাসন পর্ব প্রথিত হইয়াছে। সমুদয়ই বোধ হয় তৃতীয় স্তরের। তন্মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় কিছু নাই।

পরিশেষে ভীষ্ম স্বর্গারোহণ করিলেন। ইহাই কেবল প্রথম স্তরের।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কায়গীতা

ভীষ্মের স্বর্গারোহণের পর, যুধিষ্ঠির আবার কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বাহানা লইলেন, বনে যাইব। অনেকে অনেক প্রকার বুকাইলেন। কিন্তু কৃক এবার রোগের প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। সেরূপ রোগ নির্ণয় করা আর কাহারও সাধ্য নহে। যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত রোগ অহঙ্কার। ইংরেজি বিদ্যালয়ে নিখায় Pride শব্দ অহঙ্কার শব্দের প্রতিশব্দ। বস্তুতঃ তাহা নহে। অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। “আমি এই সকল করিতেছি,” “ইহা আমার,” “এই আমার সুখ,” “ইহা আমার দুঃখ,” এইরূপ জানাই অহঙ্কার। এই যুধিষ্ঠিরের দুঃখের কারণ। আমি এই পাপ করিয়াছি—আমার এই শোক উপস্থিত; আমি লইয়াই সব, অতএব আমি বনে যাইব, ইত্যাদি আত্মাভিমানই যুধিষ্ঠিরের এই কাঁদাকাটির মূলে আছে। সেই মূলে কুঠারাঘাতপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে উদ্ধৃত করা, এই ধর্ম্মবেত্তাজ্ঞেয়ের উদ্দেশ্য। এতদ্বারা তিনি পরুষবাচ্যে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ চূর্ণকৃত শত্রু রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না?” এই বলিয়া জীকৃক, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অহঙ্কারকে বিনষ্ট করার সম্বন্ধে একটি রূপক যুধিষ্ঠিরকে শুনাইলেন। তার পর তিনি যুধিষ্ঠিরকে যে অত্যাৎকট জ্ঞানোপদেশ দিলেন, তাহা সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি। যে নিকামধর্ম্ম আমরা গীতায় পড়ি, তাহা এখানেও আছে। এইরূপ অতি মহৎ ধর্ম্মোপদেশেই কৃকচরিত্র বিশেষ ক্ষুণ্ণি পায়।

“হে ধর্ম্মরাজ! ব্যাধি দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। ঐ দুই প্রকার ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহারে শারীরিক এবং মনোমধ্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহারে মানসিক ব্যাধি কহে। কক্ষ পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ, যখন এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে স্বস্থ এবং যখন ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখনই শরীরকে অস্থস্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে কক্ষের হ্রাস ও কক্ষের আধিক্য হইলে পিত্তের হ্রাস হইয়া থাকে। শরীরের জ্ঞান আত্মারও তিনটি গুণ আছে। ঐ তিনটি গুণের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম। ঐ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্যলাভ হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্ত্রের হ্রাস হয়। হর্ব উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্ব তিরোহিত হইয়া যায়। দুঃখের সময় কি কেহ সুখাশুভব করে এবং সুখের সময় কি কাহার দুঃখাশুভব হয়? বাহা

হটক, একশেষ অর্থব্যয় উভয়ই অরণ করা আপনাব কর্তব্য নহে। স্বয়ং জনসাধারণের পক্ষদিকে 'স্বয়ং' করাই আপনাব বিধেয়। * * * পূর্বে ভীষণ প্রাণহানির সহিত আপনাব যে যৌবনের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে একমাত্র অহংকারের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে অভিস্রবীণ হওয়া আপনাব অবশ্য কর্তব্য। যোগ ও তদুপযোগী কার্য সমুদায় অবলম্বন করিলেই এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; একমাত্র কনকে সহায় করিয়া এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে হুংবের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশোহসারে অচিরাৎ অহংকারকে পরাজয়পূর্বক শোক পরিত্যাগ করিয়া স্বহৃদে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন।

হে ধর্মরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয় সমুদায়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। বাহ্যার রাজ্যাদি বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম ও স্বয়ং তোমার শত্রুগণ লাভ করুক। মমতা সংসার-প্রাপ্তির ও নির্মমতা ব্রহ্মলান্ধের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই বিরুদ্ধধর্মাবলম্বী মমতা ও নির্মমতা লোকসমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাক্রম করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিদ্যমানতানিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিদ্যমান বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাঁহারে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না; যে ব্যক্তি স্বাবর-জন্মসংকলিত সমুদায় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই সংসারপাপে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিয়াও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহারে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি এই সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। কামপরতন্ত্র যুগ ব্যক্তিদ্বা কদাচ প্রশংসার আশ্পদ হইতে পারে না। কামনা মন হইতে সমুৎপন্ন হয়; উহা সমুদায় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহু জন্মের অভ্যাস বশতঃ কামনারে অধর্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাভের বাসনা সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্শ্রা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাও এককালে কামনারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

অতঃপর পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ যে কামগীতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কামনা স্বয়ং কহিয়াছে যে, নির্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপাদি কার্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে অভিমানরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার কার্য বিফল করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞস্বর্গাদি দ্বারা আমারে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জন্মমধ্যগত জীবাশ্মার দ্বারা ব্যক্তরূপে উদ্ভিত হই। যে ব্যক্তি বেদবেদান্ত সমালোচন দ্বারা আমারে শাসন করিতে বস্ত্রবান্ হন, আমি তাহার মনে

হাবরাক্ষসী জীবাত্মার জ্ঞান অব্যক্তরূপে অবস্থান করি। যে ব্যক্তি যৈষ্য দ্বারা আমাকে জ্ঞান করিতে চেষ্টা করে, আমি কখনই তাহার সন হইতে অপসারিত হই না। যে ব্যক্তি ভগবতী দ্বারা আমাকে পরাক্রম করিতে যত্ন করে, আমি তাহার ভগবতীতেই প্রাহুত্ব হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমাকে জ্ঞান করিতে বাসনা করে, আমি তাহারে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা আমাকে নরকভূজের অবস্থা ও সনাতন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

হে ধর্মরাজ! এই আমি আপনাদের কামগীতা সনিক্তে কীর্তন করিলাম। অতএব কামনারে পরাক্রম করা নিত্যন্ত দুঃসাধ্য। আপনি বিধিপূর্বক অশ্বমেধ ও অন্তান্ত হুসমুদ্র যজ্ঞের অহুষ্ঠান করিয়া কামনারে ধর্মবিষয়ে নীত করুন। বায়ংবার বহুবিরোগে অভিভূত হওয়া আপনার নিত্যন্ত অহুচিত। আপনি অহুতাপ দ্বারা কখনই তাহারিগের পুনর্দর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে হুসমুদ্র যজ্ঞ সমুদায়ের অহুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীর্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণপ্রয়াণ

ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল; ধর্মপ্রচারিত হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের সঙ্গে কৃষ্ণের জন্ম এ গ্রন্থের সম্বন্ধ; মহাভারতে যে জন্ম কৃষ্ণের দেখা পাই, তাহা সব ফুরাইল। এইখানে কৃষ্ণ মহাভারত হইতে অন্তর্হিত হওয়া উচিত। কিন্তু রচনাকল্পতিগীড়িতেরা তত সহজে কৃষ্ণকে ছাড়িবার পাত্র নহেন। ইহার পরে অর্জুনের মুখে তাঁহার একটা অপ্রাসঙ্গিক, অদ্ভুত কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি বৃদ্ধকালে আমাকে যে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলে, সব তুলিয়া গিয়াছি। আবার বল। কৃষ্ণ বলিলেন, কথা বড় মন্দ। আমার আর সে সব কথা মনে হইবে না। আমি তখন যোগযুক্ত হইয়াই সে সব উপদেশ দিয়াছিলাম। আর তুমিও বড় নির্বোধ ও অপ্রজ্ঞাশূন্য; তোমার আর কিছু বলিতে চাহি না। তথাপি এক পুরাতন ইতিহাস শুনাইতেছি।

কৃষ্ণ ঐ ইতিহাসোক্ত ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া, অর্জুনকে আবার কিছু তত্ত্বজ্ঞান শুনাইলেন। পূর্বে যাহা শুনাইয়াছিলেন, তাহা গীতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখন যাহা শুনাইলেন, গ্রন্থকার তাহার নাম রাখিয়াছেন “অহুগীতা।” ইহার এক ভাগের নাম “ব্রাহ্মণগীতা।”

অমরকান্দী, প্রহালাদ, লক্ষ্মণকান্দা, মার্কণ্ডেয়কান্দা, এই অমূল্য, অকল্পিত অনেকগুলি বর্মণকবীর গ্রন্থ মহাভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া, এক্ষণে মহাভারতের অংশ বলিয়া প্রচলিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গীতা, কিন্তু অল্পগুলিতেও অনেক নারদও কথ্য পাওয়া যায়। অমূল্যগীতাও উত্তম গ্রন্থ। “ভট্ট মোক্ষমূলর,” ইহাকে তাহার “Sacred Books of the East” নামক গ্রন্থাবলী মধ্যে স্থান দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্র্যম্বক ভেলাঙ, এক্ষণে যিনি বোম্বাই হাইকোর্টের জজ, তিনি ইহা ইংরাজিতে অনুবাদিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহা কৃষ্ণোক্তি নহে। গ্রন্থকার, বা অপর কেহ, যেরূপ অবতারণা করিয়া, ইহাকে কৃষ্ণের মুখে উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, ইহা কৃষ্ণোক্ত নহে; জোড়া দাগ বড় স্পষ্ট, কষ্টেও জোড় লাগে নাই। গীতোক্ত ধর্মের সঙ্গে অমূল্যগীতোক্ত ধর্মের এরূপ কোন সাদৃশ্য নাই যে, ইহাকে গীতাবেত্তার উক্তি বিবেচনা করা যায় না। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্র্যম্বক, নিজকৃত অনুবাদের যে দীর্ঘ উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, অমূল্যগীতা, গীতার অনেক শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল। সে প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনার আমাদের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রের কোন অংশই অমূল্যগীতার উপর নির্ভর করে না। তবে, অমূল্যগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা (বা ব্রহ্মগীতা) যে প্রকৃত পক্ষে প্রক্ষিপ্ত, তাহার প্রমাণার্থ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পর্বাসংগ্রহাধ্যায়ে ইহার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই।

অর্জুনকে উপদেষ্ট করিয়া, কৃষ্ণ অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক দ্বারকা যাত্রা করিলেন। এই বিদায় মানবপ্রকৃতিস্থলভ স্নেহাভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণের মানবিকতার পূর্বে পূর্বে আমরা অনেক উদাহরণ দিয়াছি। অতএব ইহার সবিস্তার বর্ণন নিম্নপ্রয়োজন।

পশ্চিমধ্যে উত্তরমুনির সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ যুদ্ধ নিবারণ করেন নাই, বলিয়া উত্তর তাঁহাকে শাপ দিতে প্রস্তুত। কৃষ্ণ বলিলেন, শাপ দিও না, দিলে তোমার ভগ্নক্ষয় হইবে, আমি সন্ধিস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আর আমি জগদীশ্বর। তখন উত্তর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন। কৃষ্ণের বিষ্ণুরূপ দেখিতে চাহিলেন; কৃষ্ণও বিষ্ণুরূপ দেখাইলেন। তার পর জোর করিয়া উত্তরকে অভিলষিত বরদান করিলেন। তাহার পর চণ্ডাল আসিল, কুকুর আসিল, চণ্ডাল উত্তরকে কুকুরের প্রস্রাব খাইতে বলিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি নানারূপ বীভৎস ব্যাপার আছে। এই

উদ্ভিদসম্পাদন বৃদ্ধান্ত মহাত্মারত্নের পর্বিশেষপ্রার্থনায় নাই ; সুতরাং ইহা মহাত্মারত্নের আশ্রয় নহে। কাজেই এ সবকে আমাদের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। স্পষ্টতঃ এখানে তৃতীয় স্তর দেখা যায়।

দ্বারকায় গিয়া কৃষক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলিত হইলে বসুদেব তাঁহার নিকট বৃদ্ধবৃদ্ধান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষক বৃদ্ধবৃদ্ধান্ত পিতাকে যাহা শুনাইলেন, তাহা সংক্ষিপ্ত, অত্যাশ্চর্য্য, এবং কোন প্রকার অনৈসর্গিক ঘটনার প্রসঙ্গদোষরহিত। অথচ সমস্ত ছুলা ঘটনা প্রকাশিত করিলেন। কেবল অভিমত্যাযথ গোপন করিলেন। কিন্তু সুভদ্রা তাঁহার সঙ্গে দ্বারকায় গিয়াছিলেন, সুভদ্রা অভিমত্যাযথের প্রসঙ্গ স্বয়ং উত্থাপন করিলেন। তখন কৃষক সে বৃদ্ধান্তও সবিস্তারে বলিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের বিদায়কালে তাঁহাকে অল্পরোধ করিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞকালে পুনর্ব্বার আসিতে হইবে। এক্ষণে সেই যজ্ঞের সময় উপস্থিত। অতএব তিনি যাদবগণ পরিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার হস্তিনায় গমন করিলেন।

কৃষক তথায় আসিলে, অভিমত্যাযথী উত্তরা একটি মৃতপুত্র প্রসব করিলেন। কৃষক তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। কিন্তু ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, কৃষক ঐশী শক্তির প্রয়োগদ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এখনকার অনেক ডাক্তারই মৃতসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন এবং কিরূপে করিতে পারেন, তাহা আমরা অনেকেই জানি। ইহা দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, যাহা তখনকার লোক আর কেহ জানিত না, কৃষক তাহা জানিতেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এজন্ত সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞা ও জ্ঞান তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল।

তার পর নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। কৃষকও দ্বারকায় পুনরাগমন করিলেন। তার পর আর পাণ্ডবগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ

যত্নবৎসল

তার পর, আজমবাসিক পর্ব। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নাই। তার পর, অতি ভয়াবহ মৌসল পর্ব। ইহাতে সমস্ত যত্নবৎসলের নিঃশেষ ধ্বংস ও কৃষ্ণ বলরামের দেহত্যাগ কথিত হইয়াছে। যত্নবৎসলীয়েরা পরস্পরকে নিহত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নিজে এই মহাভয়ানকব্যাপার নিবারণের কোন উপায় করেন নাই—বরং অনেক যাদব তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত হইয়াছে।

সে বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গান্ধারীকথিত ঘটত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইয়াছে। যাদবেরা অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন। একদা, বিশ্বামিত্র, কণ্ঠ ও নারদ এই লোকবিশ্রুত ঋষি ত্রয় দ্বারকায় উপস্থিত। দুর্বিনীত যাদবেরা কৃষ্ণপুত্র শাস্ত্রকে মেয়ে সাজাইয়া ঋষিদিগের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, ইনি গর্ভবতী, ইহার কি পুত্র হইবে? পুরাণেতিহাসে ঋষিগণ অতি ভয়ানক ক্রোধপরবশ স্বরূপ বর্ণিত হইয়া থাকেন। কথায় কথায় তাঁহাদের অভিসম্পাতের ঘট। দেখিলে, তাঁহাদিগকে জিতেন্দ্রিয় ঈশ্বরপরায়ণ ঋষি না বলিয়া, অতি নৃশংস নরপিশাচ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। এখনকার দিনে যে কেহ ভজলোক এমন একটা তামাসা হাসিয়া উড়াইয়া দিত; অন্ততঃ একটু তিরস্কার বাক্যই যথেষ্ট হয়। কিন্তু এই জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ একেবারে সমস্ত যত্নবৎস ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। বলিলেন, লৌহময় মুসল প্রসব করিবে, আর সেই মুসল হইতে কৃষ্ণ বলরাম ভিন্ন সমস্ত যত্নবৎস ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ এ কথা অবগত হইলেন। তিনি বলিলেন, মুনিগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা অবশ্য হইবে। শাপ নিবারণের কোন উপায় করিলেন না।

অগত্যা শাস্ত্র, পুরুষই হউক আর যাই হউক, এক লোহার মুসল প্রসব করিল। যাদবগণের রাজা (কৃষ্ণ রাজা নহেন, উগ্রসেন রাজা বা প্রধান) ঐ মুসল চূর্ণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। মুসল চূর্ণ হইল—চূর্ণ সকল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। এদিকে যাদবগণ সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাদিগের “বিনাশ” বাসনায়” যাদবগণকে প্রভাসতীরে যাত্রা করিতে বলিলেন।

প্রভাসে আসিয়া, যাদবগণ স্নানাপান করিয়া নানাবিধ উৎসব করিতে লাগিল। শেষে পরস্পর কলহ আরম্ভ করিল। কুরুক্ষেত্রের মহারথী সাত্যকি প্রথম বিবাদ আরম্ভ

করিলেন। তিনি কৃতবর্ধীর সঙ্গে বিবাহ করিলে গ্রহ্যর সাত্যকির পক্ষাবলম্বন করিলেন। সাত্যকি কৃতবর্ধীর শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন কৃতবর্ধীর জ্যেষ্ঠ গৌতমী (বাদবেরা, কুষ্টি, কোজ, মদ্রক, কুসুম ইতি ভিন্ন ভিন্ন কলীর) সাত্যকি ও গ্রহ্যকে নিহত করিল। তখন কৃষ্ণ এক মুষ্টি এরকা (শরগাহ) ক্রুক হইয়া গ্রহণ করিলেন, এবং তদ্বারা অনেক যাদব নিপাতিত করিলেন। গ্রহ্যস্তরে আছে যে এই শরগাহ মুসলচূর্ণ, বাহ্যে রাজাজ্ঞাসারে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাভারতে সে কথাটা পাইলাম না, কিন্তু লিখিত আছে যে কৃষ্ণ এরকামুষ্টি গ্রহণ করিতে তাহা মুসলরূপে পরিণত হইল, এবং ইহাও আছে যে ঐ স্থানের সমুদায় এরকাই ব্রাহ্মণ-শাপে মুসলীভূত হইয়াছিল। যাদবগণ তখন ঐ সকল এরকা গ্রহণপূর্বক পরস্পর নিহত করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত যাদবগণ পরস্পরকে নিহত করিলেন। তখন দারুক (কৃষ্ণের সারথি) ও বক্র (যাদব) কৃষ্ণকে বলিলেন, “জনর্দ্দন! আপনি এক্ষণে অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন, অতঃপর চলুন, আমরা মহাত্মা বলভজের নিকট যাই।”

কৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় অর্জুনের নিকট পাঠাইলেন। অর্জুন আসিয়া যাদবদিগের কুলকামিনীগণকে হস্তিনায় লইয়া যাইবে, এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। বলরামকে কৃষ্ণ যোগাসনে আসীন দেখিলেন। তাঁহার মুখ হইতে একটি সহস্রমস্তক সর্প নির্গত হইয়া সাগর, নদী, বক্রণ, এবং বাসুকি প্রভৃতি অস্ত্র সর্পগণ কর্তৃক স্তব্ধ হইয়া সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিল। বলরামের দেহ জীবনশূন্য হইল। তখন কৃষ্ণ স্বয়ং মর্ত্যলোক ত্যাগ বাসনায় মহাযোগ অবলম্বনপূর্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। জরা নামে ব্যাধ যুগভ্রমে তাঁহার পাদপদ্ম শরদ্বারা বিদ্ধ করিল। পরে আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়া শঙ্কিত মনে কৃষ্ণের চরণে নিপতিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

এদিকে অর্জুন দ্বারকায় আসিয়া রামকৃষ্ণাদির ঐক্যদৈহিক কর্ম সম্পাদন করিয়া যাদবকুলকামিনীগণকে লইয়া হস্তিনায় চলিলেন। পথিমধ্যে দনু্যগণ লাঠি হাতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। যিনি পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, এবং ভীষ্ম কর্তৃক নিহত, তিনি লণ্ডভধারী চাবাদিগকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না। কল্লিণী, সত্যভামা, হৈমবতী, জাম্ববতী প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রধান মহিষীগণ ভিন্ন আর সকলকেই দনু্যগণ হরণ করিয়া লইয়া গেল।

এই সকল কথা নি মৌলিক ? হুগল এরকার অনৈসর্গিক উপক্রাস আমরা পূর্ব নিয়মানুসারে পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু তাহা ত্যাগ করিলে যে, প্রাকৃতিক হুগল কথা কিছু থাকি থাকে, তাহা তত শীঘ্র ত্যাগ করা যায় না। যাদবেরা পানাসক্ত ও হুর্নীতি-পরায়ণ হইয়াছিল; ইহা পূর্বের কথিত হইয়াছে। তাহারা সকলে এক বংশীয় নহে; কিন্তু ভিন্ন বংশীয়, এবং অনেক সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধাচারী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাকের সাত্যকি ও কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে, কিন্তু অন্ধক ও ভোজবংশীয় কৃতবর্মা, দ্রুপদ্যোথনের পক্ষে। তার পর, যাদবদিগের কেহ রাজা ছিল না, উগ্রসেনকে কখন রাজা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু যাদবদিগের মধ্যে কেহই রাজা নহেন, ইহাই প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণের গুণাধিক্য হেতু, তিনি যাদবগণের নেতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অগ্রজ বলরামের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ দেখা যায়, এবং শান্তিপর্যে দেখিতে পাই ভীষ্ম একটি কৃষ্ণনারদসংবাদ বলিতেছেন, তাহাতে কৃষ্ণ নারদের কাছে দ্রুপদ করিতেছেন যে, তিনি জ্ঞাতিগণের মনোরঞ্জনার্থ বহুতর যত্ন করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এ সকল কথা পূর্বের বলিয়াছি। অতএব, যখন যাদবেরা, পরস্পর বিদ্বেষবিশিষ্ট, স্ব স্ব প্রধান, অত্যন্ত বলদৃঢ়, হুর্নীতিপরায়ণ, এবং সুরাপান নিরত * তখন তাঁহারা যে পরস্পর বিবাদ করিয়া যত্নকূলক্ষয় করিবেন এবং তন্নিবন্ধন কৃষ্ণ বলরামেরও যে ইচ্ছাধীন বা অনিচ্ছাধীন দেহাস্ত হইবে, ইহা অনৈসর্গিক বা অসম্ভব নহে। বোধ হয়, এরূপ একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল, এবং তাহার উপর পুরাণকারগণ যত্নবংশধ্বংস স্থাপিত করিয়াছেন। অতএব এ অংশের মৌলিকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তবে কেবল দুই একটা কথা বলা আবশ্যক। লিখিত হইয়াছে যে, যত্নবংশধ্বংস নিবারণ জন্ত কৃষ্ণ কিছুই করেন নাই, বরং তাহার আত্মকল্যাই করিয়াছিলেন। ইহাও যদি সত্য হয় তাহাতে কৃষ্ণচরিত্রের অসঙ্গতি বা অগৌরব কিছুই দেখি না। আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ মনুষ্যের উপযুক্ত কাজই করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেহ নাই—আদর্শ পুরুষের ধর্মই আত্মীয়। যত্নবংশীয়েরা যখন অধার্মিক হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের দণ্ড ও প্রয়োজনীয়-স্থলে বিনাশসাধনই তাঁহার কর্তব্য। যিনি জরাসন্ধ প্রভৃতিকে অধর্মাত্মা বলিয়াই বিনষ্ট করিলেন, তিনি যাদবগণকে অধর্মাত্মা দেখিয়া তাহাদের যদি বিনষ্ট না করেন তবে তিনি ধর্মের বন্ধু নহেন, আত্মীয়গণের বন্ধু, আপনার বন্ধু, ধর্মের পক্ষপাতী নহেন, আপনার পক্ষপাতী, বংশের পক্ষপাতী। আদর্শ ধর্মাত্মা, তাহা হইতে পারেন না—কৃষ্ণও তাহা হয়েন নাই।

* যাদবেরা এমন সভাসক্ত ছিলেন যে, কৃষ্ণ বলরাম ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, দ্বারকার বেহু প্রভৃত করিবে তাহাকে পুসে দিব। আমি পানাসক্ত রাক্ষসবংশকে এই নীতির অনুবর্তী হইতে বলিতে ইচ্ছা করি।

কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণটা কতক অনিশ্চিত রহিল। চারি প্রকার কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথম, টোলবয়স-হইলরি সম্প্রদায় বলিতে পারেন, কৃষ্ণ, জুলিয়স্ কাইসারের মত, য্বেষবিধিষ্ট বহুগুণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। একুপ কথা কোন গ্রন্থেই নাই।

দ্বিতীয়, তিনি যোগাবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক-দ্বিগের শিশুগণ যোগাবলম্বনে দেহত্যাগের কথাটার বিশ্বাস করিবেন না। আমি নিজে অবিশ্বাসের কারণ দেখি না। যাহারা যোগাত্ম্যসকালে নিশ্বাস অবরুদ্ধ করা অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া আপনাদেহ মৃত্যু সম্পাদন করিতে পারেন না, এমন কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না। একুপ ঘটনা বিশ্বস্তসূত্রে শুনাও গিয়া থাকে। অস্ত্রে বলিতে পারেন, ইহা আত্মহত্যা, সুতরাং পাপ; সুতরাং আদর্শ মনুষ্যের অনাচরণীয়, আমি ঠিক তাহা বলিতে পারি না। প্রাচীন বয়সে, জীবনের কার্য সমস্ত সম্পন্ন হইলে পরে, ঈশ্বরে লীন হইবার জন্ত, মনোমধ্যে তপ্ত হইয়া, শ্বাসরোধকে আত্মহত্যা বলিব, না “ঈশ্বরপ্রাপ্তি” বলিব? সেটা বিচারস্থল। আত্মহত্যা মহাপাপ স্বীকার করি, জীবনশেষে যোগবলে প্রাণত্যাগও কি তাই?

তৃতীয়, জরাব্যাধের শরাঘাত।

চতুর্থ, এই সময়ে কৃষ্ণের বয়স শত বর্ষের অধিক হইয়াছিল, বলিয়া বিস্ময়পূর্ণে কথিত হইয়াছিল। এ জরাব্যাধ, জরাব্যাধি নয় ত?

যাহারা কৃষ্ণকে মনুষ্যমাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা এই চারিটি মতের যে কোনটি গ্রহণ করিতে পারেন। আমি কৃষ্ণকে ঈশ্বরবতাবতার বলিয়া স্বীকার করি। অতএব আমি বলি কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ। আমার মত ইহা বটে যে, জগতে মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার তাঁহার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা পূরণজন্ত তিনি মানুষীশক্তির দ্বারা সকল কর্ম নির্বাহ করেন, কিন্তু তাহা বলিলেও ঈশ্বরবতাবতারের জন্মমৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন মাত্র বলিতে হইবে। অতএব আমি বলি কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের একমাত্র কারণ।

মৌসলপর্ব মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত কি না, তাহার আমি বিচার করি নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই, বলিয়া সমালোচনা করি নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই, কেন, তাহাও বলিয়াছি। স্থল ঘটনাটা কতক সত্য বলিয়াই বোধ হয়। তবে তাহা হইলেও, ইহা যে মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে বলিয়াই বোধ হয়। যাহা পুরাণ

ও হরিবংশে আছে, কৃষ্ণজীবনযতিতে এমন আর কোন ঘটনাই মহাভারতে নাই। এইটিই কেবল পুরাণাদিতেও আছে, হরিবংশেও আছে, মহাভারতেও আছে। পাণ্ডবদিগের সবধে বাহা কিছু কৃষ্ণ করিয়াছিলেন, তাহা তির আর কোন কৃষ্ণবৃত্তান্ত মহাভারতে নাই; ও থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এইটিই কেবল সে নিয়ম বহির্ভূত। কৃষ্ণ এখানে দীক্ষাবতীর, এটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের চিহ্ন পূর্বে বলিয়াছি। এরূপ বিবেচনা করিবার অজ্ঞান হেতুও নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনাত্ত। তবে, ইহা বলা কর্তব্য যে অহুক্রমণিকাধ্যায়ে মৌসলপর্বের কোন প্রসঙ্গই নাই। পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্তের পরবর্তী কোন কথাই অহুক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। আমার বিবেচনায় পরীক্ষিতের জন্মই আদিম মহাভারতের শেষ। তার পরবর্তী যে সকল কথা, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপসংহার

সমালোচকের কার্য প্রয়োজনানুসারে দ্বিবিধ;—এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস, অপর সত্যের সংগঠন। কৃষ্ণচরিত্রে প্রথমোক্ত কার্যই প্রধান; এজন্ত আমাদের সময় ও চেষ্টা সেই দিকেই বেশী গিয়াছে। কৃষ্ণের চরিত্রে সত্যের নূতন সংগঠন করা অতি দুর্লভ ব্যাপার, কেন না, মিথ্যা ও অতিপ্রকৃত উপস্থাসের ভাষে অগ্নি এখানে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহার সন্ধান পাওয়া ভার। যে উপাদানে গড়িয়া প্রকৃত কৃষ্ণচরিত্র পুনঃ সংস্থাপিত করিব, তাহা মিথ্যার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। আমার যত দূর সাধ্য, তত দূর আমি গড়িলাম।

উপসংহারে দেখা কর্তব্য যে, যতটুকু সত্য পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায়, ততটুকুতে কৃষ্ণচরিত্রে কিরূপ প্রতিপন্ন হইল।

দেখিয়াছি, বাল্যে কৃষ্ণ শারীরিক বলে আদর্শ বলবান্। তাঁহার অশিক্ষিত বলপ্রভাবে বৃন্দাবন হিংস্রজন্তু প্রভৃতি হইতে সুরক্ষিত হইত। তাঁহার অশিক্ষিত বলেও কংসের মল্লপ্রভৃতি নিহত হইয়াছিল। গোচারণকালে গোপালগণের সঙ্গে সর্বদা ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদিতে তিনি শারীরিক বলের ক্ষুণ্ণি জন্মাইয়াছিলেন। দেখিয়াছি, ক্রমগমনে কালযবনও তাঁহাকে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার রথসঞ্চালনবিজ্ঞার বিশেষ প্রশংসা দেখা যায়।

এই বল প্রিকৃত হইলে, তিনি সে সময়ের কত্রিলসমাজে সর্বপ্রধান অত্রবিধ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি সে সময়ের সর্বপ্রধান যোদ্ধৃগণের সঙ্গে, এবং অন্ত্যস্ত বহুতর রাজগণের সঙ্গে,—কাশী, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্রক, গান্ধার প্রভৃতি রাজ্যদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সকলকেই পরাভূত করিয়াছিলেন, কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তাঁহার যুদ্ধশিষ্টেরা, যথা—সাত্যকি ও অভিমন্যু যুদ্ধে প্রায় অপরাধেয় হইয়াছিলেন। স্বয়ং অর্জুনও তাঁহার নিকট কোন কোন বিষয়ে যুদ্ধস্বত্বকে শিষ্টাচার স্বীকার করিয়াছিলেন।

কেবল শারীরিক বলের ও শিক্ষার উপর যে রণপটুতা নির্ভর করে, পুরাণেতিহাসে তাহারই প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেরূপ রণপটুতা এক জন সামান্য সৈনিকেরও থাকিতে পারে। সৈন্যপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈন্যপত্যে সে সময়ের যোদ্ধৃগণ পটু ছিলেন না। মহাভারতে বা পুরাণে কাহারও সে গুণের বড় পরিচয় পাই না, ভীষ্মের বা অর্জুনেরও নহে। কৃষ্ণের সৈন্যপত্যের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, জরাসন্ধযুদ্ধে। তাঁহার সৈন্যপত্য গুণে ক্ষুদ্রা যাদবসেনা জরাসন্ধের সংখ্যাভীত সেনা মথুরা হইতে বিমুখ করিয়াছিল। সেই অগণনীয় সেনার ক্ষয়, যাদবসেনার দ্বারা অসাধ্য জানিয়া মথুরা পরিত্যাগ, নূতন নগরীর নির্মাণার্থ সাগরদ্বীপ দ্বারকার নির্বাচন, এবং তাহার সম্মুখস্থ রৈবতক পর্বতমালায় দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণীনির্মাণ যে রণনীতিজ্ঞতার পরিচয়, সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে কোন কত্রিয়েরই পাওয়া যায় না। পুরাণকার ঋষিদিগের ইহা অবোধগম্য—অতএব ইহাও এক অশ্রুতর প্রমাণ যে কৃষ্ণেতিহাস তাঁহাদের কল্পনামাত্রপ্রসূত নহে।

শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলও চরমক্ষুণ্ণি প্রাপ্ত, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ, ইহাই ভীষ্ম তাঁহার অর্ধ প্রাপ্তির অশ্রুতর কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। শিশুপাল সে কথার অশ্রু উত্তর দেন নাই, কেবল ইহাই বলিয়াছিলেন যে, তবে বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণের পূজা কেন ?

কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল যে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মই ইহার তীব্রোজ্জল প্রমাণ। এই ধর্ম যে কেবল গীতাতেই পাওয়া যায়, এমত নহে, মহাভারতের অশ্রু স্থানেও পাওয়া যায়, ইহা দেখিয়াছি। কৃষ্ণকথিত ধর্মের অপেক্ষা উন্নত, সর্বলোকহিতকর, সর্বজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই, ইহা গ্রহান্তরে বলিয়াছি। এই ধর্মে যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহা প্রায় মনুষ্যাতীত। কৃষ্ণ

মামুষীখজির দ্বারা সকল কার্য সিদ্ধ করেন, ইহা আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, ও প্রমাণীকৃত করিতেছি। কেবল এই সীতার, শ্রীকৃষ্ণ প্রায় অনন্তজ্ঞানের আজ্ঞায় লইয়াছেন।

সর্বজনীন ধর্ম হইতে অবতরণ করিয়া রাজধর্মে বা রাজনীতি সম্বন্ধে দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল চরমক্ষুষ্টি প্রাপ্ত। তিনিই সর্বজ্ঞেষ্ঠ এবং সম্ভ্রান্ত রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াই যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের পরামর্শ পাইয়াও কৃষ্ণের পরামর্শ ব্যতীত রাজন্যুয় যজ্ঞে হস্তার্পণ করিলেন না। অবাধ্য যাদবেয়া এবং বাধ্য পাণ্ডবেয়া তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু করিতেন না। জরাসন্ধকে নিহত করিয়া, কারাকন্ড রাজগণকে মুক্ত করা, উন্নত রাজনীতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ—সাম্রাজ্য স্থাপনের অন্ন্যায়সাধ্য অথচ পরম ধর্ম্য উপায়। ধর্ম্যরাজ্য সংস্থাপনের পর, ধর্ম্যরাজ্য শাসনের জন্য রাজধর্মনিয়োগে ভীষ্মের দ্বারা রাজব্যবস্থা সংস্থাপন করান, রাজনীতিজ্ঞতার দ্বিতীয় অতিপ্রশংসনীয় উদাহরণ। আরও অনেক উদাহরণ পাঠক পাইয়াছেন।

কৃষ্ণের বুদ্ধি, চরম ক্ষুষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, তাহা সর্বব্যাপিনী, সর্বদর্শিনী সকল প্রকার উপায়ের উদ্ভাবিনী, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি। মহুগ্ধশরীর ধারণ করিয়া যত দূর সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ তত দূর সর্বজ্ঞ। অপূর্ব অধ্যাত্তত্ব, ও ধর্ম্যত্ব, যাহার উপরে আজিও মহুগ্ধবুদ্ধি আর যায় নাই, তাহা হইতে চিকিৎসাবিজ্ঞা ও সঙ্গীতবিজ্ঞা, এমন কি অশ্বপরিচর্যা পর্য্যন্ত তাঁহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরার মৃত পুত্রের পুনর্জীবন একের উদাহরণ; বিখ্যাত বংশীবিজ্ঞা দ্বিতীয়ের, এবং জয়দ্রথবধের দিবসে অশ্বের শলোদ্ধার তৃতীয়ের উদাহরণ।

কৃষ্ণের কার্যকারিণী বৃত্তি সকলও চরমক্ষুষ্টি প্রাপ্ত। তাঁহার সাহস, ক্ষিপ্ৰকারিতা, এবং সর্বকর্মে তৎপরতার অনেক পরিচয় দিয়াছি। তাঁহার ধর্ম্য এবং সত্য যে অবিচলিত, এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পরিপূর্ণ। সর্বজ্ঞনে দয়া ও শ্রীতিই এই ইতিহাসে পরিস্ফুট হইয়াছে। বলদগুণের অপেক্ষা বলবান হইয়াও লোকহিতার্থ তিনি শাস্তির জন্য দৃঢ়চর এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি সর্বলোকহিতৈষী, কেবল মনুষ্যের নহে—গোবৎসাদি তির্য্যক্ যোনির প্রতিও তাঁহার দয়া। গিরিযজ্ঞে তাহা পরিস্ফুট। ভাগবতকারকথিত বাল্যকালে বানরদিগের জন্য নবনীত চুরির এবং ফলবিক্রেত্রীর কথা কত দূর কিম্বদন্তীমূলক, বলা যায় না—কিন্তু যিনি গোবৎসের উত্তম ভোজন জন্য ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করাইলেন, ইহাও তাঁহার চরিত্রানুমেদিত। তিনি আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিতৈষী, তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি আত্মীয় পাপাচারী হইলে তিনি তাহার শত্রু। তাঁহার অপরিণীম

কল্যাণের সেবায়, সাধারণ ইচ্ছার সেবায় যে সময় উপস্থিত সেবিকের তিনি আত্মবিস্মিত হন। অসুস্থতায় বসতিস্থান করেন। তিনি স্বকর্মপ্রিয়, কিন্তু লোকহিতার্থে স্বকর্মে নিরপেক্ষ। তিনি পুণ্ডিত হইতেন না। কলে বাতুল, পাঞ্চবেদা যাহা, নিত্যাশ্রিত তাহা, পিতৃমহার পুত্র, উভয়কেই পণ্ডিত করিলেন; তার পর, পরিচর্যে স্বয়ং বাসবেদা, অগ্নিপারী ও হুগ্নীপারায়ণ হইলেন, তাহাদিগকেও রক্ষা করিলেন না।

এই সকল জ্যেষ্ঠ বৃত্তি কৃষ্ণে চরমকৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, ভিন্দরজিনী বৃত্তির অঙ্গীকারে তিনি অপরাধু ছিলেন না, কেন না তিনি আদর্শ মনুষ্য। যে জন্ত বৃন্দাবনে ব্রহ্মলীলা, পরিণত বয়সে সেই উদ্দেশ্যে সমুদ্রবিহার, যমুনাবিহার, রৈবতকবিহার। তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই।

কেবল একটা কথা এখন বাকি আছে। ধর্ম্মতত্ত্বে বলিয়াছি, ভক্তিই মনুষ্যের প্রধান বৃত্তি। কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্ত অবতীর্ণ—তাহার ভক্তির কৃষ্টি দেখিলাম কেই? কিন্তু যদি তিনি ঈশ্বরাবতার হয়েন, তবে তাহার এই ভক্তির পাত্র কে? তিনি নিজে। নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে কেবল আপনাকে পরমাচ্ছা হইতে অভিন্ন হইলেই উপস্থিত হয়। ইহা জ্ঞানমার্গের চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উহা এইরূপ কথিত হইয়াছে। “য এবং পশুযেবং মদান এবং বিজানন্নাত্মরতিমাত্মকৌড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতীতি।”

“যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই বাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই বাহার আনন্দ, সে স্বরাট।”

ইহাই গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণ আত্মারাম; আত্মা জগদ্রম্য; তিনি সেই জগতে শ্রীতিবিশিষ্ট। পরমাশ্রয় আত্মরতি আর কোন প্রকার বৃত্তিতে পারি না। অন্ততঃ আমি বুঝিতে পারি না।

উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্বত্র সর্বসময়ে সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাভ্যেয়, অপরাভিত, বিমুক্ত, পুণ্যময়, শ্রীতিময়, দয়াময়, অহুষ্ঠেয় কর্মে অপরাধু—ধর্ম্মাচ্ছা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, জ্ঞাননিষ্ঠ, ক্ষমালীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্দম, নিরহঙ্কার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম নির্বাহ করেন, কিন্তু তাহার চরিত্র অমানুষ। এই প্রকার মানুষী শক্তির দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অহুমিত করা বিধেয় কি না, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধিবিবেচনা

দ্বিতীয় পত্র : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উপাসনায়

অনুসারে স্থির করিবেন। যিনি স্বীয়সেৱা করিবেন সে যত্ন অনুসরণে যিকোনো
অন্ততঃ Rhys Davids লোকসমূহে সৰ্বোচ্চ মান্য বোধিতব্য হুত্বকে প্রদান করিবেন —
“the Wisest and Greatest of the Hindus.” আর যিনি বুঝিবেন যে এই হুত্বচরিত্রে
ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি বুঝকবে, বিবীতভাবে এই গ্রন্থ সমাপনকালে
আমার সঙ্গে যলুন—

সাক্ষাৎকার্য্য করণীয়্য কার্য্যসমাপ্তম্ ।

শ্রীমদ্রথঃ বাণি বর্জিতাঃ তে পবনঃ ।

সমাপ্ত

সোডপত্র (ক)

(১৫ পৃষ্ঠা, ২২ পংক্তির পর পড়িতে হইবে)

আমি জানি যে আধুনিক ইউরোপীয়েরা এই সকল ইতিহাসবেত্তাদিগকে (Livy, Herodotus প্রভৃতিকে) আদর করেন না। কিন্তু তাঁহারা এমন বলেন না যে ইহাদের গ্রন্থ অনৈসর্গিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, এই জন্তই ইহারা পরিত্যাজ্য। তাঁহারা বলেন যে, ইহারা যে সকল সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইহারা নিজেও বর্তমান ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব তাঁহাদের গ্রন্থের উপর, প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া, নির্ভর করা যায় না। এ কথা যথার্থ, কিন্তু লিবি বা হেরোডোটস্ অপেক্ষা মহাভারতের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে দাবি দাওয়া কিছু বেশী, তাহা এই গ্রন্থে সময়ান্তরে প্রমাণীকৃত হইবে। এই পর্য্যন্ত এখন বলিতে ইচ্ছা করি যে, আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীক লিবি বা হেরোডোটসের গ্রন্থকে কখন অনৈতিহাসিক বলিতেন না। পক্ষান্তরে এমন দিনও উপস্থিত হইতে পারে যে, Gibbon বা Froude অসমসাময়িক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। আর আধুনিক সমালোচকের দল যাই বলুন, লিবি বা হেরোডোটস্কে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত হয় না।

পাঠক মনে রাখিবেন যে, অনৈসর্গিকতার বাহুল্যঘটিত যে দোষ, তাহারই বিচার হইতেছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের পদচিহ্নানুসরণই যদি বিজ্ঞাবুদ্ধির পরাকর্ষার পরিচয় হয়, তবে আমরা এখানে সে গৌরবে বঞ্চিত নহি। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পূর্বতন অবস্থা জানিবার জন্ত দেশীয় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, কেন না সে সকল অতিশয় অবিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীক লেখক Megasthenes এবং Ktesias এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য—সে জন্ত ইহারাই সে বিষয় ইউরোপীয় লেখকদিগের অবলম্বন। কিন্তু এই লেখকদিগের ক্ষুদ্র গ্রন্থগুলিতে যে রাশি রাশি অদ্ভুত, অলীক, অনৈসর্গিক উপস্থাপনা পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতের লক্ষ লোকের ভিতরও পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থগুলি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, আর মহাভারত অবিশ্বাসযোগ্য কাব্য !! কি অপরাধে ?

কোড়পত্র (খ)

(দ্বিতীয় বঙ্গ, দশম পরিচ্ছেদ)

অথর্ববেদের উপনিষদ সকলের মধ্যে একখানির নাম গোপালতাপনী। কৃষ্ণের গোপমূর্তির উপাসনা ইহার বিষয়। উহার রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, অধিকাংশ উপনিষদ অপেক্ষা উহা অনেক আধুনিক। ইহাতে কৃষ্ণ যে গোপগোপীপরিবৃত, তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে গোপগোপীর যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহা প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন। গোপী অর্থে অবিজ্ঞা কলা। টীকাকার বলেন,

“গোপায়ন্তীতি গোপাঃ পালনশক্তয়ঃ।” আর গোপীজনবল্লভ অর্থে “গোপীনাং পালনশক্তীনাং জনঃ সমূহঃ তদ্ব্যচ্যা অবিজ্ঞাঃ কলাশ্চ তাসাং বল্লভঃ স্বামী প্রেরক ঈশ্বরঃ।”

উপনিষদে এইরূপ গোপীর অর্থ আছে, কিন্তু রাসলীলার কোন কথাই নাই। রাধার নামমাত্র নাই। এক জন প্রধানা গোপীর কথা আছে, কিন্তু তিনি রাধা নহেন, তাঁহার নাম গান্ধর্বী। তাঁহার প্রাধাত্ত্বও কামকেশিতে নহে—তত্ত্বজিজ্ঞাসায়। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে আর জয়দেবের কাব্যে ভিন্ন কোন প্রাচীন গ্রন্থে রাধা নাই।

কোড়পত্র (গ)

(১৫৪ পৃষ্ঠা, ১২ ছত্রের পর)

লক্ষণাহরণ ভিন্ন যত্নবংশধ্বংসেও শাহের নায়কতা দেখা যায়। তিনিই পেটে মুসল জড়াইয়া মেয়ে সাজিয়াছিলেন। আমি এই গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে বলিয়াছি যে, এই মোসলপর্ক প্রাক্লিপ্ত। মুসল-ঘটিত বৃত্তান্তটা অতিপ্রকৃত, এজন্ত পরিত্যাজ্য। জাহ্নবতীর বিবাহের পরে সুভদ্রার বিবাহ,—অনেক পরে। সুভদ্রার পৌত্র পরিক্রিৎ যখন ৩৬ বৎসরের তখন যত্নবংশধ্বংস। সুভদ্রা যত্নবংশধ্বংসের সময় শাহ প্রাচীন। প্রাচীন ব্যক্তির গতিগী সাজিয়া ঋষিদের ঠকাইতে যাওয়া অসম্ভব।

ক্রোড়পত্র (ঘ)

(২৪৫ পৃষ্ঠা, হুই নোই)

এই অংশ ছাপা হওয়ার পর জানিতে পারিলাম যে ইহার অজ্ঞতর পাঠও আছে, যথা—“নিগ্রহাঙ্কুশাভ্রাণাম্ ।” এ স্থলে নিগ্রহ অর্থে মর্যাদা। যথা—

“নিগ্রহো ভৎসনেহপি ভাং মর্যাদায়াঞ্চ বন্ধনে ।”

ইতি মেদিনী ।

“নিগ্রহো ভৎসনে প্রোক্তো মর্যাদায়াঞ্চ বন্ধনে ।”

ইতি বিষ্ণু ।

“নিয়মেণ বিধিনা গ্রহণং নিগ্রহঃ ।”

ইতি চিদ্ধামণিঃ ।”

সুচিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অনুব	তত্ত্ব
৭	৪	জায়াস্বনে	জৈয়াস্বনে
১০১	১৩	পিতৃভিঃ	পিতৃভিঃ
২৪৫	২৩	পরামর্ষ	পরামর্ষ

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী

(১) কাব্য এবং (২) বিবিধ—দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য

পাঠ : মধুসূদনের বিভিন্ন গ্রন্থের পাঠ এরূপ বস্তুর সহিত কখনও নির্দীপ্ত হয় নাই। প্রচলিত বাক্য-সংস্করণের সকলগুলিই যে অসংখ্য তুলে ভরা, এই সংস্করণের সহিত সেগুলি মিলাইয়া দেখিলেই তাহা প্রমাণিত হইবে। মধুসূদনের জীবিতকালের শেষ সংস্করণের পাঠ মূল বলিয়া ধরা হইয়াছে।

মুদ্রণ : নতুন পাইকা অক্ষরে মূল এবং মূল পাইকা অক্ষরে টীকা মুদ্রিত হইতেছে।

পাঠভেদ : মধুসূদনের জীবিতকালের সকল সংস্করণের পাঠভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। যে-সকল পুস্তকে প্রথম ও শেষ সংস্করণের পাঠে মিল নাই সেই সকল পুস্তকের শেষে প্রথম সংস্করণও সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

টীকা : এই বিভাগে দুই শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ দেওয়া হইয়াছে; মূল-মুদ্রাক-প্রমাণ ও মধুসূদনের বিশেষ নিজস্ব প্রয়োগগুলিও প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভূমিকা : পুস্তক সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ভূমিকায় দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থ-সম্পাদন : বিভাগাগর ও বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এই সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন।

মূল্য : (ক) সাধারণ সংস্করণ—মাইকেলের চিত্র ও হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি-সম্বলিত দুই খণ্ডে বাঁধানো সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী—মূল্য ১২।০। খুচরা গ্রন্থ—প্রত্যেক পুস্তক স্বতন্ত্র কাগজের মলাটেও পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ডাক-খরচ স্বতন্ত্র দেয়।

মধুসূদন-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত পুস্তকগুলির নাম :

১ম খণ্ড—কাব্য

ভিলোতমাসম্বৎ কাব্য

মেঘনাদবধ কাব্য

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

বীরঙ্গনা কাব্য

চতুর্দশদশী কবিতাবলী

বিবিধ : পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত

কবিতাবলী

২য় খণ্ড—বিবিধ

শব্দার্থ

একেই কি বলে সভাভা

বুড়ো সাগিকের বাড়ি বেঁা

পদ্মাবতী নাটক

কৃষ্ণকুমারী নাটক

মাহাকানন

হেক্টর-বধ